রাজনৈতিক মতবাদের ইতিহাস

রাজনৈতিক মতবাদের ইতিহাস

চার খণ্ডে

১ প্রাচীন জগৎ ও মধ্য যুগ

২ আধুনিক কাল

৩ রাশিয়া ও জার্মানি: উনিশ শতক

৪ পশ্চিম ইউরোপ: উনিশ শতক

রাজনৈতিক মতবাদের ইতিহাস

খণ্ড ২ আধুনিক কাল

প্রতপদী ১২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০৭৩

Anti Duhring · Frederick Engels : a Bengali Translation by Deepak Roy.

প্রকাশিকা : প্রীতি মুখার্জী, ১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০৭৩
মুদ্রক : অমি প্রেস, ৭৫ পটলডাঙ্গা স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯
প্রকাশকাল : ডিসেম্বর, ১৯৬০।

প্রচ্ছদ : প্রবীর সেন

সূচি

মুখবন্ধ

এই বইটি 'রাজনৈতিক মতবাদের ইতিহাস' (প্রাচীন জগৎ ও মধ্য যুগ) গ্রন্থটির দ্বিতীয়াংশ ও তার সরাসরি অনুবর্তন। স্মরণীয় যে প্রথম অংশের বিষয় ছিল বিদ্যার একটা বিশেষ শাখা হিশেবে রাজনৈতিক ভাবধারা অধ্যয়নের পদ্ধতিবিদ্যাগত সাধারণ প্রশ্নাদি, ঐতিহাসিক অতীতে রাজনৈতিক চিন্তা বিকাশের বৈশিষ্ট্য, আধুনিক কালের সঙ্গে তার যোগাযোগের চরিত্র, সেই সঙ্গে প্রাচীন ও মধ্য যুগের মনীষীদের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি।

এ গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে আধুনিক কালের রাজনৈতিক মতবাদ, বিশ্ব-ঐতিহাসিক পরিসরে যার সূত্রপাত নেদার্ল্যান্ডস ও ইংলণ্ডের আদি বুর্জোয়া বিপ্লবগুলির (১৭শ শতক) সঙ্গে জড়িত। নিজ নিজ দেশে তা সামন্ততান্ত্রিক-পরারাজতান্ত্রিক (absolutist) শাসনব্যবস্থার অবসান ঘটায়। জহরলাল নেহরু মন্তব্য করেছেন: 'পরারাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে বুর্জোয়ার সংগ্রামে প্রথম নামে নেদার্ল্যান্ডস ও ইংলণ্ড।'

সতেরো-আঠারো শতকে দেখা দেয় বহুসংখ্যক প্রমুখ রাজনৈতিক চিন্তানায়কদের এক নক্ষত্রমণ্ডলী। তাঁদের মতামত আলোচিত হয়েছে ঐতিহাসিক-বস্তুবাদী বিশ্লেষণের সেই একই মূলনীতি অনুসারে যা ছিল প্রথম গ্রন্থটির ভিত্তি।

উনিশ শতকে রাজনৈতিক ভাবধারার বিবর্তন, এ পর্বের যা প্রধান ঘটনা, মার্কসবাদী রাজনৈতিক-আইনী মতবাদের উদ্ভব ও বিকাশ নিয়ে পরবর্তী গ্রন্থ লেখকগোষ্ঠী প্রস্তুত করে রেখেছেন।

আধুনিক কালের রাজনৈতিক মতবাদ

*

§ ১। সাধারণ বৈশিষ্ট্য

মানবজাতির ইতিহাসে ষোলো শতকের স্থান অতীব লক্ষণীয়। এই সময়টা থেকে বিশ্ব-ঐতিহাসিক আয়তনে শুরু হয় সামন্ততন্ত্র থেকে পুঁজিবাদে, শ্রেণী বৈরের ওপর প্রতিষ্ঠিত শেষ সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় উত্তরণ।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশেরই ইতিহাসটা একই। সবাই তারা এসে পড়তে থাকে আবিশ্ব ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াতে। তবে কোনো কোনো দেশ চলে এই প্রক্রিয়ার পায়ে পায়ে, কতকগুলি এগিয়ে যায়, কতকগুলি পিছিয়ে থাকে। বিভিন্ন দেশ, রাষ্ট্র, জনগণের বিকাশে অসমানতা এমন একটা প্রবণতা যা প্রাক্‌কমিউনিস্ট যুগের ঐতিহাসিক গতির নিয়মসঙ্গত সহগামী।

বলাই বাহুল্য, সামন্ততান্ত্রিক সমাজের গর্ভে নতুন বুর্জোয়া সম্পর্কের উদ্ভব ও রূপলাভ এমনকি একই মহাদেশের সমস্ত দেশে একই সঙ্গে ঘটে নি। নতুন সামাজিক বিশৃঙ্খলা পেকে ওঠে সর্বাগ্রে এবং অন্যদের চেয়ে প্রখরভাবে বাড়তে থাকে সেইসব অঞ্চলে যেখানে দেখা দিয়েছে উৎপাদনের পুঁজিবাদী প্রথার প্রবর্তন, জীবনযাত্রার বুর্জোয়া ধরনের জন্য সবচেয়ে বেশি অনুকূল অবজেক্টিভ ও সাবজেক্টিভ, অভ্যন্তরীণ ও বহির্দেশীয় পূর্বশর্ত। ১৬-১৭শ শতকে এইরকম অঞ্চল ছিল ইতালি, নেদার্ল্যাণ্ডস, ব্রিটেন, ফ্রান্স।

স্বাধীন শ্রেণীতে পরিণত হয়ে বুর্জোয়ারা সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতি ব্যাপক জনগণের বিরোধিতার নেতৃত্বে যেতে শুরু করে। বর্ধমান পুঁজিবাদী সম্পর্ক সামন্ততান্ত্রিক সম্পত্তিধরদেরও স্পর্শ করে, তারাও শুরু করে কোনো না কোনো মাত্রায় এর সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে। নতুন পুঁজিবাদী ব্যবস্থার উদ্ভবে লোকেদের মধ্যে জেগে উঠল নতুন জীবনযাত্রা, নতুন বিশ্ববোধ, নতুন বিশ্ববীক্ষার আকর্ষণ। মধ্যযুগীয়তা, ধর্মীয় তমসাচ্ছন্নতা, সামন্ততান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানাদি ও শৃঙ্খলার পীড়ন থেকে মানুষকে মুক্ত করার প্রয়োজন দেখা দিল। সামন্ততন্ত্রে যেখানে ছিল ধর্মীয় বিশ্ববীক্ষার প্রাধান্য, পুঁজিবাদী

ব্যবস্থা সেক্ষেত্রে, র‍ূপলাভ করার পর্যায়েই নিয়ে এল 'মানবীকৃত জগৎ'। মান‍ুষ হয়ে দাঁড়াল অন‍ুপ‍ুঙ্খ অধ্যয়নের বিষয়বস্তু।

জাতীয় রাষ্ট্রপাটের উদ্ভব ও বৃদ্ধি, রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে ধ‍ূলিসাৎ হতে থাকে ধর্মীয় বিশ্ববীক্ষা, ঘোষিত হতে থাকে বিবেক ও চিন্তার স্বাধীনতা। দেখা দিতে থাকে এমন রাজনৈতিক মতবাদ, যা ব‍ুর্জোয়া রাষ্ট্রপাটের ভাবাদর্শীয় সামান্যীকরণ।

ব‍ুর্জোয়া রাজনৈতিক ভাবনার আদি প্রবক্তা হলেন পাদ‍ুয়ার মার্সিলিয়াস ও নিকোলো মাকিয়াভেলি। রাজনৈতিক বিজ্ঞানকে ঈশ্বরতত্ত্ব থেকে ম‍ুক্ত করার দিকে প্রথম পদক্ষেপ করেন মাকিয়াভেলিই, আধ‍ুনিক রাজনীতি বিদ্যার র‍ূপলাভে এর তাৎপর্য প্রভূত। তিনি রাষ্ট্রের প্রশ্নটি বিচার করেন ঈশ্বরতাত্ত্বিক নয়, ঐহিক অবস্থান থেকে, ঐতিহাসিক তথ্যের ওপর ভিত্তি করে চেষ্টা করেন সমাজ বিকাশের নিয়ম আবিষ্কার করতে।

নেদার্ল্যান্ডসে ষোলো-সতেরো শতকের বিপ্লবের চুড়োয় দেখা দেন হ. গ্রটিয়াস ও ব. স্পিনোজার মতো প্রগতিশীল মনীষী। ব‍ুর্জোয়া রাজনৈতিক ভাবনার পরবর্তী বিকাশে বিপ‍ুল প্রভাব ফেলেন তাঁরা। সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্কের ভাঙন, সামন্ত সম্প্রদায়দের বির‍ুদ্ধে সমাজের 'নিচু তলার' সংগ্রামের তীব্রায়ণ হল নেদার্ল্যান্ডসে আদি ব‍ুর্জোয়া বিপ্লবের অন্যতম কারণ. যদিও সে বিপ্লব তখনো সামন্ততন্ত্রের ওপর প‍ুঁজিবাদের প‍ূর্ণ বিজয় স‍ূচিত করতে পারে নি। ব‍ুর্জোয়া ভাবাদর্শীদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিপক্কতা ও র‍্যাডিকেলিজমের মাত্রা নির্ভর করছিল প‍ুঁজিবাদী গঠন ও সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে বিরোধের তীক্ষ্ণতার ওপর, ব‍ুর্জোয়াদের বৈপ্লবিকতা, জন-আন্দোলনের প্রসার, বিপ্লবে সাধারণ লোকের অংশগ্রহণের ওপর।

প‍ুঁজিবাদে র‍ূপান্তরের সর্বাধিক প‍ূর্ণ প্রক্রিয়া দেখা গেছে সতেরো শতকের ইংলণ্ডে। সেখানে ব‍ুর্জোয়া হয়ে ওঠা জমিদাররা ছিল বস্ত্র শিল্পের দ্র‍ুত বৃদ্ধিতে আগ্রহী, কৃষকদের ভূমি থেকে উচ্ছেদ করে তারা জমিগ‍ুলিকে মেষচারণ ক্ষেত্রে পরিণত করতে থাকে, যাকে বলা হত বেড়া-ঘের। সেদেশে সতেরো শতকের মাঝামাঝি ব‍ুর্জোয়া বিপ্লবের বিজয় ছিল ইংলণ্ডে প‍ুঁজিবাদের দ্র‍ুত বৃদ্ধির নির্ধারক শর্ত। মার্কস উল্লেখ করেছেন যে ইংলণ্ডের ব‍ুর্জোয়া বিপ্লব তার তাৎপর্যের দিক থেকে ছিল 'ইউরোপীয় পরিসরে' ব‍ুর্জোয়া বিপ্লব*।

ইংলণ্ডে বুর্জোয়া বিপ্লবের প্রস্তুতিক্রমে ও খাস বিপ্লবেরই গতিপথে, দেশের পরবর্তী পুঁজিবাদী বিকাশের প্রক্রিয়ায় দেখা দেয় রাজনৈতিক তত্ত্ব যা বুর্জোয়া ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে ভাবাদর্শীয় অস্ত্রের কাজ করে। নিয়মতান্ত্রিক পার্লামেণ্টী রাজতন্ত্র ও প্রজাতন্ত্র, সামাজিক চুক্তি এবং ব্যক্তির সমাধিকার বিষয়ে যেসব ভাবনা ইংলণ্ডে বিকাশ পেতে থাকে, তা অন্যান্য দেশের বুর্জোয়া রাজনৈতিক চিন্তায়, ইউরোপ ও আমেরিকায় বুর্জোয়া বিপ্লবের প্রস্তুতিতে প্রভাব বিস্তার করে।

বহু সংখ্যক যুদ্ধ মারফত বিশাল ঔপনিবেশিক সম্পত্তি দখল করে ইংলণ্ড নিষ্ঠুর উৎপীড়নের আমল প্রতিষ্ঠা করে সেখানে। উপনিবেশের অধিবাসীরা প্রতিরোধ করে প্রভুদের, তবে কেবল আমেরিকাতেই সংগ্রামটা সাফল্য লাভ করে। স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধের পরিণামে ১৭৭৬ সালের ৪ জুলাই সেখানে গৃহীত হয় স্বাধীনতার ঘোষণা, বুর্জোয়া সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও যা ছিল প্রগতিশীল ও বৈপ্লবিক দলিল। ইতিহাসে এই প্রথম প্রতিনিধিত্বমূলক বুর্জোয়া সভা ঘোষণা করল যে জনগণই সর্বোচ্চ ক্ষমতাধর, লোকেরা সমাধিকারী, স্বৈরতন্ত্র উচ্ছেদের অধিকার আছে জনগণের।

তবে স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামে জনগণ যে বিজয় অর্জন করল, তার ফল ভোগ করল সর্বাগ্রে উত্তরের বৃহৎ বণিক-শিল্পপতি বুর্জোয়া আর দক্ষিণের দাস-প্রথাভিত্তিক আবাদমালিকেরা। আমেরিকান বৃহৎ বুর্জোয়ার রাজনৈতিক কর্মসূচিতে ছিল সর্ববিধ উপায়ে বুর্জোয়ার একনায়কত্ব সুদৃঢ়করণ এবং পরাক্রান্ত কেন্দ্রীভূত ফেডারেল ক্ষমতা গঠনের দাবি। তার 'তাত্ত্বিক' যুক্তি পাওয়া গেল হ্যামিল্টন, মেডিসন, জে প্রভৃতি ভাবাদর্শীদের রচনা ও বক্তৃতায়। পেটি বুর্জোয়া, স্বাধীন ফার্মার ও হস্তশিল্প কর্মশালাগুলির শ্রমিকদের স্বার্থ প্রতিফলিত করে প্রগতিশীল বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক ধারার রাজনৈতিক ভাবনা দেখা যায় ট. জেফারসন ও ট. পেইনের মধ্যে।

তবে বুর্জোয়া রাজনৈতিক চিন্তা তার তুঙ্গ বিন্দুতে পৌঁছয় আঠারো শতকের দ্বিতীয়ার্ধে প্রাগ্‌বিপ্লব ও বিপ্লবকালীন ফ্রান্সে।

আঠারো শতকের শেষের দিকে ফ্রান্সে দানা বেঁধে ওঠে বুর্জোয়া বিপ্লবের সমস্ত পূর্বশর্ত। সামন্ততান্ত্রিক-পরারাজতান্ত্রিক (absolutist) ব্যবস্থার নির্ভরস্থল ছিল যাজক ও অভিজাতদের সুবিধাভোগী সম্প্রদায়। তৃতীয় সম্প্রদায়ের লোকেরাই ছিল ফ্রান্সের অধিবাসীদের প্রায় ৯৯ শতাংশ, কিন্তু তাদের কোনো রাজনৈতিক অধিকার ছিল না। তৃতীয়

সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত সমস্ত শ্রেণী ও শ্রেণীভিত্তিক গ্রুপ একই মাত্রায় না হলেও সামন্ততান্ত্রিক নিরঙ্কুশ রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার নিগড়ে পীড়িত হত, সকলেই ছিল তার উচ্ছেদে একান্ত আগ্রহী।

ফরাসি বিপ্লবের ঐতিহাসিক তাৎপর্য বিপুল। সামন্ততন্ত্রের ওপর তা মোক্ষম আঘাত হানে এবং প্রগতিশীল ভূমিকা পালন করে কেবল ফ্রান্সে নয়, সারা ইউরোপে।

কিন্তু ফরাসি বিপ্লব ছিল বুর্জোয়া বিপ্লব, তার ফল ভোগ করে বুর্জোয়ারা।

তাহলেও বিপ্লবের নেতৃত্ব নিয়ে বুর্জোয়া শ্রেণী নিজেদের স্বার্থপর লক্ষ্য লুকিয়ে রেখে এগিয়ে আসে জনগণের নামে। এই স্ববিরোধ প্রতিফলিত হয় ফরাসি বিপ্লবের ভাবাদর্শেও।

ফরাসি জ্ঞানপ্রচারকদের সম্পর্কে এঙ্গেলস লিখেছেন: 'আসন্ন বিপ্লবের জন্য ফ্রান্সে লোকেদের মস্তিষ্ক যাঁরা আলোকিত করেছেন, সেই মহাপুরুষেরা নিজেরা এগিয়ে এসেছেন প্রচণ্ড বিপ্লবীর মতো। যে ধরনেরই হোক, বাইরের কোনো কর্তৃত্ব তাঁরা মানতেন না। ধর্ম, প্রকৃতির বোধ, সমাজ, রাষ্ট্রব্যবস্থা— সবকিছুই পড়ে নির্মম সমালোচনার মুখে; সবকিছুকেই দাঁড়াতে হবে বিচারবুদ্ধির আদালতে, হয় তাদের প্রমাণিত করতে হবে নিজেদের টিকে থাকার ন্যায্যতা, নয় সে দাবি ছেড়ে দিতে হবে।... সমাজ ও রাষ্ট্রের সমস্ত প্রাক্তন রূপ, সমস্ত চিরাচরিত ধ্যানধারণাকে ঘোষণা করা হয় অযৌক্তিক বলে এবং পুরনো আবর্জনার মতো ছুঁড়ে ফেলা হয় তাদের'*।

এঙ্গেলস এই সিদ্ধান্তেও এসেছেন যে বিচারবুদ্ধির রাজত্ব ছিল বুর্জোয়ার আদর্শায়িত রাজত্ব ব্যতীত আর কিছু নয়; চিরন্তন ন্যায্যতা পেঁছিল বুর্জোয়া ন্যায়বিচারে, বুর্জোয়া মালিকানার অধিকারকে ঘোষণা করা হল ওটা মানুষের মৌলিক অধিকার, আর রুসোর 'সামাজিক চুক্তি' কার্যত হয়ে দাঁড়াল বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র**।

অভিজাতকুলের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নিজেদেরকে তখনকার মেহনতী শ্রেণীদেরও প্রতিনিধি বলে গণ্য করার খানিকটা অধিকার বুর্জোয়াদের থাকলেও বুর্জোয়া আন্দোলনের পর্বে সমস্ত দেশে জ্বলে ওঠে নিপীড়িত

জনগণের স্বাধীন আন্দোলনও, যা কোনো না কোনো মাত্রায় প্রলেতারীয় আন্দোলনের অগ্রদূত। এই আন্দোলন ছিল সংস্কারের যুগে অ্যানাব্যাপটিস্ট [১] ও টমাস মুনটসার আন্দোলন, ইংলণ্ডে বিপ্লবের সময় লেভেলার [২] আন্দোলন আর ফরাসি বিপ্লবে বাবেফের উদ্যোগ। এইসব আন্দোলনের ভাবাদর্শীয় অভিব্যক্তি মেলে ইউটোপীয় সমাজতন্ত্রীদের তাত্ত্বিক বক্তব্যে: ট. মুর (১৬শ শতক), ট. কাম্পানেলা (১৬-১৭শ শতক), আর আঠারো শতকে মাব্লি ও মরেলির কমিউনিস্ট তত্ত্ব, যাতে তীব্র সমালোচনা করা হয় জায়মান বুর্জোয়া ব্যবস্থার।

১৭-১৮শ শতকে জার্মানিতে রাজনৈতিক ও আইনী মতবাদ বিকশিত করতে থাকেন প্রমুখ আলোকদাতা ও গণতন্ত্রীরা। রাষ্ট্র ও আইনবিষয়ক বিদ্যায় মূল্যবান অবদান যোগ করেন জার্মান দর্শনের ক্ল্যাসিকরা হের্ডার, কাণ্ট, ফিখটে ও হেগেল। কিন্তু জার্মানিতে বুর্জোয়ারা একটা সম্মিলিত, দৃঢ়সংকল্প শ্রেণী ছিল না। তাদের মধ্যে দেখা যেত সামন্তদের সামনে ভীরুতা ও দাস্যতা। জার্মান বুর্জোয়ার শক্তিহীনতা ও শিথিলতা প্রকাশ পেয়েছে তাদের ভাবাদর্শেও। সেই কারণে বৈপ্লবিক যেসব বুর্জোয়া ধ্যানধারণা ও তত্ত্ব জার্মানিতে এসে পৌঁছয় তা জার্মান বুর্জোয়াদের ভাবাদর্শীদের প্রকাশ্য ও পরিপূর্ণ অনুমোদন পায় নি শুধু নয়, তাদের কতকগুলির বিরোধিতাই করা হয়।

আঠারো শতকের দ্বিতীয়ার্ধে একটু-একটু করে রাশিয়াতেও দেখা দেয় পুঁজিবাদী বিকাশ এবং সেই সঙ্গে সামন্ততন্ত্রবিরোধী আন্দোলন ও রাজনৈতিক তত্ত্বও।

প্রথম পিটারের আমলে রাশিয়ায় রাজনৈতিক চিন্তা অনেক বিকাশ লাভ করে, বিশেষ করে ফেওফান প্রকোপভিচ (১৬৮১-১৭৩৬) এবং ভ. ন. তাতিশ্যেভের (১৬৮৬-১৭৫০) রচনায়।

প্রকোপভিচের মূল রাজনৈতিক রচনা 'রাজ অভিপ্রায়ের সত্য'এ তিনি আলোকপ্রাপ্ত নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রের পক্ষ নেন, প্রথম পিটারের সংস্কারের ঔচিত্য প্রতিপাদন ও প্রশংসা করেন। ব্যাপকভাবে ঈশ্বরতত্ত্বীয় যুক্তি অবলম্বন করলেও তিনি স্বাভাবিক বিধি ও সামাজিক চুক্তি তত্ত্বেরও আশ্রয় নেন, তবে তাদের ব্যাখ্যা করেন একেবারেই নিজের মতো। যেমন, স্বাভাবিক নিয়ম আছে একথা মেনে নিয়েও তিনি দাবি করেন যে সেগুলি 'পবিত্র শাস্ত্র'এর অনুশাসন থেকে একেবারে অভিন্ন।

প্রকোপভিচের তত্ত্ব অনুসারে, রাষ্ট্রের উদ্ভব হয় জনগণের মর্জিতে

এবং তা রূপ পায় সামাজিক চুক্তিতে। রাজনৈতিক ক্ষমতার জন্য সংগ্রামরত বুর্জোয়ার মতপ্রবক্তারা এর উপর নির্ভর করে শাসনের রূপ পরিবর্তনের অধিকার আছে জনগণের, এই ব্যাখ্যায় আসেন। জনগণের সেরূপ অধিকার কিন্তু প্রকোপভিচ স্বীকার করেন না। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে জনগণের ইচ্ছা নির্দিষ্ট হয়ে গেছে 'ঐশ্বরিক নির্বন্ধে', তার পুনর্বিচার সম্ভব নয়।

তাতিশ্যেভের রাজনৈতিক রচনাগুলি ভাবাদর্শীয় বিষয়বস্তুর দিক থেকে প্রকোপভিচের অনুরূপ; শেষোক্তের মতো তিনিও আলোকপ্রাপ্ত নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রের পক্ষে। তবে তাতিশ্যেভের বৈশিষ্ট্য হল ঈশ্বরতাত্ত্বিক অনুশাসনের অনুপস্থিতি, কিছু কিছু যাজকবিরোধিতাও দেখা যায় তাঁর মধ্যে।

আঠারো শতকের ৬০-এর দশকে রাশিয়ায় শুরু হয় পশ্চিম ইউরোপের মতোই সামন্ততান্ত্রিক-ভূমিদাসভিত্তিক সম্পর্কের ভিত্তিতে গঠিত ধ্যানধারণার সমালোচনামূলক পুনর্মূল্যায়ন। এর অবজেকটিভ কারণ হল, একদিকে, পুঁজিবাদ উদ্ভবের প্রক্রিয়া, সামন্ততান্ত্রিক বনিয়াদে পরিবর্তন, অন্যদিকে, ঘনায়মান ভূমিদাস কৃষকদের বিদ্রোহ, পুগাচেভের নেতৃত্বে ফুঁসে ওঠা ঘোরতর কৃষক সমর। ফরাসি জ্ঞানপ্রচারক এবং আঠারো শতকের শেষে ফরাসি বিপ্লবও বড়ো একটা প্রভাব ফেলেছিল রাশিয়ায় অগ্রবর্তী চিন্তা গড়ে ওঠায়।

রাশিয়ার শাসক শ্রেণীর অপেক্ষাকৃত দূরদর্শী প্রতিনিধিরা ৬০-এর দশকের গোড়াতেই কৃষকদের শান্ত করা এবং একই সঙ্গে কৃষিতে শ্রমের উৎপাদনশীলতা বাড়াবার উদ্দেশ্যে ভূমিদাস প্রথা কিছুটা নরম করার প্রকল্পগুলি উপস্থিত করেছিলেন। তবে এসব প্রকল্পের কথা শাসকশীর্ষের খুবই সীমাবদ্ধ একটা মহলেরই জানা ছিল।

রুশ অভিজাতদের অত্যধিকাংশই ছিল প্রতিক্রিয়াশীল, তারা ভূমিদাসদের ওপর জমিদারদের নিরঙ্কুশ আধিপত্য সহ ভূমিদাস প্রথা আঁকড়ে থাকত অটলভাবে। আঠারো শতকের প্রখ্যাত ঐতিহাসিক, সম্ভ্রান্ত অভিজাতকুলের ভাবাদর্শী ম. ম. শেরবাতভ তাঁর 'রাশিয়ায় কৃষক ও ভৃত্যদের মুক্তিদান অথবা সম্পত্তির ওপর স্বত্ব প্রতিষ্ঠার অসুবিধা বিষয়ে ভাবনা' গ্রন্থে 'বিদ্রোহের চিন্তায়' সাহায্য না করার জন্য কৃষক সমস্যা সমাধানের প্রকল্পগুলিকে গোপন রাখার আবশ্যকতা দেখাবার চেষ্টা করেছেন প্রাণপণে।

একই সময়ে অগ্রণী রুশ জ্ঞানপ্রচারকেরা — আইনবিদ আ. ইয়া. পলেনভ, মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনের অধ্যাপক স. ইয়ে. দেসনিৎস্কি, ই. আ. ত্রেতিয়াকোভ, দার্শনিক ইয়া. প. কজেলস্কি

ও দ. স. আনিচকভ, নতুন কোড সংরচন কমিশনের প্রগতিশীল সদস্যরা, ব্যঙ্গ পত্রিকাদির প্রকাশক ন. ই. নোভিকভ প্রভৃতিরা চেষ্টা করেছেন সমাজের বিশৃঙ্খলা, প্রচলিত সামাজিক ব্যবস্থার অন্যায্যতার কারণ উদ্ঘাটন করতে। যে অবস্থাটা গড়ে উঠেছে, তাঁদের অধিকাংশই তার ব্যাখ্যা দিতে চেয়েছেন 'স্বাভাবিক বিধির' তত্ত্ব অবলম্বনে এবং গোলামিকে গণ্য করেছেন আদি 'সামাজিক চুক্তি' থেকে বিচ্যুতি বলে। বিচক্ষণ ও ন্যায়পরায়ণ আইন জারিই তাঁদের কাছে মনে হয়েছিল সামাজিক শ্রীবৃদ্ধির সম্যক উপায়। নোভিকভ, পলেনভ, দেসনিৎস্কি প্রভৃতি জ্ঞানপ্রচারকেরা প্রায়ই দেশে ভূমিদাস প্রথা ও ব্যবস্থার ওপর নির্ভীক ও তীব্র কষাঘাত করেছেন, কিন্তু তাঁদের সিদ্ধান্তে এবং ব্যবহারিক প্রস্তাবে ভূমিদাস প্রথার পূর্ণ উচ্ছেদ নয়, কেবল সংকোচনের কথাই আছে। কৃষকদের অধীনতার একটা আইনী নিয়ামন, অস্থাবর সম্পত্তির ওপর কৃষকদের অধিকার দান এবং স্থাবর সম্পত্তির উত্তরাধিকার স্বত্বের বেশি অগ্রসর হয় নি তাঁদের কর্মসূচি। পশ্চিম ইউরোপীয় বহু জ্ঞানপ্রচারকের মতো তাঁদেরও 'আলোকপ্রাপ্ত রাজা' সম্পর্কে মোহ ছিল।

তাহলেও ভূমিদাস প্রথা ও সরকারের পলিসির এইসব সমালোচনাতে সাহায্য হয় রাশিয়াতে বৈপ্লবিক ভাবাদর্শ উদ্ভবে। তার প্রমুখ প্রতিনিধি ছিলেন আ. ন. রাদিশ্চেভ — প্রথম রুশ বৈপ্লবিক মনীষী, ডিসেম্ব্রিস্টদের অব্যবহিত পূর্বসূরী।

রাদিশ্চেভের 'পিটার্সবুর্গ থেকে মস্কো ভ্রমণ' বইটি রাশিয়ায় বিপ্লবী সাহিত্যের সূত্রপাত করে। বলপূর্বক স্বৈরতন্ত্রের উচ্ছেদ ও গোলামি বিদূরণের অধিকার জনগণের আছে, এটা মানেন রাদিশ্চেভ। মানুষের 'স্বাভাবিক অবস্থাকে' ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের অবস্থা বলে গণ্য করার যে লক্ষণ আঠারো শতকের জ্ঞানপ্রচারকদের ছিল তা তিনি অতিক্রম করে যান; মানুষকে তিনি মনে করেন সামাজিক প্রাণী, এই ধারণাতেই তিনি উপনীত হন যে জনগণ হল ইতিহাসের প্রধান, নির্ধারক শক্তি।

সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার সংকট মোটেই কোনো স্থানীয় ব্যাপার নয়, এ একটা বিশ্বব্যাপী ঘটনা। শুধু পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলি আর রাশিয়াই তার কবলিত হয়েছে এমন নয়। সতেরো-আঠারো শতকে প্রাচ্য দেশগুলিও — ভারত, জাপান, চীন তার গ্রাসে পড়েছে। এসব দেশেও সামন্ততন্ত্রের সামাজিক ও আধ্যাত্মিক ব্যবস্থাকে হেয় করা, ধর্মীয় কুসংস্কারের উৎসাদন, সমস্ত কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসকে বিচারবুদ্ধির কষ্টিপাথরে যাচাই

করা, সম্প্রদায় নির্বিশেষে মানবসত্তার প্রতিষ্ঠা অভিমুখী ভাবাদর্শীয় আন্দোলন দেখা দেয়। ব্যক্তিমানুষের নৈতিক মানে যা পুষ্ট নয়, বরং তাকে রূঢ়ভাবে দমন করে এমন সামন্ততান্ত্রিক অনুজ্ঞাদির বিপরীতে দাঁড় করানো হয় স্বাধীন অনুভূতি ও বিশুদ্ধ মানবিক নিয়মকে।

তীব্র সমালোচনা করা হয় নানান ধরনের সামন্ততান্ত্রিক রাজনৈতিক-ব্যবহারশাস্ত্রীয় প্রথা-প্রতিষ্ঠানের। কষাঘাত করা হয় সরকারি কর্মকর্তাদের অনাচারে। প্রাচ্যে দেখা দিতে থাকেন এমন সব চিন্তানায়ক যাঁরা রাষ্ট্রের নাগরিকদের সাম্য সমেত সমস্ত লোকের সাম্যের নীতি প্রচার করেন। এ'দের মধ্যে যাঁরা অগ্রগণ্য তাঁরা বলেন যে রাজার নিরঙ্কুশ ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করা ও জনগণের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করা আবশ্যক। এ কথা বলা যায় যে পশ্চিমে যেমন, তেমনি প্রাচ্যেও সামন্ততন্ত্রের পতন ও বুর্জোয়া ব্যবস্থার অভ্যুদয়ে সমাজজীবনের আত্মিক-ভাবাদর্শীয় ক্ষেত্রে মোটামুটি একই রকমের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল।

*

আধুনিক কালের রাজনৈতিক-তাত্ত্বিক জ্ঞানের অন্তর্বস্তু, রূপ ও বিকাশপ্রবণতা এই ঘটনায় একান্ত প্রভাবিত যে তা দেখা দিয়েছিল ও রূপ নিয়েছিল সামন্ততান্ত্রিক ভাবাদর্শের বিরুদ্ধে সংগ্রামে। সামাজিক অর্থ ও বিশ্ববীক্ষার দিক থেকে এ সংগ্রাম তার জনয়িত্রী মূর্ত-নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল বহুদূর। সামাজিক-শ্রেণীগত মর্মার্থের দিক থেকে তা নাকচ করেছে ঐতিহাসিকভাবে অচল হয়ে পড়া পুরনো সমাজ ব্যবস্থাকে। দর্শন ও বিশ্ববীক্ষার দিক থেকে এ সংগ্রাম পর্যবসিত হয়েছে অচল, সোপানতান্ত্রিক সামাজিক-রাজনৈতিক ব্যবস্থাগুলির রক্ষক ও পরিপোষক ধর্ম, সনাতনী রীতি, চেতনার কর্তৃত্বমূলক ব্যবস্থাদির ফরমান পরিহারে। সতেরো শতক থেকে সামাজিক চিন্তায় ক্রমেই প্রখর হয়ে ওঠে ঈশ্বরতাত্ত্বিক ব্যাপার থেকে রাজনীতি, রাষ্ট্র ও আইনাদির তাত্ত্বিক বিশ্লেষণকে আলাদা করার প্রক্রিয়া।

সমগ্র সামন্ততন্ত্রবিরোধী ভাবাদর্শে প্রধান স্থান পায় সমাজে ব্যক্তির অবস্থা ও ভূমিকা সম্পর্কিত প্রশ্নটি, নতুন রাজনৈতিক-তাত্ত্বিক জ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রযোজিত তার কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়াল নানান অর্থে 'ব্যক্তিসত্তা ও রাষ্ট্রের' সমস্যা। উত্তেজনা সর্বাগ্রে ফু'সে উঠল ব্যক্তি স্বাধীনতার প্রশ্নে,

এযাবৎ এ ব্যক্তি ছিল সম্প্রদায়-ভেদী সমাজের আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা, কঠোর সামন্ততান্ত্রিক ও ধর্মীয় নিয়মানুশাসনের অধীন। প্রথমে জোর দেয়া হয় মানুষের মনন ও সৃজনের স্বাধীনতার ওপর। পরে ব্যক্তির মুক্তির দাবি প্রসারিত হয় তার ক্রিয়াকলাপের আইনী, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও অন্যান্য ক্ষেত্রে।

রাষ্ট্রকে ঘোষণা করা হয় মানবমুক্তির সম্ভাব্য গ্যারান্টি বলে। বিশেষ করে, রাষ্ট্রপাটের সার্বভৌমত্ব, তার উৎস আর প্রাতিষ্ঠানিক রূপ ইত্যাদি নিয়ে রাজনৈতিক তত্ত্বের মূল সমস্যাগুলি বিবেচিত হতে থাকে এই দৃষ্টিকোণ থেকে। বলাই বাহুল্য, এক্ষেত্রে সমাজের ওপর চার্চের একচেটিয়া ক্ষমতার দাবি নাকচ ও গড়ে-উঠতে-থাকা একীভূত জাতীয় রাষ্ট্রের স্বাবলম্বন ও স্বাধীনতার অধিকার সপ্রমাণেরও একটা লক্ষ্য ছিল। তবে সম্ভবত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে সবচেয়ে মূলকথা ছিল ব্যক্তিসত্তার ওপর রাষ্ট্রের প্রভুত্বের সীমা নির্ধারণ, ব্যক্তির ওপর অনুমোদনীয় প্রশাসনিক ক্ষমতার মানদণ্ড নির্ণয়, ইত্যাদি। রাষ্ট্রের কাছে নাগরিকের দায়-দায়িত্বের চেয়ে অনেক বেশি জোর দেয়া হয়েছিল নাগরিকের নিকট রাষ্ট্রের দায়িত্ব ও কর্তব্যের ওপর।

'আইনসঙ্গত রাষ্ট্র', 'আইনের প্রভুত্ব' নিয়ে পশ্চিমে নানা ভাষ্য সূত্রবদ্ধ ও প্রচারিত হতে থাকে। তাতে আইনকে (রাষ্ট্র কর্তৃক ব্যক্তির স্বাধীনতা রক্ষাকারী, সুতরাং জ্ঞানবান ব্যক্তির জীবনের পরিচালক) দেখা হয়েছে মনুষ্য সহবসতির বনিয়াদ ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার ক্রিয়াকলাপের সর্বোচ্চ নীতি হিশেবে।

রাষ্ট্রের ঐশ্বরিকতা লোপ (তাকে ঐহিক বলে স্বীকৃতি), স্বতন্ত্র ব্যক্তিদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণের নীতিপ্রণেতা বলে তাকে দেখায় চূড়ান্তরূপে ফুটে উঠল স্বাভাবিক বিধি ও প্রচলিত আইনের মধ্যে অসঙ্গতি। একমাত্র সত্যকার তাৎপর্যধর আইন (অথবা এমনকি সাধারণভাবেই আইন) এখন ক্রমেই ধরা হতে থাকল কেবল সরকারী সংস্থায় প্রণীত (অথবা অনুমোদিত) আইনকে, প্রয়োজনবোধে যার পালন নিশ্চিত হবে রাষ্ট্রিক বাধ্যবাধকতার জোরে।

অর্থনীতি বহির্ভূত (অর্থাৎ সামন্ততান্ত্রিক-সম্প্রদায়ভেদী, ধর্মীয় ইত্যাদি) বাঁধন থেকে মানুষের মুক্তির কার্যকারণ সম্পর্কে তত্ত্বে এল আদি, প্রাথমিক, যেন-বা সমাজের আগে থেকেই বিদ্যমান স্বয়ংচালিত সত্তা হিশেবে ব্যক্তিমানুষের প্রাধান্য, সমাজের তদ্ভাবিত ও সহায়ক চরিত্রের থিসিস।

নাগরিক সমাজ, 'স্বয়ংচালিত' ও 'স্বাধীন' ব্যক্তিদের সমষ্টিকে ধরা হল মানবজাতির স্বাভাবিক অবস্থা, আর রাষ্ট্র দাঁড়াল স্বতন্ত্র ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ত বিধৃত জনগণের স্বাধীন সুবিবেচিত সংকল্পের, সম্মতির ফল।

আধুনিক কালের রাজনৈতিক মতবাদে একটা অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ স্থান নিয়েছে 'সামাজিক চুক্তির' ধারণাটা। নানাবিধ তার ব্যাখ্যা। বহু ব্যাখ্যাতেই আছে নিজেদের সামাজিক ও দার্শনিক লক্ষ্যের সঙ্গে অসামঞ্জস্য। এই ধারণাটার সাহায্যেই আলোচ্য পর্বের মনীষীরা রাষ্ট্র উদ্ভবের কারণ ও বৈশিষ্ট্য, শাসক ও শাসিতদের মধ্যে সম্পর্কের চরিত্র, রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রতিষ্ঠা ও বৈধীকরণ, রাজনৈতিক আধিপত্যের সংগঠন, বিদ্যমান রাষ্ট্ররূপের পক্ষে যুক্তি ও তা পরিবর্তনের (সংশোধনের) পথ ও উপায়াদি নিয়ে জটিল সব সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেছেন। 'সামাজিক চুক্তি' বিষয়ক ধারণাটির গ্রহণ ও পরিবর্ধন কিংবা তার সমালোচনা ও বর্জন প্রতিফলিত হয়েছে ষোলো-উনিশ শতকের রাষ্ট্র বিষয়ক অনেক মতবাদে।

রাজনীতি, রাষ্ট্র ও আইন নিয়ে গবেষণায় যে পদ্ধতি তখন থেকে কাজ করেছে, তার একটা বৈশিষ্ট্য ও মৌলিকতা আছে। আধুনিক কালে রাজনৈতিক-তাত্ত্বিক জ্ঞানের ইতিহাসের পক্ষে (এ সময়কার সমস্ত বিদ্যার ইতিহাসের পক্ষেই) লক্ষণাত্মক হল পদ্ধতির প্রশ্নে, সত্য আবিষ্কারের পথসন্ধানে তীব্রতর আগ্রহ।

এই মত খুব প্রচলিত হয় যে বাস্তব সত্যের জ্ঞানলাভে যুক্তিবাদই শ্রেয় — সত্তাকে জানতে হবে স্বাধীন ও সংস্কারহীন পথে: যুক্তিসম্মত ভাবনায়, বিবেচনায় নির্দেশিত পরীক্ষায়। উৎপাদনের টেকনোলজিতে, অর্থনৈতিক ও সামাজিক-রাজনৈতিক বাস্তবতায়, সে যুগের বৈজ্ঞানিক ক্রিয়াকলাপে যে প্রগাঢ় পরিবর্তন ঘটেছিল, তারই ভিত্তিতে বেড়ে ওঠে যুক্তিবাদ। তার মোদ্দা কথাটা খুবই সোজা: বিশ্ব গঠিত যুক্তিমতো, ব্যাপার-স্যাপারের প্রকৃতিই হল সামঞ্জস্যানুসারী, মানুষ তাতে তার উপযোগী স্থানেরই অধিকারী। বিশ্বকে জানতে হলে তাকে যুক্তি-সম্বদ্ধ এবং বিভিন্ন অংশে ভাগ-ভাগ করে পরে তাদের 'জুড়তে' হবে বিমূর্তায়নে। প্রাকৃতিক নির্ভরতাকে পুরোপুরি ভেঙে ভেঙে যৌক্তিক সম্পর্কান্বিত করা সম্ভব। এই থেকে দাঁড়ায় যে প্রজ্ঞা নিজের যৌক্তিক মর্মার্থ মেনে নিতে পারলে তার পারিপার্শ্বিক সমস্ত প্রকৃতিরই মর্মোদ্ঘাটনে সে সক্ষম। যুক্তিবাদী পদ্ধতিই ছিল আধুনিক কালের অধিকাংশ মনীষীর জ্ঞানতাত্ত্বিক আশাবাদের ভিত্তি যা তাঁদের বৈশিষ্ট্য।

অতীতের সঙ্গে আমূল সম্পর্কচ্ছেদের প্রেরণায় উদ্দীপিত হয়েছিলেন নবীন, তখনো প্রগতিশীল বুর্জোয়াদের অনেক ভাবপ্রবক্তা। উদীয়মান বুর্জোয়া সমাজকে তাঁরা তুলে ধরেছিলেন সামন্ততন্ত্রের একেবারে বিপরীত হিশেবে। শেষোক্তকে তাঁরা বলতেন অস্বাভাবিক সমাজ ব্যবস্থা, যা প্রজ্ঞার নিয়মাদি ও বিষয়াদির চিরন্তন প্রকৃতির বিরোধী। বুর্জোয়া বৈপ্লবিকতা ইতিহাসের পূর্ববর্তী পর্যায়গুলিকে অদ্বান্দ্বিকভাবে নাকচ করে দেয়, মানুষের মূর্ত-নির্দিষ্ট যে দিকগুলি বস্তুতপক্ষে ব্যক্তির ক্ষেত্রে দেখা দিচ্ছিল পুঁজিবাদী সম্পর্কের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই, তাদের সমষ্টিকেই তা ঘোষণা করে মানুষের অপরিবর্তনীয় মর্মার্থ বলে। এই ধরনের অদ্বান্দ্বিক উপস্থাপন সবিশেষ চোখে পড়ে এই উক্তিতে যে বুর্জোয়া ব্যবস্থাই বুঝি-বা স্বাভাবিক এবং বরাবরের মতো পেয়ে যাওয়া একটা ব্যবস্থা, যা মানুষের চিরন্তন মর্মার্থ থেকে অভিন্ন। এইভাবে সমাজবিদ্যায় প্রবর্তিত হল সামাজিক ঘটনাবলি সম্পর্কে আধিবিদ্যক দৃষ্টিভঙ্গি, যা নিঃসন্দেহেই সেসব ঘটনা সম্পর্কে জ্ঞানকে বিঘ্নিত করেছে। বোঝাই যায় যে প্রক্রিয়াটা রাজনৈতিক-তাত্ত্বিক জ্ঞানের ক্ষেত্রেও ব্যাপ্ত হয়েছিল।

তবে ন্যায়ের খাতিরে এ কথা স্বীকার করা উচিত যে অগ্রণী বুর্জোয়া ভাবাদর্শের অন্তর্নিহিত সামন্ততন্ত্রবিরোধী বিস্ফোরক তাতে অন্য কতকগুলি সদর্থক গুণও বর্তায়। স্বাধীন চিন্তা ও মানবিকতার প্রেরণা, ব্যক্তিসত্তার সামাজিক-অর্থনৈতিক সক্রিয়তা ও তার নাগরিক-চেতন উদ্যমের সমর্থন, অচল হয়ে পড়া প্রাক্‌বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থার সমালোচনা ও মানবেতিহাসের অভিযানী গতিতে বিশ্বাস — নিঃসন্দেহেই এইগুলি, একযোগে আধুনিক কালের দার্শনিক ও সামাজিক-রাজনৈতিক মতবাদে দ্বান্দ্বিক চিন্তার উপাদানও সঞ্চারিত করেছে। দ্বান্দ্বিক প্রবণতা, বাস্তবতার অধ্যয়নে ঐতিহাসিক অভিমুখ মাঝে মাঝেই ভেদ করে গেছে আধিবিদ্যক বিশ্ববোধের সেই সংকীর্ণ সীমা যা সমগ্রভাবে প্রাধান্য করছিল। আধুনিক কালের প্রমুখ মনস্বীদের (যেমন, রুসো) রাজনৈতিক মতবাদে তার উদাহরণ পাওয়া যাবে কম নয়।

এই পর্বে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ওপর ঈশ্বরতত্ত্বের হুকুমদারি অতীতের গর্ভে চলে যেতে থাকলেও তখনো তা বিজ্ঞানের অগ্রগতিকে বিকৃত ও ব্যাহত করছিল। ষোলো-ঊনিশ শতকে যেসকল রাজনৈতিক-তাত্ত্বিক নির্মিতি দেখা দিয়েছে তার অনেকগুলিই ঈশ্বরতাত্ত্বিক ধারণা থেকে মুক্ত ছিল না। কিন্তু সাধারণত তা পর্যবসিত হয়েছে সর্বেশ্বরবাদে, তার সীমান্তে ঐশ্বরিক

প্রেরণা (যা স্বয়ং প্রকৃতি থেকে অভিন্ন) স্বীকারের সঙ্গে সঙ্গে মানবিক প্রেরণাকে দেয়া হয়েছে অপেক্ষাকৃত স্বাধীন একটা স্থান। তা বিচার করতে হবে বিজ্ঞানের পদ্ধতি ও প্রণালীতে।

এইভাবে নতুন ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক চিন্তার নতুন ধারা জন্ম নিয়েছে মোটেই আত্মিক শূন্যতার মধ্যে নয়, বরং সমাজবিকাশের পূর্বতন স্তর থেকে সরাসরি পাওয়া উপকরণ দিয়ে তা গড়ে উঠেছে, যদিও নব সংস্কৃতির ধারকেরা সেগুলিকে আমূল ঢেলে সেজেছেন।

আধুনিক কালের রাজনৈতিক-তাত্ত্বিক জ্ঞান নিঃসন্দেহেই এমন কতকগুলি লক্ষণ আত্মস্থ করেছে, যা তার পক্ষে সাধারণ। তবে তার অর্থ এই নয় যে এই জ্ঞানটা ভাবাদর্শ, বিষয়বস্তু ও পদ্ধতির দিক থেকে একটা অখণ্ড সমগ্র। বরং তার গঠন ছিল বহুধাপী এবং অতি প্রভেদাত্মক।

সামাজিক-শ্রেণীগত দিক থেকে তার সুরটা ছিল সুনিশ্চিতভাবেই পরিষ্কার বুর্জোয়া। কিন্তু বুর্জোয়ারা নিজেরাই একটা সমপ্রকৃতির সামাজিক গ্রুপ ছিল না। তাদের মধ্যে ছিল এবং পরস্পর প্রতিযোগিতা চালাত (প্রায়ই অতি হিংস্র) বিভিন্ন উপদল: তাদের এক প্রান্তে ছিল খুবই নরমপন্থীরা, সামন্ততান্ত্রিক-রাজতান্ত্রিক মহলের সঙ্গে আপোস করতে রাজি, অন্য প্রান্তে চরম র‍্যাডিকেলপন্থী, তারা প্রকাশ করত জঙ্গী মেজাজের পেটি বুর্জোয়ার স্বার্থ, যারা ছিল 'সূর্যের নিচে' নিজেদের জায়গা করে নেবার জন্য চেষ্টিত। এক-একটা দেশের ঐতিহাসিক বিকাশের বৈশিষ্ট্য, শ্রেণী সংগ্রামের তীব্রতার মাত্রা, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের বৈশিষ্ট্য ইত্যাদির কারণে বুর্জোয়াদের এক-একটা জাতীয় বাহিনীর (নেদার্ল্যাণ্ডীয়, ব্রিটিশ, ফরাসি, জার্মান, জাপানি প্রভৃতি) রাজনৈতিক ভাবাদর্শের মধ্যেও পার্থক্য কম দেখা যায় নি। আধুনিক কালের প্রাধান্যকারী রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিকে বুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গি হিশেবে সাধারণ মূল্যায়ন করার সময় এই ঘটনাগুলিকে অবশ্যই মনে রাখা দরকার।

তবে এ ব্যাপারটা দৃষ্টিচ্যুত করা অনুচিত যে বুর্জোয়া রাজনৈতিক ভাবাদর্শের (বিশেষ করে তার মধ্যেকার বৈপ্লবিক-গণতান্ত্রিক ধারার) ওপর তীব্র আক্রমণ চালানো হয় সামন্ততান্ত্রিক-ধর্মীয় প্রতিক্রিয়ার পক্ষ থেকে। প্রাণপণে তা অতীতকে আঁকড়ে থাকছিল, সর্বোপায়ে প্রতিরোধ করছিল সমাজজীবনের গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক-রাজনৈতিক নবায়নের। পুঁজিবাদ যা বহন করে এনেছিল, তেমন এক-একটা স্ববিরোধ ও অভিশাপ তারা মাঝে মাঝে সঠিকভাবেই দেখাতে পেরেছে; বুর্জোয়া রাজনৈতিক

চিন্তার দূর্বল জায়গাগুলো খুঁজে পেয়েছে। কিন্তু সাধারণভাবে ও সমগ্রত পুরনো সামাজিক শ্রেণীগুলির ভাবাদর্শীদের দৃষ্টিভঙ্গি রাজনৈতিক-ব্যবহারশাস্ত্রীয় জ্ঞানের বিকাশে পালন করেছে নেতিবাচক ভূমিকাই। দৃষ্টান্ত হিশেবে এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যেতে পারে ফ্রান্সে দিব্য শাসনতন্ত্রবাদী স্কুল [৩] (জ. দে মেস্ত্র, দে বনাল্দ), গ. হুগো এবং আ. মুলার (জার্মানি), ক. গালের (সুইজারল্যান্ড) ইত্যাদির রচনা।

সাম্প্রতিক কালে নবীন ও পুরাতন উভয় ধরনের শোষক শ্রেণীর রাজনৈতিক মতবাদের বিরুদ্ধে দাঁড়ায় নিপীড়িত, শোষিত মেহনতি জনের ভাবাদর্শ। তার তাত্ত্বিক উৎস হল ট. মুনট্সার, ট. মুর, ট. কাম্পানেলার রচনা। শেষ বিচারে বুর্জোয়ারা যেক্ষেত্রে লড়েছে ব্যক্তিগত সম্পত্তির স্বাধীনতার জন্য, সেক্ষেত্রে দরিদ্রতম, রাজনৈতিক ও সামাজিক দিক থেকে অধীকারহীন জনগণের মতপ্রবক্তারা সম্পত্তির এই জগৎটাকেই সমালোচনা করেছেন, অভিশাপ দিয়েছেন। বুর্জোয়াদের চিন্তানায়কেরা যেক্ষেত্রে রাষ্ট্রকে দেখতে ইচ্ছুক পুঁজিবাদী, ব্যক্তিমালিকি ব্যবস্থা বজায় রাখার জামিনদার হিশবে, সেক্ষেত্রে মেহনতিদের মতপ্রবক্তারা এমন রাষ্ট্রের জন্য লড়েছেন যা সম্পত্তির সর্বজনীন স্বত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত যৌথ ব্যবস্থাকে রক্ষা ও সমর্থন করবে। প্রাক্‌মার্কসীয়, বুর্জোয়াবিরোধী রাজনৈতিক ভাবাদর্শ একটি শীর্ষবিন্দুতে পেঁছায় মহান বিপ্লবী-কমিউনিস্ট গ্রাখাস বাবেফ (১৭৬০-১৭৯৭) এবং উনিশ শতকের প্রথমার্ধে তাঁর অনুগামীদের (ফ্রান্সে ও. ব্লাঙ্কি ও ত. দেজামি, ইংলন্ডে জ. ব. ও'ব্রাইন, জার্মানিতে ভ. ভেইটলিঙ্গ) মতবাদে। ব্যক্তিমালিকি আমল আর শোষকদের রাজনৈতিক আধিপত্যের বৈপ্লবিক উচ্ছেদ ও জনক্ষমতা প্রতিষ্ঠার জন্য বাবেফপন্থা ও নয়া বাবেফপন্থার আহ্বান রাষ্ট্র বিষয়ে বৈজ্ঞানিক প্রলেতারীয় তত্ত্বের প্রস্তুতিতে এক মূল্যবান অবদান।

আলোচ্য যুগের রাজনৈতিক-তাত্ত্বিক জ্ঞানের নীতিগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ আরেকটা দিকের কথাও বলা উচিত। এ জ্ঞান কখনো নিশ্চল অবস্থায় থাকে নি, সমাজে অর্থনৈতিক, সামাজিক-রাজনৈতিক ও অন্যান্য প্রক্রিয়া সাধিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঐতিহাসিক ঘটনার গতিপথে তা বিবর্তিত ও রূপান্তরিত হয়েছে। জ্ঞানের এই বিবর্তনের পথে বিরাট একটা জলবিভাজিকা হল বুর্জোয়া বিপ্লবগুলি। রাষ্ট্রক্ষমতা অধিকার করতে সচেষ্ট বুর্জোয়ার রাজনৈতিক ভাবনা বহু দিক দিয়ে রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত বুর্জোয়া শ্রেণীর সমগ্র রাজনৈতিক-ব্যবহারশাস্ত্রীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে

প্রকটরূপে পৃথক। বুর্জোয়া বিপ্লবের প্রস্তুতির পর্যায়, বিপ্লব সাধনকালের পক্ষে যা টিপিক্যাল তেমন সৎসাহসী গণতান্ত্রিক ধ্বনি ও কর্মসূচি থেকে উদারনৈতিক-রক্ষণশীলতা, এমনকি পশ্চাদগামিতার দিকে প্রচন্ড মোড় সুস্পষ্ট চোখে পড়ে, সেই সঙ্গে রাজনীতি, রাষ্ট্র ও আইন নিয়ে গবেষণায় সমানে নির্বিচার পজিটিভিজম দেখা যাচ্ছে বিপ্লবোত্তর পর্বে।

রাজনৈতিক মতাবাদের বহু যুগব্যাপী ইতিহাসে আধুনিক কাল নিঃসন্দেহেই অতি উজ্জ্বল ও উল্লেখযোগ্য একটি পৃষ্ঠা। এই পর্বে রাষ্ট্র ও আইন বিষয়ে অনেক চিত্তাকর্ষক ও ফলপ্রসূ ধ্যানধারণা দেখা দিয়েছে, শ্রেণীসমাজে গুরুত্বপূর্ণ এইসব প্রথা-প্রতিষ্ঠানের প্রামাণিক গবেষণায় লক্ষিত হয়েছে সারগর্ভ পদ্ধতিমূলক অভিমুখ।

আধুনিক কাল বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য এই জন্য যে ঠিক এরই চৌহদ্দির মধ্যে প্রাক্‌মার্কসীয় বিশ্ব দার্শনিক ও সামাজিক-রাজনৈতিক চিন্তায় শ্রেষ্ঠ যা কিছু পাওয়া গেছে তার প্রগাঢ় সমালোচনামূলক বিচার ও সৃজনশীল আত্তীকরণের ভিত্তিতে রাষ্ট্র ও আইন সম্পর্কে তাত্ত্বিক জ্ঞানের ক্ষেত্রে ঘটেছে মহত্তম এক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার — গড়ে উঠেছে রাষ্ট্র ও আইনের দ্বান্দ্বিক-বস্তুবাদী তত্ত্ব।



§ ২। নিকোলো মাকিয়াভেলি

১৪৬৯ সালের মে মাসে পূর্ণ হয়েছে নিকোলো মাকিয়াভেলির (১৪৬৯-১৫২৭) ৫০০তম জন্মবর্ষ। মাঝে মাঝে তাঁকে বলা হয় সিজারের পরবর্তী সবচেয়ে স্বনামধন্য ইতালিয়ান। তাঁর মতবাদ থেকে দেখা দিয়েছে আশ্চর্য রকমের বেশি পরস্পরবিরোধী ব্যাখ্যা। মাকিয়াভেলির রচনার একদেশদর্শী গুণগ্রাহীদের মধ্যে ছিলেন রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তা, যাজক, বিজ্ঞানী ও প্রচারক-প্রাবন্ধিকেরা। প্রখ্যাত এই ফ্লোরেন্স-বাসীর দৃষ্টিভঙ্গির নির্মম সমালোচনা হয়েছে তার সাধুবাদের চেয়ে বেশি। যে ভাবাদর্শীয় উত্তরাধিকার তিনি রেখে গেছেন, তা নিয়ে উত্তপ্ত বিতর্ক আজো থামে নি।

'মাকিয়াভেলিজম' বা 'মাকিয়াভেলিপনা'

কথাটা হয়ে দাঁড়িয়েছে রাজনৈতিক জীবনের কুটিল কুৎসিত দিকটার সমার্থক, কিন্তু সেটা ঘটেছে এই মনীষীর মতবাদের ভুল ব্যাখ্যা ও তাঁর ব্যক্তিগত প্রত্যয়ের ভ্রান্ত বোধ থেকে। ওদিকে আবার বিজ্ঞানী ও প্রাগ্রসর মতামতের লোক হিশেবে মাকিয়াভেলির সমর্থনে দাঁড়িয়েছেন বেকন আর হেগেল, স্পিনোজা আর রুসো। উনিশ শতকের ইতালির বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদীরা তাঁকে নিজেদের ভাবাদর্শীয় অনুপ্রেরক বলে ঘোষণা করে।

মাকিয়াভেলির রাজনীতি বিষয়ক ভাবনাচিন্তায় লোকেদের আগ্রহ কেন ক্ষীণ হচ্ছে না, তার কারণগুলো পরিষ্কার করে না নিলে তাঁর মতবাদের মূল কথাটা বোঝা যাবে না। বৈরগর্ভ শ্রেণী সমাজে রাজনৈতিক সংগ্রামের পদ্ধতিগুলিকে তিনি যে তাঁর সূত্রোক্তিগুলিতে বিরল সাহস ও বৈজ্ঞানিক যাথার্থ্যে বিবৃত করেছেন, তাতে কেবল অংশতই ব্যাখ্যাত হয় কেন তাঁর রচনাগুলির আকর্ষণ অক্ষীয়মাণ।

এক অর্থে জোর দিয়ে বলা যায় যে মাকিয়াভেলির দীপ্তোক্তিগুলিতে শোষক সমাজের যে রাজনৈতিক মাকিয়াভেলিজম অমন প্রখর ও মোক্ষম আকারে বিধৃত হয়েছে তার ভাগ্য ঐ সমাজের রাজনৈতিক ব্যবস্থা থেকে অভিন্ন। 'সার্বভৌম' গ্রন্থটির রচয়িতার মৃত্যুর পর পাঁচ শতক ধরে রাজনৈতিক আলোচনা ও বিতর্কে মাকিয়াভেলিজমের যে অভিযোগ উঠছে, সেটাই তার ভালোরকম প্রমাণ এবং এক্ষেত্রে সেটা সামন্ত না বুর্জোয়া, রক্ষণশীল না উদারনীতিক, কাদের কাছ থেকে উঠছে সেটার কোনো তাৎপর্য নেই।

রাজনৈতিক ভাবনার ইতিহাস থেকে আমরা জানি যে শ্রেণী সংগ্রাম, সর্বাগ্রে রাষ্ট্র চালনার সুযোগের জন্য সংগ্রামের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রাজনীতির চর্চা একটা অনুকূল ভিত্তিভূমি পেয়েছিল গ্রীসে ও ইতালীয় নগর-প্রজাতন্ত্রগুলিতে। ঠিক এথেন্সেই, তথা কয়েকটি ইতালীয় কমিউনে, সর্বাগ্রে ফ্লোরেন্সে শাসকরূপী জনগণের সজীব অংশগ্রহণে গণতান্ত্রিক ধরনের শাসনের পর্ব দেখা দিয়েছিল, সেটা রাষ্ট্র ও ক্ষমতার রাজনৈতিক প্রকৃতি বিষয়ে তাত্ত্বিক, বিশেষ করে সমাজতাত্ত্বিক সাধারণীকরণের সম্ভাবনা অনেক বাড়িয়ে দেয় (প্রথম ক্ষেত্রে ক্ষমতা ধরত দাসমালিক, স্বাধীন লোকেরা, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে পরদেশী ও কৃষকদের শোষক, সুবিধাপ্রাপ্ত নাগরিকেরা)।

এই ধরনের পর্যবেক্ষণ ও সাধারণীকরণের গতিপথে জন্ম নিল রাজনীতি বিজ্ঞান, তার কেন্দ্রীয় স্থানে রইল রাষ্ট্র, তার রাজনৈতিক গঠন সম্পর্কে

মতবাদ। প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় লেখকদের ধারণায় রাষ্ট্র নানা ধরনের ব্যবহারিক ক্রিয়াকলাপের কেন্দ্রবিন্দু, যার সাহায্যে শাসকেরা নিজেদের ক্ষমতার ন্যায্যতা প্রতিপাদন করত ও তা ধরে রাখত এবং শাসিতদের সক্রিয় সম্মতি লাভ করত।

বেশ বোঝা যায় যে এই পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক জ্ঞান ও রাষ্ট্রচালনার বিদ্যা হয়ে ওঠে সংগ্রামের একটা হাতিয়ার। রাজনৈতিক জ্ঞান থেকে পাওয়া যেত রাজনৈতিক জীবনের ক্ষেত্রে একসারি টিপিক্যাল যন্ত্রব্যবস্থা ও পদ্ধতির ধারণা। সেগুলির লক্ষ্যমুখিতা থাকত বিভিন্ন, কিন্তু সর্বদাই তা রাজনৈতিক প্রভুত্বের এক-একটা প্রকারভেদের রূপলাভ, শক্তিবৃদ্ধি অথবা পতনের গতিপথে পুরোপুরি সুনির্দিষ্ট সামাজিক-শ্রেণীগত স্বার্থের সেবা করেছে।

রাজনৈতিক জ্ঞানের কাজ ছিল শাসকদের শুধু বর্তমানের দিকে নয়, পূর্বপ্রতিভাত ভবিষ্যতের দিকেও দৃষ্টি ফেরানো, তার জন্য প্রয়োজন ছিল— সমাজতাত্ত্বিক ও অর্থনৈতিক ভাবনায় যত তথ্য পাওয়া গেছে, নীতিশাস্ত্রীয় ও সদাচার এবং ব্যবহারিক হিতকরতার দিক থেকে যা সঙ্গত প্রমাণিত হয়েছে, তাদের অতি যথাযথ হিসেব রাখা। তাছাড়াও প্রয়োজন ছিল উদ্ভূত সিদ্ধান্তকে নগর-রাষ্ট্রে প্রাধান্যকারী স্বার্থের সঙ্গে সাধারণভাবে খাপ খাইয়ে নেয়া।

সামাজিক বিরোধ, যুদ্ধ ও শান্তির পালা বদল, অচলতা আর দ্রুত অগ্রগতি অথবা অবক্ষয়ের প্রখর দৃশ্য রাজনৈতিক চিন্তানায়কদের ঠেলে দিয়েছিল আদর্শ ও অটুট সমাজব্যবস্থার সন্ধানে, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তা বাস্তবতার সঙ্গে আপোসের রূপ নেয়, তাতে থাকে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানাদি সংস্কারের নরমপন্থী আহ্বান, কিন্তু তা সমাজে সম্পত্তি ও ক্ষমতার ওপর খবরদারি করার যন্ত্রব্যবস্থাটা ছোঁয় না বা ভালোমতো বদলায় না।

মাকিয়াভেলির রাজনৈতিক ধ্যানধারণা গড়ে ওঠে তাঁর পর্যবেক্ষিত রাজনৈতিক সংঘর্ষ ও সংগ্রামের প্রভাবে, কিন্তু তাঁর প্রধান লক্ষ্য ছিল বিদ্যমান রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানাদির সংস্কার এবং এই নতুন সামাজিক ব্যবস্থার যুক্তিসিদ্ধতা প্রতিপাদন। এই থেকেই তাঁর অখণ্ড মনোযোগ নিবদ্ধ হয়েছে কেবল বিদ্যমান রাজনৈতিক গঠন ও শক্তির বিন্যাসেই নয়, রাজনৈতিক প্রক্রিয়াগুলিতেও, বিশেষ করে যেগুলি রাজনৈতিক সংস্কার ও বিপ্লবের সহগামী। এদিক থেকে মাকিয়াভেলি অংশত অনুবর্তন করে

গেছেন আরিস্টটলের ঐতিহ্য, যিনি প্রথম রাষ্ট্রের প্রাণশক্তিকে অনুধাবন করতে শুরু করেন তার গতিক্রিয়ায়।

মাকিয়াভেলি রেনেসাঁস ও সংস্কারের যুগ, জাতীয় আয়তনে ঐক্যবদ্ধ ও রাজনৈতিকভাবে স্বাধীন রাষ্ট্র গড়ে উঠতে থাকার যুগটার লোক। তিনি যেখানে থাকতেন ও কাজ করতেন, সেই নগর-প্রজাতন্ত্র ফ্লোরেন্স ইউরোপের তেমন একটি রাষ্ট্র যারা প্রথম মধ্যযুগীয় বর্বরতা বিদীর্ণ করে নতুন ধরনের, বুর্জোয়া রাষ্ট্র গঠনের চেষ্টা করেছিল।

২৯ বছর বয়সে মাকিয়াভেলি প্রজাতন্ত্র সরকারে সচিবের চাকরি নেন। চোদ্দ বছর ধরে তিনি কর্মসূত্রে খুবই জটিল দায়িত্ব নিয়ে একগুচ্ছ কূটনৈতিক সফর সারেন, যান বিভিন্ন ইতালীয় সার্বভৌম ও প্রজাতন্ত্রগুলির সরকার, পোপ, জার্মান সম্রাট ও ফরাসি রাজার কাছে। একটি সামরিক কমিশনের সচিব হিশেবে তিনি হয়ে দাঁড়ান যুদ্ধাভিযানগুলির সংগঠক ও অংশী, প্রজাতন্ত্রের অনিয়মিত রক্ষিবাহিনী গঠনের উদ্যোগ নেন তিনি। ফ্লোরেন্সের প্রজাতান্ত্রিক সরকার উচ্ছেদ হবার পর পদচ্যুতি, কারাবাস ও রাজনৈতিক হীনতা সত্ত্বেও তিনি প্রজাতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি ও দেশপ্রেমিক মনোভাবে বিশ্বস্ত থাকেন। জনৈক কার্ডিনালের সচিব হবার আমন্ত্রণ এবং ফ্রান্সের রাজার চাকরিতে যাবার সুযোগ তিনি প্রত্যাখ্যান করেন।

রাষ্ট্রীয় ক্রিয়াকলাপ থেকে সরে যাওয়ায় রাজনৈতিক শক্তিগুলির খেলা লক্ষ করা ও খতিয়ান টানার সুযোগ পান তিনি, পারিপার্শ্বিক জগৎ সম্পর্কে জ্ঞানে এল একটা নতুন, তাজা দৃষ্টিভঙ্গি।

এই বছরগুলিতেই তিনি লেখেন 'সার্বভৌম' (১৫১৩), 'টিটাস লিবিয়াসের প্রথম দশাহ নিয়ে বিচার' (১৫১৩-১৫১৬), 'স্বর্ণ গর্দভ' (১৫১৬-১৫১৭), কমেডি 'মান্দ্রাগোরা' (১৫১৮), গবেষণাগ্রন্থ 'যুদ্ধবিদ্যা' (১৫১৯-১৫২০), 'ডিউক লোরেনৎসোর মৃত্যুর পর ফ্লোরেন্সের ব্যাপারাদি সুশৃঙ্খল করার উপায় নিয়ে আলোচনা' (১৫২০) এবং আরো কতগুলি রচনা।

মাকিয়াভেলির দশ-খন্ড রচনাবলি তিনটি প্রধান ভাগে বিভক্ত — রাজনীতি, ইতিহাস ও কল্পাখ্যান। অতি বিস্তারিত চতুর্থ বিভাগটি গড়ে উঠেছে কূটনৈতিক ও ব্যক্তিগত পত্রাবলি দিয়ে, এটিকে বলা যায় প্রথম তিনটি বিভাগের ওপর অতি মূল্যবান টীকা।

চাকরিতে থাকার সময় মাকিয়াভেলি হাজার হাজার কূটনৈতিক পত্র, রিপোর্ট, সরকারি আজ্ঞা, সামরিক নির্দেশ রচনা করেন, রাষ্ট্রীয় আইনের

মুসাবিদাও করেন তিনি। তাঁর মতো অনুসন্ধিৎসু ও অন্তর্ভেদী পর্যবেক্ষকের কাছে কূটনীতিক ও রাষ্ট্রিক সংগঠকের অভিজ্ঞতা ভাবনাচিন্তা ও সিদ্ধান্তের সমৃদ্ধ খোরাক জুগিয়েছিল। এর অনেকগুলি প্রথমে কর্মস্থলে নথিভুক্ত হয়ে থাকে, পরে সেগুলি তাঁর রচনার অন্তর্ভুক্ত হয়।

মাকিয়াভেলি তাঁর রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক রচনাগুলির মুখ্য উদ্দেশ্য সূত্রবদ্ধ করেন এই বলে: 'নূতন ও পুরাতন কাল সম্পর্কে আমি যা জানি, তা খোলাখুলি বলব, যাতে আমার লেখা যে যুবজন পড়বে তাদের মন প্রথমোক্তটা বর্জন করে ও দ্বিতীয়োক্তটা অনুকরণ করতে শেখে... কেননা প্রত্যেকটি সৎ মানুষের কর্তব্য হল দুঃসময় ও ভাগ্যের খলতায় যে শুভটা সে নিজে সাধন করতে পারে নি, সেটা অন্যদের শেখানো এই আশা নিয়ে যে এ ব্যাপারে তারা হবে বেশি পারদর্শী' ('বিচার', খণ্ড ২, উৎসর্গ)।

বাস্তব রাজনৈতিক অবস্থার সঙ্গে প্রাচীন কালের ক্ল্যাসিক নিদর্শনগুলির তুলনা ও সম্মিলনের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত টানা ও সাধারণীকরণের পদ্ধতি মাকিয়াভেলির 'সার্বভৌম', 'ফ্লোরেন্সের ইতিহাস' এবং যা থেকে উদ্ধৃতি দেয়া হল সেই 'বিচার' — সকল গ্রন্থেই প্রধানত অনুসৃত হয়েছে। এইভাবে এগুনোয় 'প্রাচীন কালে কল্পিত প্রত্যাবর্তন আর জায়মান নয়া দুনিয়ার মূলকথার আধ্যাত্মিক উপলব্ধির তাগিদের ভেতর' রেনেসাঁসের এই চিন্তানায়কের দোলায়মানতা অনুভূত হয় স্পষ্টতই।

মাকিয়াভেলির রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির কেন্দ্রে ছিল রাষ্ট্র বিষয়ে তাঁর মতবাদ। এতে তিনি আধুনিক বুর্জোয়া সমাজবিদ্যা সম্পর্কিত প্রায় সমস্ত সমস্যাকেই আগেই অনুমান করতে পেরেছিলেন। রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানাদি বিশ্লেষণ করার দুটি পথ তিনি পরিষ্কার চিহ্নিত করে দেন: তুলনামূলক অধ্যয়নের পথ — ইতালির, বিশেষ করে ফ্লোরেন্সের এবং ফ্রান্স ও জার্মানির প্রতিষ্ঠানগুলির পর্যবেক্ষণ ও তুলনা মারফত তিনি নিজেই এ পদ্ধতির সার্থক প্রয়োগ ঘটিয়েছেন; দ্বিতীয় পথটা হল ঐতিহাসিক-অনুশাসনিক: রাষ্ট্র ও আইন, ব্যক্তিসত্তা ও রাষ্ট্র, ধর্মীয় ও ঐহিক ক্ষমতা, সামরিক সংগঠন ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার পারস্পরিক সম্পর্ক, বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় কাঠামো ও শাসনের (বিশেষ করে প্রজাতান্ত্রিক ও রাজতান্ত্রিক) উদ্ভব, বিবর্তন, অপসারণের প্রশ্ন। রাজনীতিকে স্বার্থে স্বার্থে অবিরাম সংঘাত ও সংগ্রাম হিশেবে দেখায় স্বকালের রাজনৈতিক পরিবর্তন ও প্রক্রিয়াগুলির একটা বাস্তব ছবি তিনি দিতে পেরেছেন।

এর ফলে রাষ্ট্রীয় জীবন ও তার মূল প্রতিষ্ঠানগুলি সংক্রান্ত চিরাচরিত প্রসঙ্গাদির ওপর নতুন আলোকপাত করা সম্ভব হয়েছে তাঁর পক্ষে।

পরিশেষে তাঁর 'সার্বভৌম' গ্রন্থে তিনি বুর্জোয়া পক্ষপাতী রাজনৈতিক সংস্কারকের একটা টাইপ উপস্থিত করেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে এরূপ শাসক-সংস্কারকের ক্ষমতার সংরক্ষণ ও পোষকতার যেসব পথ ও উপায় তাঁর কল্পনায় এসেছে, তাও বর্ণনা করেছেন।

মাকিয়াভেলি যে প্রাচীন রাজনৈতিক ধ্যানধারণার দ্বারস্থ হন, তারও একটা সদর্থক তাৎপর্য ছিল, কেননা প্রাচীন লেখকেরা রাষ্ট্রকে ঐহিকভাবে দেখেন, যাতে ঈশ্বরতাত্ত্বিক স্তর গজায় নি। ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি আয়ত্ত করে এবং পবিত্র শাস্ত্রের যুক্তি গ্রহণে অস্বীকৃত হয়ে তিনি বাস্তব রাজনীতির ঘটনাগুলি দেখতে শুরু করেন স্বাভাবিক, প্রাকৃতিক ঘটনার মতো। ঈশ্বরতত্ত্ব ও ঘুমপাড়ানি পণ্ডিতিপনা থেকে রাজনৈতিক চিন্তার মুক্তি ছিল আধুনিক রাজনীতিবিদ্যা প্রবর্তনে প্রথম পদক্ষেপ এবং সেটা করেন মাকিয়াভেলি*। এসবের ফলে বুর্জোয়া রাষ্ট্রবিদ ও সমাজবিদদের পরবর্তী পুরুষদের পক্ষে সম্ভব হয়েছে এই প্রখ্যাত ফ্লোরেন্সবাসীকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের নিউটন ও আধুনিক কালের প্রথম রাজনৈতিক চিন্তানায়ক বলে অভিহিত করার।

সাহিত্যে 'রাষ্ট্র' ('stato') কথাটির প্রবর্তন নিঃসন্দেহেই মাকিয়াভেলির একটা বড়ো অবদান। ইতালীয় ভাষায় 'stato' পরিভাষার কিছু অতিরিক্ত তাৎপর্য আছে, যেমন, পরিস্থিতি, অবস্থা, পদ, বৃত্তি, সম্প্রদায়। ১৬ শতকে প্রচলিত প্রজাতন্ত্র, রাজ্য, রাজত্ব, ক্ষমতা, সাম্রাজ্য, নগর, প্রশাসন, স্বেচ্ছাতন্ত্র, রাজতন্ত্র প্রভৃতি রাজনৈতিক কথার মধ্যে মাকিয়াভেলি প্রবর্তিত পরিভাষাটি তুলনায় নতুন।

মাকিয়াভেলির stato-তে বোঝায় মূর্ত-নির্দিষ্ট রূপ নির্বিশেষে রাষ্ট্রের সাধারণ বোধ; তার কাজ সমাজের রাজনৈতিক অবস্থা, তার নির্দিষ্ট রাজনৈতিক সংগঠনের চরিত্র নির্ণয়।

রাষ্ট্র সম্পর্কে মাকিয়াভেলির এরূপ দৃষ্টিভঙ্গি এসেছিল নতুন রাষ্ট্র ব্যবস্থার উদ্ভব ও শক্তিসঞ্চয়ের শর্ত অনুধাবন করে। এই প্রসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য ধরে রাষ্ট্রীয় শাসনের রূপের উদ্ভব, বিবর্তন ও অপসারণ আর সাধারণ রাষ্ট্রিক গঠনের প্রশ্নাদি।

কিছু কিছু প্রাচীন লেখকদের অনুসরণে মাকিয়াভেলি উল্লেখ করেছেন ছয় ধরনের সরকারের (বা আধুনিক পরিভাষায়, রাষ্ট্রশাসনের রূপের)। '...তাদের তিনটি সব দিক থেকে খারাপ, অন্য তিনটি এমনিতে ভালো, কিন্তু যেহেতু তাদের পোষকতা করা কঠিন, তাই তারাও হয়ে দাঁড়ায় ধ্বংসশীল।' শাসনের 'খারাপ' ব্যাপারগুলো প্রতিবর্তী ভালোর এতই অনুরূপ যে তারা সহজেই এক থেকে অন্যটায় পরিবর্তিত হয় — রাজতন্ত্র অনায়াসে পরিণত হয় স্বৈরশাসনে, অভিজাততন্ত্র -- অত্যল্প সংখ্যালঘুর শাসনে (গোষ্ঠীতন্ত্রে); জনশাসন (গণতন্ত্র) — একেবারে বিশৃঙ্খলায় (জনতাতন্ত্রে) ('বিচার', খণ্ড ১, অধ্যায় ২)।

রূপগুলি পরিবর্তিত হয়েছে নির্দিষ্ট একটা ধারায়। রূপান্তরের প্রাথমিক শৃঙ্খলটা এইরকম: রাজতন্ত্র, স্বৈরশাসন, অভিজাততন্ত্র, গোষ্ঠীতন্ত্র, গণতন্ত্র, জনতাতন্ত্র। মাকিয়াভেলির মতে, রাজতন্ত্র যে স্বৈরশাসনে রূপান্তরিত হয় তার কারণ প্রাচীন কালে একসময় নেতা 'করা হতে' থাকল নির্বাচন মারফত নয়, বংশানুক্রমে; ক্রমশ এই বংশধরেরা ভুলে গেল পূর্বপুরুষদের পুণ্যকর্ম, দ্রুত অধঃপতিত হতে শুরু করল, হয়ে দাঁড়াল কাপুরুষ, ভীতিবশে আশ্রয় নিল উৎপীড়নের। এইভাবেই দেখা দেয় স্বৈরশাসন।

ধীরে ধীরে স্বৈরাচারী শাসকদের বিরুদ্ধে, প্রায়ই ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে, মিলিত হয় ও এগিয়ে আসে একদল লোক যারা মহানুভবতায়, আভিজাত্যে, ঐশ্বর্যে, বনেদিয়ানায় উঁচু হয়ে উঠেছিল অন্য সকলের চেয়ে। তারা এইসব স্বৈরশাসকের দৌরাত্ম্যমূলক অস্তিত্ব সইতে পারে নি। তাদের দ্বারা পরিচালিত জনতা স্বৈরপ্রভুর বিরুদ্ধে সশস্ত্র হয়ে তাকে হত্যা করে নিজেদের পরিত্রাতারূপ নেতাদের অধীনস্থ হয়।

বিজয়ী অভিজাতরা নিজেদের প্রতিনিধি দ্বারা সরকার গঠন করে এবং প্রথম দিকে নিজেদের প্রণীত আইন অনুসারে শাসন চালায়, 'নিজস্ব

লাভালাভকে সাধারণ হিতের অধীনস্থ করে, সামাজিক কাজ ও নিজের বিষয়আশয় চালাতে থাকে সমান উদ্যোগে'। তবে শাসন যখন শাসকদের সন্তানদের হাতে এল, যারা 'ভাগ্যের বিড়ম্বনা জানত না, দুঃখ ভোগে নি এবং নাগরিক সমতায় তুষ্ট থাকতে অনিচ্ছুক', তখন পরিবর্তন পরিপক্ক হয়ে উঠতে শুরু করে। লোভ, অহমিকা ও নাগরিক অধিকার-দমনের বশবর্তী হয়ে এই নতুন শাসকেরা অভিজাততান্ত্রিক শাসনকে পরিণত করল গোষ্ঠীতন্ত্রে।

অচিরেই গোষ্ঠীতন্ত্রীদের সেই একই ভাগ্য ঘনাল যা ঘটেছিল স্বৈরশাসকদের ক্ষেত্রে। তাদের শাসনে অসন্তুষ্ট 'জনতা' তেমন সবার অস্ত্রে পরিণত হল 'যারা এইসব শাসকদের হাত থেকে তাদের মুক্ত করার প্রস্তাব দিচ্ছিল; এবং শীঘ্রই এমন ব্যক্তি দেখা দিল যে জনতার সাহায্যে উচ্ছেদ করল এই শাসকদের'। গোষ্ঠীতন্ত্রীদের ক্ষমতা চূর্ণ করে এবং রাজতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে না চেয়ে লোকে প্রবর্তন করল জনশাসন, এমন ব্যবস্থা যাতে অভিজাত, রাজা, কারুরই কোনো ক্ষমতা থাকবে না। মাকিয়াভেলির মতে, জনশাসন হল সবচেয়ে স্বল্পস্থায়ী একটা রূপ; তা কিছুকাল টিকে থাকতে পারে ('যতদিন না তার প্রতিষ্ঠাতা প্রজন্ম অন্তর্ধান করছে') সর্বাগ্রে এই কারণে যে 'প্রথম দিকে সব রকমের রাষ্ট্র ব্যবস্থাই শ্রদ্ধা পেয়ে থাকে'। জনশাসন একটা নড়বড়ে ব্যবস্থা, তাতে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে 'পরিপূর্ণ বিশৃঙ্খলা, যেখানে কোনো ব্যক্তি, কোনো সামাজিক কর্মকর্তা কারুর মনে কোনো শ্রদ্ধার উদ্রেক করে না, কেননা প্রত্যেকেই থাকে নিজের মতো এবং সবাই পরস্পরের হাজারো ক্ষতি করে'।

এই বিশৃঙ্খল অবস্থা থেকে মুক্তির জন্য লোকে ফের রাজতন্ত্রের দ্বারস্থ হয়েছে এবং পুনরায় ক্রমশ বিশৃঙ্খলায় প্রত্যাবর্তন করেছে 'সেই একই পথে এবং সেই একই কারণের দরুন। সমস্ত প্রজাতন্ত্রের শাসন এই বৃত্তে ঘুরেছে ও ঘুরছে; তবে এ শাসন যেখান থেকে যাত্রা করেছিল ঠিক সেখানে ফেরে কদাচিৎ, কারণ ধ্বংস না পেয়ে এ বৃত্তে কয়েকবার পাক দেবার মতো প্রাণশক্তি তার কদাচিৎ থাকে' ('বিচার', খণ্ড ১, অধ্যায় ২)।

শাসনের রাষ্ট্ররূপ ও আমলের বৃত্তাবর্তনের যে কথা এখানে বলা হয়েছে তা স্পষ্টতই প্রাচীন লেখকদের কাছ থেকে নেয়া (প্লেটো, আরিস্টটল, পোলিবিয়াস); তবে নতুন ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে তার উপস্থাপনে মাকিয়াভেলি বেশ কয়েকটি মূল্যবান সংশোধন করেছেন। যেমন, ঈশ্বরতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা বর্জন করে তিনি রাষ্ট্রবিদ্যার বিশুদ্ধ অভিজ্ঞতালব্ধ,

ঐহিক নীতি আবিষ্কারের চেষ্টা করেছেন। শাসনরূপের পরিবর্তনকে ঐশ্বরিক অভিলাষের সঙ্গে জড়িত করা হয় নি, তাকে দেখা হয়েছে নির্দিষ্ট এক-একটা পরিস্থিতির নিয়মানুগ পুনরাবৃত্তি এবং যে সংগ্রামী শক্তিগুলির জন্য ক্ষমতায় আসছে কখনো রাজতন্ত্র, কখনো অভিজাততন্ত্র, কখনো জনগণ, তাদের সম্পর্কপাতের দিক থেকে।

তীক্ষ্ন বিশ্লেষণী মেধা ও অভিজ্ঞতানির্ভর সাধারণীকরণের দ্বারা সমাজের রাজনৈতিক ও সামাজিক বৈরাবস্থা, রাজনৈতিক সংগ্রাম ও রাজনৈতিক (রাষ্ট্রিক) পুনর্গঠনের গতিষ্ণুতার চরিত্র মাকিয়াভেলি বর্ণনা করতে পেরেছেন। তাঁর রাজনৈতিক বিশ্লেষণের বৈশিষ্ট্য হল সংগ্রামশীল সামাজিক শক্তিগুলির সামাজিক-মনস্তাত্ত্বিক বর্ণনার ব্যাপক প্রয়োগ। এ ব্যাপারে মাকিয়াভেলি আলোকপাত করতে পেরেছেন জীবনের উপরিকাঠামোর একটা স্বকীয় ধরনের স্তরে, যথা, শাসনের রূপ এবং সংগ্রামশীল পার্টি ও সামাজিক গ্রুপের মাধ্যমে সমাজের তদনুরূপ মনস্তাত্ত্বিক (ভাবাবেগমূলক, নৈতিক) অবস্থার পারস্পরিক সম্পর্ক।

মাকিয়াভেলির রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির মর্মবিন্দুটা রাজনীতি নিয়ে তাঁর অপূর্ব সব দীপ্তোক্তি কিংবা তাঁর প্রজাতান্ত্রিক সহানুভূতিতে নেই, আছে ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে তাঁর ধারণায়। এর ভিত্তিতে ছিল সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের চালিকা শক্তি হিশেবে তীব্র সামাজিক সংঘর্ষগুলির চেতনা। বিশেষ প্রোজ্জ্বল ও প্রকট রূপে এ চেতনা পরিস্ফুট হয়েছে তাঁর 'ফ্লোরেন্সের ইতিহাস' গ্রন্থে। তাঁর রাজনৈতিক বিচার ও সিদ্ধান্তে, তথা বিচার্য বিষয়টিকে তার পরিবর্তনশীলতার প্রেক্ষিতে উপস্থিত করার প্রচেষ্টায় অনুভূত হয় শত্রুস্থানীয় অথবা প্রতিযোগী গ্রুপ ও পার্টির সংগ্রাম সম্পর্কে দ্বন্দ্বমূলক দৃষ্টিভঙ্গির সুস্পষ্ট ঝলক।

মাকিয়াভেলি লিখেছেন: 'প্রতিটি রাষ্ট্রে সাধারণত থাকে দুটি ভিন্ন ধারা: জনগণ চায় সম্ভ্রান্ত নাগরিকদের দ্বারা পীড়িত না হতে, তাদের ক্ষমতা হ্রাস করতে, অভিজাতরা চায় যথাসম্ভব দৃঢ়ভাবে ক্ষমতা দখল করতে, জনগণের উপর পীড়ন বাড়িয়ে তুলতে; এই দুই ভিন্ন প্রবণতার ফল সাধারণত দাঁড়ায় এই যে রাষ্ট্রে থাকে হয় উচ্চতন ক্ষমতা, নয় স্বাধীনতা, নয় নৈরাজ্যের প্রাধান্য। এক্ষেত্রে যে দল উচ্চতন ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার জন্য সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পারল সেই অনুসারে সার্বভৌমকে তা অর্পণ করতে পারে হয় জনগণ নয় অভিজাতরা' ('সার্বভৌম', অধ্যায় ৯)।

সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায় ও জনগণের মধ্যে যে শত্রুতা রয়েছে তার লক্ষণীয়

প্রভাব পড়ে আইনপ্রণয়ন সমেত সমাজের গোটা রাজনৈতিক জীবনের ওপর ('সার্বভৌম', অধ্যায় ৪), 'স্বাধীন জীবনযাপনে অক্ষমতা ও দুর্নীতি আসে নাগরিক অসাম্য থেকে' ('বিচার', খণ্ড ১, অধ্যায় ১৭)। সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায় ও জনগণের মধ্যে 'গভীর ও পুরোপুরি স্বাভাবিক' শত্রুতাই হল 'রাষ্ট্রে যেসব বিশৃঙ্খলা চলে তার মূল কারণ'। এ শত্রুতার মিটমাট হয় না কখনো, কারণ 'জনগণ চায় আইন মতে চলতে আর সম্ভ্রান্তরা চেষ্টা করে হুকুম চালাতে, তাই তাদের মধ্যে মিটমাট অসম্ভব' ('ফ্লোরেন্সের ইতিহাস')।

ঐতিহাসিক মাকিয়াভেলির সামাজিক ধারণার বনিয়াদী তাৎপর্য ছিল শুধু রাষ্ট্র শাসনের রূপ পরিবর্তনের নিয়মানুগতা ব্যাখ্যার নূতনত্বেই নয়; বুর্জোয়া রাজনৈতিক সমাজবিদ্যা ও রাজনীতিবিদ্যার পদ্ধতিগত বনিয়াদও তা পেতে দিয়েছে। এতে করে, মাকিয়াভেলিকে আমরা দেখি কেবল প্রাচীন লেখকদের রাজনৈতিক ধারণাগুলির পুনঃপ্রবর্তক হিশেবেই নয়, দেখি সেগুলির সংস্কারক হিশেবে, যিনি দাঁড়িয়েছেন ভিন্ন একটা সামাজিক-রাজনৈতিক অবস্থানে এবং পেঁৗছেছেন রাষ্ট্রিক, রাজনৈতিক, ঐতিহাসিক ঘটনার বোধ ও ব্যাখ্যার নতুন একটা পদ্ধতিগত শিখরে।

ঐতিহাসিক দৃষ্টিদিগন্তের সমস্ত ব্যাপকতা ও সাধারণ পাণ্ডিত্য সত্ত্বেও মাকিয়াভেলি ছিলেন নিজ কালের আদর্শ, নির্দিষ্ট একটা সামাজিক-রাজনৈতিক, শ্রেণীগত আন্দোলনের আদর্শের অনুগত। প্রাচীন নিদর্শনগুলি অকুণ্ঠে অনুসরণের ডাক দেন নি তিনি, ইউটোপিয়ায় পতিত হন নি, ভিত্তিহীন সমস্ত খেয়ালি উৎকল্পনার স্থিরমস্তিষ্ক অনুত্তেজিত খতিয়ানকে বাঞ্ছনীয় মনে করেছেন। 'যা রয়েছে' তার বাস্তব বিবরণ দিলেও যা 'থাকা উচিত' তার প্রতি তিনি উদাসীন নন। শুধু এই 'উচিত'টা বিমূর্ত ও ঝাপসা কিছু নয়, পুরোপুরি বাস্তব। মাকিয়াভেলির রাজনৈতিক পরিকল্পনা যে মূর্ত বাস্তবে পরিণত হয় নি, সেটা তাঁর দোষ নয়। আ. গ্রামশি লিখেছেন: 'মাকিয়াভেলির ক্রিয়াকলাপের সীমাবদ্ধতা শুধু এইখানে যে তিনি ছিলেন একজন 'স্বতন্ত্র ব্যক্তি', লেখক, রাষ্ট্র বা সৈন্যবাহিনীর প্রধান নন, তবে স্বতন্ত্র ব্যক্তিসত্তা হয়েও তাঁর আজ্ঞাধীনে ছিল রাষ্ট্র ও সৈন্যবাহিনীর শক্তি এবং সেটা শুধু বাণীর বাহিনী নয়।'*

মাকিয়াভেলির দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর যুগের বৈশিষ্ট্য,

যেটা সামন্ততন্ত্র থেকে পুঁজিবাদে উত্তরণের, রাজনৈতিক আমল ও শাসনরূপের অস্থিতিশীলতা ও অদৃঢ়তার যুগ।

ফ্লোরেন্সের রাজনৈতিক ইতিহাস থেকে মাকিয়াভেলি রাজতন্ত্র, গোষ্ঠীতন্ত্র, এমনকি গণতন্ত্রের পরিস্থিতিতেও বুর্জোয়ামুখী শাসনের কম নিদর্শন পান নি। নির্দিষ্ট একটা পর্বে, যাকে 'চোম্পি' অভ্যুত্থান বলা হয়, সেসময় পশমের হস্তশিল্প কারখানা ও কর্মশালাগুলির শ্রমিকদের নেতৃত্বে ফ্লোরেন্সে ক্ষমতায় আসে কনিষ্ঠ গিল্ডের দল; তবে সাধারণ জনের প্রভুত্ব দীর্ঘস্থায়ী হয় নি, ক্ষমতায় বুর্জোয়া স্তরটা আবার ফিরে আসে। মাকিয়াভেলির ঐতিহাসিক বিবরণ বাহ্যত অপক্ষপাতী হলেও কোনো সন্দেহ নেই যে তিনি ছিলেন সাধারণ লোকের প্রভুত্বের বিরুদ্ধে, যারা সত্যই ছিল পরিপূর্ণ, কার্যক্ষেত্রে গণতন্ত্রের জন্য চেষ্টিত, যেটা সম্ভ্রান্তরা চাইত না। তাঁর মতে, শাসন চালাবার সামর্থ্য জনগণের কম। সেইসঙ্গে আবার তিনি ছিলেন রাজতন্ত্রেরও বিরোধী, যা সহজেই পরিণত হয় স্বৈরশাসনে। এই থেকেই রাজনৈতিক আদর্শ হিশেবে তিনি ঝুঁকেছিলেন নরমপন্থী প্রজাতন্ত্রবাদের দিকে।

মাকিয়াভেলির মতে, কেবল প্রতিযোগী মূল রাজনৈতিক দল বা গোষ্ঠীগুলির মধ্যে নির্দিষ্ট একটা ভারসাম্য থেকেই, তাদের স্বার্থের সংঘাত থেকেই দেখা দেয় প্রজাতান্ত্রিক অধিকারাদি ও নাগরিক সমতা, গড়ে ওঠে শাসন ও নিয়ন্ত্রণের এমন একটা ব্যবস্থা যাতে মানুষ প্রজাতন্ত্রে তার নাগরিক স্বাধীনতা বজায় রাখতে পারে। এর জন্য নির্দিষ্ট একটা মাত্রায় যে অর্থনৈতিক সমতা আবশ্যক, প্রজাতন্ত্রের পরিস্থিতিতে তারও ব্যবস্থা করা যায় সহজে। যেখানে অসাম্য বড়ো বেশি, সেখানে গড়ে ওঠে রাজতন্ত্র এবং সামন্তদের প্রভাব টিকিয়ে রাখার অনুকূল জমি। যে প্রজাতন্ত্রে খানিকটা সাম্য আছে, সেখানে রাজা যদি ক্ষমতা দখল করে সে ক্ষমতা ধরে রাখতে চায়, তাহলে নিজের পক্ষভুক্তদের মধ্যে সম্পত্তি বেঁটে দিয়ে নতুন সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায় সৃষ্টি করতে হয়, নইলে তার কোনো নির্ভরস্থল থাকবে না। সুব্যবস্থিত রাষ্ট্রে সাধারণ লোকেদের নিপীড়ন করা অনুচিত। পক্ষান্তরে, কোন শাসক যদি তেমন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে চায় তাহলে তাকে ঠিক এই সাধারণ লোকেদেরই মুখাপেক্ষী হতে হবে, কেননা তারাই অধিকাংশ আর তাদের খাঁইও বেশি নয়। তেমন শাসকের পক্ষে 'বড়ো মানুষদের' (গ্র্যান্ডদের) ওপর ভরসা করা অনুচিত; তাদের প্রচণ্ড ক্ষিদে সে কখনো মেটাতে পারবে না, তাদের একাংশ সর্বদাই থাকবে অসন্তুষ্ট ও তার বিরুদ্ধে যাবে।

তাহলেও মাকিয়াভেলির প্রজাতান্ত্রিক সহানুভূতি সঙ্গতিশীল গণতন্ত্রবাদে পৌঁছয় না; তাঁর গণতন্ত্রবাদ বণিক-শিল্পপতি বুর্জোয়া শ্রেণীর অবস্থানের সমগোত্রীয়। এ শ্রেণী যেকোনো ধরনের গণতন্ত্র প্রবর্তনেই রাজি, শুধু সেটা যদি তার প্রভুত্ব, সম্পত্তি ও আয়কে স্পর্শ না করে। সেটা যদি সম্ভব না হয়, তাহলে একব্যক্তিমূলক শাসকও তারা মেনে নেবে, যদি প্রভুত্বকারী শ্রেণীর স্বার্থ সে রক্ষা করে। মাকিয়াভেলির মতে, শ্রেষ্ঠ রূপের শাসন হল রাজতান্ত্রিক, অভিজাততান্ত্রিক ও জনতান্ত্রিক — এই তিনটি সাধারণ রূপের মিশ্র শাসন, তাতে পরস্পর পরস্পরকে সংযত রাখবে ও রক্ষা করবে। এই প্রসঙ্গে তিনি অতীতকালের 'প্রাজ্ঞ বিধানদাতা' — লিকুর্গের, সলোনের নজির দিয়েছেন এবং প্রাচীন রোমে রাষ্ট্রিক প্রতিষ্ঠানের বিবর্তনের কথা বলেছেন ('বিচার', খণ্ড ১, অধ্যায় ১), তবে তাঁদের প্রামাণিকতা ও রাজনৈতিক শব্দাবলি তাঁর প্রয়োজন হয়েছিল নরমপন্থী-বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রবাদের আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য।

ইতালির ঐশ্বর্যশালী বাণিজ্যিক প্রজাতন্ত্রগুলি মজবুত প্রজাতান্ত্রিক ব্যবস্থা গঠনে ও সারা ইতালির পক্ষে এমন একটি সাধারণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় অক্ষম হয়, যা বাইরের হানা থেকে নিজেকে রক্ষা করতে সমর্থ। এই থেকেই এসেছে মাকিয়াভেলির এই মূল রাজনৈতিক ভাবনা যে একক কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্র গঠন ও ইতালির অতীত গৌরব ফিরিয়ে আনার জন্য প্রয়োজন শক্তিশালী একব্যক্তিক ক্ষমতা, কোনো একজন শাসকের একনায়কত্ব। এই একনায়ক, মাকিয়াভেলি যার নাম দিয়েছেন Il Principe (প্রিন্স, সার্বভৌম), তাকে হতে হবে জাতীয় (ভাড়াটে সৈন্য নিয়ে নয়, যা ছিল তখনকার রেওয়াজ, নিজেদের নাগরিকদের মধ্য থেকে বাছাই করা) ফৌজের অধিনায়ক। তাকে চূড়ান্তরূপে চূর্ণ করতে হবে সামন্তদের, তাদের সম্পত্তিগুলিকে সম্মিলিত করতে হবে একটিমাত্র বৃহৎ রাষ্ট্রে, এবং তাতে প্রতিষ্ঠা করতে হবে নাগরিক সমতা, স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক শৃংখলা।

এরূপ ক্ষমতার ভ্রূণ মাকিয়াভেলি দেখেছিলেন প্রখ্যাত সিজার বর্জিয়ার পক্ষ থেকে নতুন রাষ্ট্রশৃংখলা প্রতিষ্ঠার প্রয়াসে। তাঁর অভ্যুদয় প্রথমটায় সাধারণ এক কন্দোতিয়েরের, অর্থাৎ সেনাপতি হিশেবে নিজ এক্তিয়ারের সামন্তদের বিরুদ্ধে তাঁর পিতা পোপ ৬ষ্ঠ আলেকজাণ্ডারের সংগ্রামে। পরে তিনি কার্যত পোপ থেকে স্বাধীন একটা প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। একসারি সামরিক সংঘর্ষে, সেইসঙ্গে ধূর্ততা কাজে লাগিয়ে মধ্য ইতালির সামন্তদের চূর্ণ করে তিনি সারা ইতালির ওপর নিজের ক্ষমতা

প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। চেষ্টাটা সফল হয় নি, কিন্তু বেশ একটা মডেল হিশেবে তা গুরুত্বপূর্ণ ছিল মাকিয়াভেলির কাছে, যিনি তাঁর দরবারে ফ্লোরেন্স প্রজাতন্ত্রের দূত হিশেবে তাঁর কতকগুলি উদ্যোগের প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন।

আশ্চর্য খোলাখুলি, একান্ত যাথার্থ্যে তিনি বর্ণনা করেছেন তাঁর যুগে ক্ষমতা দখল করা ও ধরে রাখার জন্য কী কী উপায় অবলম্বন করত বড়ো দরের রাজনীতিকরা। এইসব ক্রিয়াকলাপের খতিয়ান টেনে তেমন শাসককে তিনি উপদেশ দিয়েছেন যার কাজ হবে 'ব্যভিচারগ্রস্ত ও দুর্নীতিপরায়ণ' জনগণের মধ্যে নতুন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা। শাসককে, সার্বভৌমকে অনুসরণ করতে হবে সুদৃঢ় ক্ষমতার নীতি, রাষ্ট্রকে মজবুত করার জন্য যেকোনো উপায়ের আশ্রয় নিতে হবে তাকে, প্রয়োজন দেখা দিলে হতে হবে নিষ্ঠুর। 'সর্বদিক দিয়ে যে ব্যক্তি নির্মল ও সততাশীল হতে ইচ্ছুক, অচিরে অথবা বিলম্বে অসাধু সংখ্যাধিক্যের মধ্যে তার ধ্বংস অনিবার্য' ('সার্বভৌম', অধ্যায় ১৫)— এই হল মাকিয়াভেলির একটা মূল বিশ্বাস।

তাঁর মতে, সার্বভৌমের চেষ্টা করা উচিত যাতে লোকে তাঁকে মনে করে সদাচারী, দয়ালু, সাধু, যত্নশীল, বদান্য; যেন মনে না করে যে তিনি নিষ্ঠুর, কৃপণ, বিশ্বাসঘাতক, কোপন। কিন্তু সাধুতা এবং অন্যান্য সদ্‌গুণ যদি তাঁর বিরুদ্ধেই ঘুরে দাঁড়ায়, দেশের ঐক্য ও প্রজাদের আনুগত্য বিঘ্নিত করে, তাহলে কুটিল ও ভণ্ড হতে দ্বিধা করা সার্বভৌমের পক্ষে অনুচিত। সে লক্ষ্য সাধনের পথ ও পদ্ধতির মধ্যে পড়ে সামরিক শক্তি, কূটনৈতিক চালিয়াতি, অন্তর্ভেদী দৃষ্টি, নিষ্ঠুরতার ন্যায্যতা প্রতিপাদন। রাজনৈতিক ক্রিয়াকর্মের প্রণালী ও নিয়মগুলিকে মাকিয়াভেলি বিচার করেছেন বিমূর্ত ন্যায় বা খ্রিস্টীয় নৈতিকতার নিরিখে নয়; তাঁর পরামর্শগুলি নিছক উপযোগিতামূলক, রাজনৈতিক লক্ষ্যসিদ্ধির উদ্দেশ্যাধীন। এতে করে তিনি প্রকট করে তুলেছেন তাঁর কালে রাজনীতিতে স্বাধীন নিয়মসঙ্গতি ও নীতির অস্তিত্ব, দেখিয়েছেন নৈতিকতা ও ধর্মের প্রশ্ন থেকে রাজনীতির প্রশ্নগুলিকে বিচ্ছিন্ন করার সম্ভাবনা আর ঔচিত্য। গির্জার নৈতিকতার ভণ্ডামি থেকে, মধ্যযুগীয় স্কলাস্টিসিজমের মেকি বৈজ্ঞানিকতা ও আপ্তবাক্যের শ্বাসরোধী পরিবেশ থেকে অথবা প্রতিক্রিয়াশীল-ইউটোপীয় ঈশ্বরতাত্ত্বিক জল্পনা থেকে রাজনীতির ব্যাখ্যাকে মুক্ত করার প্রয়াসের দরুন মাকিয়াভেলির বিরুদ্ধে আনা হয়েছে নৈতিকতার অপহ্নব ও স্বৈরশাসকের দালালির মতো নিষ্ঠুর অভিযোগ।

3*

মাকিয়াভেলির দুর্নাম রটার সূতিকাগৃহ ইনকুইজিটর, ধর্মীয় অভিশংসকদের গোপন কক্ষ। চার্চের ভাবাদর্শীদের চেষ্টাচরিত্রে দেখা দেয় প্রজাতন্ত্রীর সম্পর্কে এমন রটনা যেন সে স্বৈরশাসকদের কাছে স্বদেশ বিকিয়ে দিচ্ছে, ধর্ম ও নৈতিকতা পদদলিত করে তাদের আধিপত্য সংহত করার পথ ও পদ্ধতি শেখাচ্ছে তাদের।

রাজনীতির স্বনির্ভর প্রণালীগুলির অনুধাবন এবং মধ্যযুগীয় সমাজ যেসব ঈশ্বরতাত্ত্বিক অন্ধ সংস্কার ও বিশ্বাসে আচ্ছন্ন ছিল সেগুলি বর্জন করে মাকিয়াভেলি রাজনীতিকে একটা কর্মকৌশল থেকে বিজ্ঞানে পরিণত করার দিকে দৃঢ় পদক্ষেপ করেন। '...আরো পূর্ববর্তীদের কথা বাদ দিলেও মাকিয়াভেলি, হবস, স্পিনোজা, বদেন এবং আধুনিক কালের অন্যান্য মনস্বীদের থেকে শুরু করে,' — 'জার্মান ভাবাদর্শ'এ লিখেছেন ক. মার্কস ও ফ. এঙ্গেলস, — 'শক্তিকেই ধরা হয়েছে আইনের বনিয়াদ; এতে করে রাজনীতির তাত্ত্বিক বিচার মুক্ত হয় নৈতিকতা থেকে এবং আসলে তুলে ধরা হয় কেবল রাজনীতির স্বাধীন ব্যাখ্যার স্বতঃসিদ্ধতা।'* মাকিয়াভেলি যেন-বা রাজনীতির প্রশ্নাদি থেকে নৈতিকতার দিকগুলি একেবারে মুছে দিয়েছেন, এমন অভিযোগে মার্কস ও এঙ্গেলসের সায় ছিল না। মাকিয়াভেলির ক্ষেত্রে, যেমন আধুনিক কালের উল্লিখিত অন্যান্য মনস্বীদের ক্ষেত্রেও নৈতিকতা থেকে 'মুক্তি' (তা মুছে দেয়া নয়) দেখা গেছে কেবল 'তাত্ত্বিক বিচারের' ব্যাপারে; এতে নৈতিকতা থেকে মুক্তির লক্ষ্য কেবল রাজনীতির স্বাধীন ও পৃথক ব্যাখ্যা সুসাধ্য করা, মোটেই তাতে নৈতিক প্রশ্ন উপেক্ষিত নয়। ইতালীয় এই মনীষীর প্রতি বহু শতকের গালিগালাজের পর বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের প্রতিষ্ঠাতারা তাঁর রাজনৈতিক মতবাদের যুক্তিবাদী বীজকোষটা বার করে আনলেন, যথা, 'রাজনীতির স্বাধীন ব্যাখ্যার স্বতঃসিদ্ধতা'। মার্কস ও এঙ্গেলস বলেছেন, অন্যথায় রাজনৈতিক ঘটনাবলি ছিন্ন হত 'তাদের মূলস্থিত অভিজ্ঞেয় বাস্তবতা থেকে'**।

লোকেদের সদাচারের লালন ও পুনর্গঠনের উপায় হিশেবে রাষ্ট্র সম্পর্কে তাঁর যে বোধ সেটা 'সার্বভৌম'এর লেখকের রাজনৈতিক অবিশ্বাস-প্রবণতার সঙ্গে মেলে না। রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তার পক্ষে মানবিকতাবিরোধী

ব্যবস্থার আশ্রয় নেয়া তিনি সম্ভব গণ্য করেছিলেন কেবল একটি চূড়ান্ত ক্ষেত্রে: গোটা স্বদেশের ধ্বংসসূচক বিপদের মুখে। স্বদেশ ত্রাণের জন্য ম্যাকিয়াভেলি সবকিছুতে রাজি। 'নিজের প্রাণের চেয়েও ভালোবাসি স্বদেশকে,' — মৃত্যুর কিছু আগে তিনি লিখেছিলেন বন্ধুকে আর এটা কেবল কথাই নয়। দেশাভিমানী ম্যাকিয়াভেলির ভাবনা ও আবেগে অনুপ্রাণিত হয়েছে ইতালির জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের একাধিক প্রজন্ম।

সামাজিক ও রাজনৈতিক পুনর্গঠনে বলপ্রয়োগের ভূমিকা বিষয়ে ম্যাকিয়াভেলির দৃষ্টিভঙ্গিকে খুবই বিকৃত করে দেখা হয়, বিশেষত বিকৃত করে বুর্জোয়া ভাষ্যকাররা। এই প্রসঙ্গে শাসককে একাধারে মানুষ হওয়া (ন্যায় আচরণ করা) ও পশু হওয়ার (কেবল শক্তিবলে চালিত হওয়া) উপদেশ এবং দ্বৈতভাবে — আইন অনুসারে ও শক্তিতে সংগ্রাম করতে বলার কথা প্রায়ই উল্লেখ করা হয়। পশুদের কাছ থেকে সার্বভৌমকে নিতে হবে সিংহ আর শেয়ালের গুণ, কেননা ফাঁদের কাছে সিংহ অসহায় আর শেয়াল অসহায় নেকড়ের কাছে। 'সুতরাং ফাঁদ নজর করার জন্য শেয়াল হতে হবে আর সিংহ হতে হবে নেকড়েকে ভয় দেখাবার জন্য' ('সার্বভৌম', অধ্যায় ১৮)। এই রূপকের মহিমায় চোখ ধাঁধিয়ে গিয়ে 'শাসক — তার প্রতিদ্বন্দ্বী ও শত্রু' — এই পরিসীমার বাইরে লোকে বলপ্রয়োগের ভূমিকা দেখতে পায় না, অর্থাৎ গোটা সমাজের কাঠামোর মধ্যে, যা রাজনৈতিক গ্রুপগুলিকে গড়ে তুলছে, তার ভেতর রাজনৈতিক সংগ্রামের বিস্তৃততর সামাজিক পটে দেখতে পায় না।

ম্যাকিয়াভেলির পরামর্শ নৈতিকতাবাদীর নয়, স্থিরমস্তিষ্ক রাজনীতিকের। গ্রামশির মন্তব্য অনুসারে, তিনি কেবল মূর্ত-নির্দিষ্টভাবে দেখাতে চেয়েছেন ফলপ্রদ হতে হলে ঐতিহাসিক শক্তিগুলির কাজ করা উচিত কিভাবে।*

প্রারম্ভিক যে বুর্জোয়া সমাজের প্রয়োজন একটা ঐক্যবদ্ধ শক্তিশালী রাষ্ট্রের তার ভাবাদর্শী হিশেবে ম্যাকিয়াভেলি বিদ্যমান রাজনৈতিক অবস্থার কোনো একটা আমূল পরিবর্তনের কথা ভাবেন না। তাঁর রচনায় আমরা তাঁকে দেখি প্রজাতন্ত্রী হিশেবে, আবার রাষ্ট্রের ব্যাপারে জনগণের অংশ গ্রহণের অধিকার সংরক্ষণে ইচ্ছুক এক গণতন্ত্রী হিশেবে, শেষত এক দেশপ্রেমিক হিশেবেও যিনি স্বদেশের অভ্যন্তরীণ অবস্থা ও বাইরের নিরাপত্তাকে স্থান দেন আপাতগ্রাহ্য মানবিকতা ও ফাঁকা স্বপ্নবিলাসের ঊর্ধ্বে।

ফ্লোরেন্সের শাসককে মাকিয়াভেলি আহ্বান করেছেন প্রজাতন্ত্রের ব্যাপারে বেশি প্রভাবপাত করার সুযোগ জনগণকে দিতে, আইন ও প্রতিষ্ঠানাদিতে খুব বড়োরকমের পরিবর্তন সাধন থেকে বিরত থাকতে, ব্যক্তিগত সম্পত্তির ওপর হাত না দিতে, জনগণকে অস্ত্র দানে ভয় না পেতে, ভাড়াটে সৈন্য অথবা মিত্রশক্তির কাছ থেকে পাওয়া বাহিনীর চেয়ে নাগরিক মিলিশিয়া ও জনবাহিনীকে শ্রেয় মনে করতে, বিবেচকের মতো নিজের মন্ত্রকদের বাছতে এবং রাষ্ট্রের ব্যাপার-স্যাপার নিয়ে তাদের অবাধে বিচার-বিবেচনা ও নির্দেশাদি দানের সুযোগ দিতে। ষড়যন্ত্র ও বলাত্মক উপপ্লব এড়াবার জন্য একটা সাধারণ নিয়ম হিশেবে যে দুই শ্রেণী নিয়ে সমাজ গঠিত তাদের একটির, অর্থাৎ হয় অভিজাত নয় সাধারণ লোকের ওপর স্বাধীনতা রক্ষার ভারার্পণের সুপারিশ করেছেন তিনি। এই প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেছেন যে কাজটা জনগণকে দিলে ঝুঁকি থাকবে কম, কেননা সাধারণত তাদের ইচ্ছেটা কেবল পরের অধীনস্থ না হওয়া; পক্ষান্তরে কর্তৃত্ব করতে অভিজাতরা পিছ-পা নয়; সুতরাং তাদের পক্ষ থেকে ক্ষমতা দখলও আশা করা যেতে পারে ('বিচার', খণ্ড ১, অধ্যায় ৫)।

মাকিয়াভেলির প্রজাতন্ত্রবাদ এখানে চাপা পড়ে গেছে এই ঘটনাটা হিসাবে রাখার প্রয়োজনে যে তিনি পরামর্শ দিচ্ছেন যে-রাষ্ট্রের শাসককে, সেখানে প্রজাতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানাদি বিশুদ্ধ রূপে পুনঃস্থাপিত করা সম্ভব নয় বলে তাঁর ধারণা। এই থেকেই তিনি ডাক দিয়েছেন মিশ্র শাসনের, যার গুণকীর্তন করে গেছেন প্রাচীন লেখকেরাও এবং যার প্রোজ্জ্বল নিদর্শন দেখা গেছে স্পার্টা আর রোমে। প্যাট্রিশিয়ান ও প্লিবিয়ানদের মধ্যে যা চলত তেমন একটা সামাজিক ও রাজনৈতিক শ্রেণী সংগ্রামের পক্ষেও তিনি মত দিয়েছেন।

মানুষের প্রকৃতি অপরিবর্তনীয়, এই ধারণা থেকে সামাজিক ব্যবস্থার বিকাশ প্রসঙ্গে মাকিয়াভেলি বলেছেন যে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ও ধর্মশিক্ষাগুলির প্রয়োজন ক্রমিক উন্নয়ন নয়, তাদের ভিত্তিস্থিত নীতিগুলিতে প্রত্যাবর্তন। অনুরূপ বক্তব্যের দেখা মিলবে প্রাচীন লেখকদের ক্ষেত্রেও যাঁরা স্বপ্ন দেখতেন যে সলোন ও লিকুর্গের আমলে ও শাসন ব্যবস্থায় স্পার্টা ও এথেন্স ফিরে যেতে পারে। এই ভাবনাটা লুফে নিয়ে মঁতেস্ক্য তাকে আরো বিকশিত করেন ও লেখেন যে প্রতিষ্ঠানগুলির ভিত্তিস্থিত নীতিগুলির অবিকৃত রূপের দিকে কাছিয়ে যাবার জন্য মধ্যে মধ্যে তাদের সংস্কার প্রয়োজন।

মাকিয়াভেলির রাজনৈতিক মতামত ও নীতি বোঝার পক্ষে মানুষের প্রকৃতি ও চতুষ্পার্শ্বস্থ দুনিয়ায় তার স্থান সম্পর্কে কী তিনি ভাবেন তা জানলে অনেক সাহায্য হবে। তাঁর মতে, বিশ্ব প্রেমময় স্রষ্টার গড়া কোনো সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যবস্থা নয়, এ হল মানুষের প্রতি বিরুদ্ধভাবাপন্ন শক্তিদের একটা এলোমেলো ব্যাপার। প্রকৃতি মানুষকে দিয়েছে কথা বলতে পারার গুণ, কিন্তু সেই প্রকৃতিই আবার তার ভেতর ঢেলে দিয়েছে আত্মাহংকার ও লোভের বিষ। পশুরা অল্পেতেই তৃপ্ত, মানুষ কিন্তু দারিদ্র্যে ভীত, খোঁজে ঐশ্বর্য যাতে শুভের পথ তাদের রুদ্ধ হয়। পশু তাই খেয়ে থাকে যা আকাশ তাদের পাঠায়, মানুষ তার উদর পূরণের জন্য পৃথিবীর সর্ব প্রান্তে পেয়াদা পাঠায়, ডুব দেয় মহাসাগরের তলদেশে। মানুষের সামর্থ্য শাণিত হওয়াই তার কষ্টের কারণ, ঐশ্বর্য তার দারিদ্র্য ও শক্তিহীনতার উৎস। মানুষ হয় যত অসহায়, তার রিপু হয় যত অদমিত, প্রকৃতি তার প্রতি হয় যত শত্রুভাবাপন্ন, ততই মরিয়া হয়ে ওঠে অস্তিত্বের জন্য তার সংগ্রাম। এই সংগ্রামই জন্ম দিয়েছে রাষ্ট্র, নৈতিকতা, ধর্মের — পদার্থবহির্ভূত প্রকৃতি যা দিয়ে গঠিত, তার।

এক-একজন লোকের স্বতন্ত্র ব্যক্তিসত্তা মাকিয়াভেলির মনোযোগ আকর্ষণ করে নি, তবে সমাজে, বিশেষ করে রাজনীতির জগতে লোকের ক্রিয়াকলাপ তিনি অনুধাবন করেছেন সাতিশয় মনোযোগে ও কোমর বেঁধে। মূর্ত-নির্দিষ্ট রাজনৈতিক-ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে মানবিক সামর্থ্যের সক্রিয় সৃজনশীল রূপায়ণের সমস্যায় তাঁর আগ্রহ পরবর্তী প্রজন্মের রাজনৈতিক মনীষীদের কাছেও সমান গুরুত্ব ধরেছে। তাঁর মতবাদে সদ্‌গুণকে মাকিয়াভেলি রাজনীতিকৃত করেছেন: মানুষ সদ্‌গুণবান হতে পারে কেবল নাগরিক হিশেবে। সদ্‌গুণই মানুষকে বাধ্য করে অন্যের এবং নিজেরও মঙ্গলের প্রতি মনোযোগী হতে।

মানুষের সদ্‌গুণকে মাকিয়াভেলি ব্যাখ্যা করেছেন নিজের ভাগ্যের (ফরচুন) ওপর সজ্ঞান ও সক্রিয় প্রভাবপাত বলে, কিন্তু এ সদ্‌গুণ এখন আর প্রচণ্ড পরিমাণে ঐশ্বরিক দয়ার ওপর নির্ভরশীল নয়, তা নির্ভর করছে প্রতিবেশীর সদ্‌গুণের ওপর। রাষ্ট্রে নাগরিকদের আচরণ পরস্পরের প্রতি সমান (কথাটার আরিস্টটলীয় অর্থে), তাই আমার প্রতিবেশী যদি সামাজিক কল্যাণের প্রতি অমনোযোগী হয়, তাহলে সে হয়ে উঠতে পারে হয় আমার মালিক নয় আমার চাকর, অর্থাৎ উভয় ক্ষেত্রেই আমার ব্যবহারিক সদ্‌গুণের পক্ষে ক্ষতিকর। মাকিয়াভেলির কাছে সদ্‌গুণ (virtu) কিছু পরিমাণে

পরিণত হয়েছে আচরণের একটা রূপে যা মানবিক ক্রিয়াকলাপসঞ্জাত এবং কাল ও ফরচুনের ওপর প্রচণ্ড নির্ভরশীল।

তাঁর আগে রাজনৈতিক জীবন এবং সাধারণভাবেই মানবিক সক্রিয়তাকে কেউ এতটা উঁচু করে তোলেন নি। তাঁর মতে, মানুষের জীবন অনিবার্যতই রাজনৈতিক বিক্ষোভ ও উত্তেজনার প্রভাবাধীন; রাজনৈতিক গুণাবলি ও শৌর্যের ওপর নির্ভর করে রাষ্ট্র ও জনগণের ভাগ্য। তাঁর বিশ্ববীক্ষায় প্রথম স্থান রাজনীতির। শাসক-সংস্কারকের নেতৃত্বে ইতালিকে ঐক্যবদ্ধ করার সাফল্য যে নির্ভর করছিল অর্ধেকটা তাঁর ব্যক্তিগত শৌর্য এবং অর্ধেকটা ফরচুনের আনুকূল্যের ওপর, সেটা অকারণে নয়। মাকিয়াভেলির কঠোর ও নিষ্করুণ মতবাদে এই একটি দেবতারই স্থান আছে, যিনি দেবত্ব সত্ত্বেও জনগণের, বিশেষ করে শাসক-সংস্কারকের সচেতন সক্রিয়তায় প্রভাবিত হতে পারেন।

মাকিয়াভেলির ধ্যানধারণা ছিল এত গভীর যে তা শুধু রেনেসাঁস ও সংস্কার যুগের একাধিক পার্টি ও গোষ্ঠীর রাজনৈতিক মতবাদ হয়েই ওঠে নি, রাজনীতিকে একটা বৈজ্ঞানিক চর্চা রূপে গড়ে তোলার সূত্রপাতও করেছিল।

বর্তমানে মাকিয়াভেলিকে নিয়ে লেখা আছে ভূরি ভূরি, রাজনৈতিক ভাবনা ও আচরণের উপর তাঁর রচনার প্রভাব নিয়ে বিতর্ক কিন্তু থামে নি, মাঝে মাঝে তা খুবই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। খোলাখুলি নাস্তিকতা এবং রাজনীতিতে কুটিলতার প্রচারক এই মনীষীর দৃষ্টিভঙ্গির বিচার বেশ দীর্ঘকাল ধরেই করা হয়েছে শাস্ত্রীয় নীতিবাক্যের দৃষ্টিকোণ থেকে, অকিঞ্চিৎকর অসার যুক্তি ও সরাসরি বিকৃতির ভিত্তিতে।

ষোলো শতক থেকে আজ পর্যন্ত 'মাকিয়াভেলিজম' বলে যে কথাটা চালু রয়েছে তাতে বোঝায় রাজনীতির ক্ষেত্রে মিথ্যাচার, প্রতারণা ও কুটিলতা। তবে মাকিয়াভেলির মতবাদের মূল কথাটা মোটেই রাজনীতিতে মোক্ষম চাল, ভান, ধূর্ততা নিয়ে নয়।

রাজনৈতিক মাকিয়াভেলিজমের মূল্যায়নে দুটি দিকের বিচার গুরুত্বপূর্ণ: ওই ধরনের রাজনৈতিক আচরণ কি আসছে মাকিয়াভেলির রচনাগুলিতে প্রদত্ত দাওয়াই থেকে বা তার ফলে, নাকি তা রাজনৈতিক কর্মকর্তাদের মনে দেখা দিয়েছে রাজনৈতিক ঘটনাবলির তৎকালীন গতিপথের স্বাধীন মূল্যায়ন ও সিদ্ধান্ত থেকে। বুর্জোয়া রাজনৈতিক বিপ্লবের অভিজ্ঞতা এবং বুর্জোয়া সমাজের গোটা রাজনৈতিক জীবন থেকেই

মাকিয়াভেলিজমের উদাহরণ পাওয়া যায় অসংখ্য। ঐতিহাসিকদের সাক্ষ্যানুসারে, নতুন শাসকদের যে পরামর্শ দিয়েছিলেন মাকিয়াভেলি, তা সচেতনভাবে অনুসরণ করেছিলেন ক্রমওয়েল; তাঁর 'সার্বভৌম' গ্রন্থটি ছিল নেপোলিয়নের হাতের কাছের বই, এটা তিনি বার বার পড়েছেন ও তার ওপর মন্তব্য করেছেন। মাকিয়াভেলির অসংখ্য সমর্থন ও খণ্ডনের মধ্যে বেশ একটা স্থান আছে প্রাশিয়ার মহান দ্বিতীয় ফ্রিডরিখের 'অ্যান্টি-মাখিয়াভেল' রচনাটির। ইনি মাকিয়াভেলিকে বলেছিলেন 'বদের ওস্তাদ'।

বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রচারকদের রচনায় আছে বুর্জোয়া রাজনৈতিক মাকিয়াভেলিজমের নির্মম, স্বরূপোদ্ঘাটক বিশ্লেষণ। যেমন, প্যারিস কমিউনারদের রক্তপিপাসু জল্লাদ তিয়েরের বর্ণনায় মার্কস এক নীতিহীন রাজনীতিকের জঘন্য মূর্তিকে অমর করে গেছেন এই বলে যে, লোকটা 'ক্ষুদ্র রাষ্ট্রিক চালবাজিতে ওস্তাদ, বিশ্বাসঘাতকতা ও বেইমানিতে পারদর্শী, পার্লামেণ্টী পার্টি সংগ্রামে যত রকমের ওঁছা নীচ চালাকি, নীচ কূটকৌশল আর জঘন্য ধূর্ততায় সিদ্ধহস্ত; স্বস্থান থেকে পতিত হলেই বিপ্লবকে প্রজ্জ্বলিত ও স্বহস্তে ক্ষমতা ধারণ করতে চাইলেই তাকে রক্তে প্লাবিত করতে উদ্যত; ভাবাদর্শের বদলে শ্রেণীগত কুসংস্কারে পরিপূর্ণ, হৃদয়ের বদলে আত্মাহংকারে ভূষিত, সামাজিক জীবনে যেমন জঘন্য, ব্যক্তিগত জীবনে তেমনি নোংরা...'*।

রাশিয়ায় মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গির প্রমুখ প্রচারক গ. ভ. প্লেখানভ চমৎকার উদ্ঘাটন করেছেন নিট্শে জাতীয় প্রতিক্রিয়াশীল দার্শনিকদের অনৈতিকতা প্রচারের বুর্জোয়া প্রকৃতি আর বুর্জোয়া সামাজিক অভিমতের পাল্টা ভণ্ডামি। 'কে লিখেছেন অ্যান্টি-মাকিয়াভেলি? সেই একই প্রুশীয় রাজা,' — উত্তর দিয়েছেন প্লেখানভ, — 'যিনি 'Il Principe'তে নিবদ্ধ সমস্ত নিয়ম কার্যক্ষেত্রে অনুসরণ করেছেন অন্যান্য সার্বভৌমের চেয়ে প্রায় বেশি উৎসাহেই আর এই কারণেই নিট্শের প্রতি নিজেদের সমস্ত অগোচর অনুরাগ সত্ত্বেও সাম্প্রতিক বুর্জোয়ারা সর্বদাই মনে করবে (ওটা) অনৈতিকতাকে নস্যাৎ করা সদাচারের লক্ষণ।'**

কোনো একজন রাজনৈতিক ভাবুকের উত্তরাধিকারে আগ্রহ জাগার

বেশির ভাগ ক্ষেত্রে যেমন হয়ে থাকে, মাকিয়াভেলির মতবাদও তেমনি বিভিন্ন ঐতিহাসিক যুগে, এমনকি এক-একটা পর্বেও বিভিন্নভাবে প্রাসঙ্গিক বলে গণ্য হয়েছে।

যেমন, ইংলন্ডে ১৬৪০-১৬৬০ সালে এমন একটা উৎক্রমণমূলক অবস্থা দেখা দিয়েছিল যা মাকিয়াভেলি বর্ণিত যুগটার খুবই কাছাকাছি। রাজতান্ত্রিক ও প্রজাতান্ত্রিক প্রবণতার মধ্যে সংগ্রাম ইংলন্ডে শেষ হয় পার্লামেণ্টভিত্তিক রাজতন্ত্ররূপী আপোসে এবং রাষ্ট্রজীবনে ধর্মীয় অনুশাসনের গুরুত্ব হ্রাসে — এসবে খুবই মনে পড়ে যায় মাকিয়াভেলি লিখিত প্রবণতা ও সমস্যাদির কথা। ফলে 'সার্বভৌম' গ্রন্থের লেখক প্রতিভাত হয়েছেন স্বৈরশাসনের সমালোচক, প্রজাতান্ত্রিকতার প্রবক্তা, ধর্মের ব্যাপারে রাষ্ট্রীয় রাজনীতির পয়গম্বর রূপে।

মাকিয়াভেলির মতে, ধর্ম হল রাজনীতির একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। জনগণের ধর্মীয় প্রবণতার পোষকতা করা উচিত, কেননা ধর্মপ্রাণ লোকেদের শাসন করা সহজ ('বিচার', খণ্ড ১, অধ্যায় ২)। তবে পারলৌকিক ব্যাপারের জন্য প্রযত্নকে মুখ্য করে তুলে এবং নিজের পার্থিব ভাগ্যকে মেনে নেয়াকেই পরম কল্যাণ জ্ঞান করে খ্রিস্টধর্ম ব্যক্তিমানুষ ও জনগণের মধ্যে সাংকল্পিক ও সৃজনশীল সক্রিয়তাকে দুর্বল করে, তাই স্বাধীনতাপ্রেম ও প্রজাতান্ত্রিক প্রেরণা অবক্ষয়ে যেতে থাকে ('বিচার,' খণ্ড ২, অধ্যায় ২)। এই ধরনের পূর্বসূত্র থেকে মাকিয়াভেলি অসীম সাহসে রাজনৈতিক বিচারবিবেচনাকে বিচ্ছিন্ন করেন ধর্মীয় ভরসা আর অসার নীতিবাচনের একটা মিশ্রণ থেকে এবং ব্যবহারিক রাজনীতির প্রশ্নাদি তুলে ধরেন ও তাদের উত্তর দেন।

ইংরেজ গবেষক জ. উইটফিল্ডের সাক্ষ্য অনুসারে, মাকিয়াভেলির ভাষ্যকার, প্রকাশক ও অনুবাদকদের মধ্যে ইংরেজরাই সংখ্যাধিক। লোকে সেখানে দান্তের চেয়েও তাঁকে পড়ত বেশি। রানি এলিজাবেথের আমলে আক্রমণ করা হয় তাঁর রচনাকে। বেকন উচ্ছ্বসিত ছিলেন তাঁকে নিয়ে। হব্‌সের কতিপয় সিদ্ধান্তে বেশ অনুভূত হয় তাঁর প্রভাব। তালিকাটা অন্যান্য যুগের প্রসিদ্ধদের নাম দিয়ে আরো বাড়ানো যায়।

মনীষী সম্পর্কে আগ্রহ উদ্রেকে সাহায্য করে রাজনৈতিক জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলিতে বড়ো ছোটো পরিবর্তন — রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার শ্রেণীগত চরিত্রে এবং প্রথা-প্রতিষ্ঠান, রাজনৈতিক আচরণের সহগ পরিবর্তন। রাজনৈতিক জ্ঞান আর রাজনৈতিক সংস্কৃতির প্রগতি (বা অধোগতি) এরূপ আগ্রহ উদ্রেকে কম ভূমিকা পালন করে না, যা অতীতের আত্মিক

উত্তরাধিকারের খানিকটা এধার-ওধার করে আত্তীকরণ ছাড়া সম্ভব নয়।

'সার্বভৌম' গ্রন্থের লেখকের ভাবাদর্শীয়-রাজনৈতিক অবস্থান, বিশেষ করে জাতীয় ঐক্য ও রাজনৈতিক কেন্দ্রীকরণ সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি সতেরো-উনিশ শতকের ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির প্রধান বিকাশপ্রবণতার সঙ্গে মিলে যায়। রুসো, স্পিনোজা, ইতালির রিসর্জিমেন্টো আন্দোলনের [৪] কর্মীদের চোখে মাকিয়াভেলি স্বৈরশাসকদের মন্ত্রণাদাতা নন, তাদের কষাঘাতক প্রজাতন্ত্রী, একনিষ্ঠ স্বদেশভক্ত, ভেতরকার ও বাইরেকার বিপদ সম্পর্কে যিনি সাবধান করে দিয়েছেন দেশকে।

এক্ষেত্রে কিছু কিছু পশ্চিমী লেখকেরা যা করে থাকেন, সেভাবে রাজনীতির তাত্ত্বিক মাকিয়াভেলিকে আদিবুর্জোয়া গণতন্ত্রবাদের ভাবাদর্শী থেকে আলাদা করা অনুচিত।* অন্যথায় ব্যাখ্যা করা যায় না, কেন একই মনীষী ১৫-১৬শ শতকের ধর্মীয় নীতিবাদীদের কাছে কু'য়ের কেন্দ্রবিন্দু, ১৮-১৯শ শতকের বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদীদের চোখে বীরনায়ক, আর বিশ শতকের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক কূটকৌশলের ওস্তাদ, আধুনিক রাজনীতিবিদ্যার জনক ও প্রতিভা।

যেসব রাজনৈতিক ভাবুক প্রজাতান্ত্রিক মতাবলম্বী (হ্যারিঙ্গটন, স্পিনোজা, রুসো) তাঁরা রাজনৈতিক জীবনের গতিষ্ণুতা, রাষ্ট্রে নাগরিক সংস্কৃতির ভূমিকা বিষয়ে মাকিয়াভেলির বিচার, তাঁর নিজের রাজনৈতিক সক্রিয়তার উচ্চ মূল্যায়ন করেছেন।

আঠারো-উনিশ শতকের সন্ধিক্ষণে খণ্ডবিখণ্ড জার্মানির সমস্যা বিশ্লেষণে বেশ অনুভূত হয় হেগেলের ওপর মাকিয়াভেলির প্রভাব। সাম্প্রতিক পরিস্থিতি ও কর্তব্যের উপযুক্ত এক মহান রাষ্ট্রনায়কের আবির্ভাব ও ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে হেগেল জড়িত করেছিলেন দেশ একীকরণের পরিপ্রেক্ষিত। সোজাসুজি তিনি 'সার্বভৌম' গ্রন্থটির উল্লেখ করেছেন এবং নীতিবাগীশ ও উচ্চকোটি সমাজের আক্রমণ থেকে রক্ষা করেছেন মাকিয়াভেলির ধ্যানধারণা।**

মাকিয়াভেলির ভাবাদর্শীয় উত্তরাধিকারের আধুনিক বুর্জোয়া ভাষ্য আরো সংখ্যাবহুল। তাদের মধ্যে শুধু সেইগুলি তুলে ধরছি যা সাম্রাজ্যবাদ

এবং একালের দুই মূল ভাবাদর্শের মধ্যে সংগ্রামের যুগে বুর্জোয়া রাজনৈতিক তত্ত্বের বিবর্তনের দিক থেকে বৈশিষ্ট্যসূচক। এ প্রসঙ্গে সর্বাগ্রে মাকিয়াভেলির পজিটিভিস্ট ব্যাখ্যা, উচ্চকোটিসুলভ এবং তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ফ্যাসিস্ট, কমিউনিস্টবিরোধী এবং আরো কয়েকটি ভাষ্যের উল্লেখ করা প্রয়োজন।

পজিটিভিজমের ঝোঁকই হল তথ্য ও ঘটনার নিরুত্তাপ, যেন-বা নিরাসক্ত পর্যবেক্ষণ। অনেক দিক থেকে তা সাহায্য করেছে সংস্কারমুক্ত পর্যবেক্ষক হিশেবে মাকিয়াভেলিকে তুলে ধরায়। গত শতকের দ্বিতীয়ার্ধেই মন্ত্রণাদাতা মাকিয়াভেলির সামনে অনেকখানি ম্লান হয়ে এসেছে স্বরূপোদ্ঘাটক মাকিয়াভেলির মূর্তি। গত শতকের ৭০-এর দশকে ইতালীয় ঐতিহাসিক প. ভিল্লারির প্রখ্যাত গ্রন্থে ('নিকোলো মাকিয়াভেলি ও তাঁর কাল') তাঁকে বর্ণনা করা হয়েছে নিরুত্তাপ হৃদয়ের এক পর্যবেক্ষক বলে।

'সার্বভৌম' গ্রন্থটিকে রাজনীতিকদের পক্ষে নিতান্ত একটি টেকনিকাল গাইড হিশেবে উপস্থিত করায় সরাসরি নস্যাৎ হয়ে গেছে মাকিয়াভেলির মৌলিক ধ্যানধারণা, তাঁকে ঘোষণা করা হয়েছে 'রেনেসাঁসের টিপিক্যাল সাক্ষী' বলে ইত্যাদি। রুশ বুর্জোয়া ব্যবহারশাস্ত্রী প. নভগোরোদ্‌ৎসেভ 'প্রাচীন ও আধুনিক জগতের রাজনৈতিক আদর্শাদি' গ্রন্থে লিখেছেন: 'এই ফোটোগ্রাফে সাধারণীকৃত চিন্তার কোনো চিহ্নই প্রায় নেই, তা বাধ্যের মতো নতি স্বীকার করেছে নিজের মালমশলার কাছে, চারিপাশে যা দেখেছে, দাসের মতো তা-ই উৎকীর্ণ করেছে, মাকিয়াভেলির মতবাদে অতীতের কিছু স্মৃতি আর ভবিষ্যতের কিছু আশা না থাকলে এ হত বাজনৈতিক সাহিত্যে এযাবৎ যা জানা আছে তাদের মধ্যে সবচেয়ে নিরানন্দ একটি রচনা'। নভগোরোদৎসেভের সমালোচনাটা এক্ষেত্রে এসেছে আইনভিত্তিক রাষ্ট্রের বুর্জোয়া তত্ত্বের অনুগামীর পক্ষ থেকে। সঙ্গত কারণেই তিনি মাকিয়াভেলিবাদে 'আইনের প্রাধান্যের' প্রতি অশ্রদ্ধা ইত্যাদিতে জোর দিয়েছেন।

আধুনিক বুর্জোয়া রাজনীতিশাস্ত্রের জনকপদে মাকিয়াভেলিকে উন্নীত করাটা আশ্চর্য ঠেকবে না যদি মনে রাখি যে বুর্জোয়ার কাছে উনিশ শতকের শেষ আর বিশ শতকের শুরুটা ছিল আদিবুর্জোয়া গণতান্ত্রিক আদর্শের পতন আর প্রলেতারিয়েতের রাজনৈতিক সক্রিয়তা বৃদ্ধির মুখে রাষ্ট্রিক স্থিতিশীলতা ও তার মূল প্রতিষ্ঠানগুলি রক্ষার একটা উপায় সন্ধানের সময়।

বুর্জোয়া গণতন্ত্রের সংকটাবস্থা থেকে পরিত্রাণের পথ হিশেবে পেশ করা হয় শাসক লোকশ্রেষ্ঠ (পারেতো) ও শাসক শ্রেণীর (মস্কা) ধারণা, শাসক ও শাসিতদের মধ্যে ব্যবধানে জোর দেওয়া হয়েছে শাসকদের প্রাধান্যেই।

যে বুর্জোয়া রাজনৈতিক তাত্ত্বিকেরা মাকিয়াভেলীয় ভাবাদর্শের অনুগামী, মস্কা ও পারেতো তাঁদের শীর্ষস্থানীয়। বর্তমানে তাঁদের 'মুক্তির রক্ষক' বলে ঘোষণা করা হয়। বুর্জোয়া সমাজের বিকাশে আমলাতন্ত্রের ভূমিকা সম্পর্কে তাঁর ইউটোপীয় মতামত ও জাতীয়তাবাদের মিশেলের জন্য প্রমুখ জার্মান সমাজবিদ ম. ভেবেরকে বলা হয়েছিল 'জার্মান মাকিয়াভেলি'।

পূর্বোল্লিখিত উইটফিল্ডের মতে, মাকিয়াভেলির পজিটিভিস্ট ব্যাখ্যানে প্রশস্ত হয় রাষ্ট্র বিষয়ে তাঁর মতবাদের ফ্যাসিস্ট ভাষ্যের পথ। যেমন, প্রমুখ ইতালীয় সাহিত্যের ঐতিহাসিক দে সাঙ্কতিসের মতে, রাষ্ট্র যে মধ্যযুগীয় সর্বগ্রাসী ঐশ্বরিকতার স্থলবর্তী হয়, সে বিষয়ে মাকিয়াভেলির ধারণাও তারই সদৃশ, ফলে রাষ্ট্রের ভূমিকা নিয়ে ফ্যাসিস্ট ব্যাখ্যারই কাছাকাছি।

আধুনিক কালের রাজনৈতিক আন্দোলনের তাত্ত্বিক ভিত্তি নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সম্প্রতি যে পাঠ্যসংকলন প্রকাশিত হয়েছে, তাতে মাকিয়াভেলিকে (বদেন, হব্‌স, হেগেলের সঙ্গে সঙ্গে) রাজনীতির রূপায়ণ ও প্রতিপাদনের ফ্যাসিস্ট পদ্ধতির তাত্ত্বিক পূর্বসূরী হিশেবে গণ্য করা হয়েছে। মিচিগান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত গ্রন্থটির সংকলক ও টীকাকার ক. কোয়েন লিখছেন: 'সার্বভৌম ক্ষমতা ও নিরংকুশ শাসন যে প্রয়োজন তার তাত্ত্বিক ভিত্তি বিকশিত করে তাঁরা ফ্যাসিস্ট আন্দোলনকে পুষ্ট করেছেন। প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে বর্তমান ফ্যাসিস্টরা তাঁদের কাছে অনেক ঋণী।' কোয়েন কার্যত এই মতাবলম্বী যে 'সার্বভৌম' গ্রন্থটি স্বৈরাচারী শাসনের পাঠ্যপুস্তক রূপে পঠনীয়।*

রাজনীতির বর্তমান বুর্জোয়া তাত্ত্বিকেরা মাকিয়াভেলির স্তুতিবাদক্রমে তুলে ধরেন তাঁর মতবাদের বলিষ্ঠ দিকগুলি নয়। আগেই যা দেখানো হয়েছে, মাকিয়াভেলির আগ্রহের মূলে রয়েছে বৈরী সামাজিক গ্রুপ ও পার্টিগুলির মধ্যে সংগ্রাম, তাদের পেছনে রয়েছে নির্দিষ্ট এক-একটা

সামাজিক-শ্রেণীগত স্তর ও গ্রুপ। মাকিয়াভেলির মতবাদের বলিষ্ঠ দিকটা হল রাজনীতি ও রাষ্ট্রপাট, রীতিনীতি ও আইনাদি বর্ণনার গতিমাত্রিক চরিত্র। কিন্তু তাঁর বুর্জোয়া অনুগামীরা তাঁর ধ্যানধারণার সর্বাধিক আধিবিদ্যক ও রক্ষণশীল দিকগুলিতেই আকৃষ্ট। তাতে মনে হয় রাজনৈতিক প্রবণতাগুলি যেন-বা অপরিবর্তমান, বিভিন্ন জাতির ইতিহাস পর্যালোচনায় যেন-বা তাদের আবিষ্কার করা যাবে।

মাকিয়াভেলির ক্ষমতা তত্ত্বে বুর্জোয়া পণ্ডিতেরা ক্ষমতা দখল, তার প্রয়োগ ও ধরে রাখার পথ ও পদ্ধতি আলোচনায় সর্বাগ্রে দেখেন তার জবরদস্তির দিকটা। এই প্রসঙ্গে প্রায়ই তাঁকে তুলে ধরা হয় সাম্প্রতিক 'শক্তিভিত্তিক রাজনীতি' ('power politics') তত্ত্বের প্রবর্তক রূপে, বিশেষ করে এটা প্রচলিত আন্তর্জাতিক সম্পর্কের গবেষকদের মধ্যে।

বড়ো দরের একজন বুর্জোয়া সমাজবিদ, আন্তর্জাতিক উত্তেজনা প্রশমনের কট্টোর বিরোধী র. আরোন 'শক্তিভিত্তিক রাজনীতির' জন্য তাঁর পক্ষপাত সমর্থন করে প্রায়ই ইতালীয় মনীষীর উল্লেখ করেন। একটা সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন:

'আমি মনে করি যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে বড়ো বেশি মতৈক্য দেখা গেলেও ইউরোপীয়রা অসন্তুষ্ট হয়। সেটা তেমন আশ্চর্যের কিছু নয়: কোনো একটা বৃহৎ শক্তির গৌণ সহযোগী নিজের ক্রিয়াকর্ম ও সামর্থ্যের স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত বলে বোধ করে যখন উত্তেজনা এত বেশি যে মুরুব্বির পক্ষপুটে আশ্রয় নিতে সে বাধ্য হয়, আবার তখনো, যখন উত্তেজনা এতই হ্রাস পায় যে তার মুরুব্বি গৌণ সহযোগীর মতামতের অপেক্ষা না করেই শত্রুর সঙ্গে কথাবার্তা চালাতে পারছে। একে বলা যায় মাকিয়াভেলি কায়দায় ক্লাসিক বিশ্লেষণ।'*

বুর্জোয়া উত্তরকালীন মাকিয়াভেলিপন্থীদের সাধারণ বৈশিষ্ট্য হল সমাজজীবনের অন্যান্য দিক থেকে রাজনৈতিক সংগ্রামের কৃত্রিম বিচ্ছিন্নকরণ, শাসক উপরমহলের রাজনৈতিক চক্রান্ত এবং জবরদস্তির স্বশাসনে বেশি জোর দেয়া। মাকিয়াভেলিপন্থীদের কাছে যেকোনো রাজনৈতিক ঘটনা ব্যাখ্যার উৎস হল রাজনৈতিক কেজোমির কুটিল আধিপত্য, যেখানে সক্রিয় কেবল ক্ষমতালিপ্সু ও স্বৈরশাসকেরা। এখানে আমরা শুনি না গণআন্দোলনের আরো পরাক্রান্ত পদধ্বনি, বৈপ্লবিক ঝাঁকুনির গুরুগর্জন, সংগ্রামীদের

কণ্ঠস্বর, ইতিহাসে ধ্বনিত নৈতিক আহ্বান ও দাবি।... সর্বত্রই এ ভাবাদর্শীরা যায় একই পথে: শোষকশ্রেণীর রাজনীতির যে জঘন্যতা প্রথমেই চোখে পড়ল, সেটাকেই লুফে নিয়ে ঘোষণা করা হয় যে তা-ই নাকি সাধারণভাবে রাজনৈতিক সংগ্রামের সামগ্রিক, বিমূর্ত যুক্তির চরিত্রেই নিহিত।

মাকিয়াভেলিকে আধুনিক করে তোলার আরো একটা প্রকারভেদ আছে। তাতে রাজনীতি ও রাজনৈতিক সম্পর্কের প্রকৃতি নিয়ে মাকিয়াভেলির কয়েকটি সিদ্ধান্তকে নির্বিচারে টেনে আনা হয় সাম্প্রতিক কালে।

মাকিয়াভেলির ৫০০তম জন্মবর্ষ উপলক্ষে তাঁর উত্তরাধিকারের আধুনিক ব্যাখ্যা নিয়ে একটি গবেষণা নিবন্ধ রচনা করেছেন ইংরেজ ঐতিহাসিক আ. সিডনী। তাঁর বক্তব্য এইরকম: 'রাজনীতিকদের সীমাবদ্ধ মানসিক দিগন্ত ও রাষ্ট্রের নামে মানবিক সবকিছুর ওপর বলপ্রয়োগ নিয়ে তাঁর (মাকিয়াভেলির) পর্যবেক্ষণ আজো ঠিক তখনকার মতোই আশ্চর্য সত্যাশ্রয়ী যখন তিনি তার বর্ণনা করেছিলেন। সাম্প্রতিক রাজনীতিতে এমন কিছু খুঁজে পাওয়া অসম্ভব যা মত পরিবর্তনে বাধ্য করতে পারে মাকিয়াভেলিকে...'।*

আদিবুর্জোয়া ও সাম্প্রতিক বুর্জোয়া চিন্তায় রাজনীতির নৈরাশ্যবাদী মূল্যায়নের সুস্পষ্ট নৈকট্যে শুধু একটা জিনিসই প্রমাণিত হয়, যথা, অতীত ও বর্তমানের বুর্জোয়াদের পক্ষ থেকে যে সামাজিক মুক্তি প্রস্তাবিত এবং কার্যক্ষেত্রে রূপায়িত হয়েছে, তার দিগন্ত বড়োই সংকীর্ণ। তাছাড়া, এই ধরনের বিবেচনা অতি সুনির্দিষ্ট ভাবাদর্শে ভারাক্রান্ত, কেননা প্রকাশ্যে বা প্রচ্ছন্নে তা এই ধারণাটা চালাতে চায় যে রাজনৈতিক বাস্তবতা অপরিবর্তনীয়, এমনকি সমাজতন্ত্রের আগমনেও — যা বুর্জোয়া রাজনৈতিক ক্ষমতা ও রাজনৈতিক আচার-আচরণের একমাত্র বাস্তব বিপরীত মেরু।

পশ্চিমে থেকে থেকেই বই বেরিয়েছে প্রখ্যাত ঐ ফ্লোরেন্স সন্তানের অনুকরণে। তাতে থাকে রাজনৈতিক নেতৃত্বের রণনীতি নিয়ে উপদেশ, সরকার অথবা বড়ো বড়ো কর্পোরেশনের রাজনৈতিক পলিসির খতিয়ান, এমনকি ছোটোখাটো পরামর্শ আর দাওয়াই।

বর্তমানে বুর্জোয়া রাজনৈতিক নেতৃত্বের কাছে খুবই জরুরি সমস্যা

হয়ে দাঁড়িয়েছে 'আস্থার সংকট', সামাজিক অসন্তোষ অথবা বিদ্রোহের কালে শৃঙ্খলা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠা রক্ষা। এক্ষেত্রেও ক্ষমতাধরদের সেবায় প্রস্তাবিত হতে পারে অসংখ্য পেশাদার সুপারিশ ও ভাষ্য।

সমাজবিদ্যা ও রাজনীতিবিদ্যার আধুনিক বুর্জোয়া পণ্ডিতদের বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে সময় থাকতে সংকট প্রবণতাগুলির আবির্ভাবের সর্ববিধ রাজনৈতিক পূর্বাভাষ দান এবং তাদের বিকল করে দেবার মতো ব্যবহারিক ব্যবস্থা সংরচন। এ ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট একটা ভূমিকা নেয় এই বিশ্বাস যে শুধু যে 'ভবিষ্যদ্বিদ্যা ভবিষ্যতের ওপর থেকে যবনিকা উত্তোলনেই' সক্ষম তাই নয়, ভবিষ্যতের গতিপথও প্রভাবিত করতে পারে। এ বিষয়ে প্রমুখ মার্কিন সমাজবিদ ড. বেল খোলাখুলি লিখেছেন বুর্জোয়া মার্কিন পণ্ডিতদ্বয় হ. কান ও এ. উইনারের সোরগোল তোলা বই '২০০০ সাল'এর ভূমিকায়: 'ভাগ্য ও শৌর্যের মধ্যে পার্থক্যের অপূর্ব বর্ণনায় (তাঁর 'সার্বভৌম', ২৫ অধ্যায়ে) মাকিয়াভেলি বলেছেন যে মানবিক ক্রিয়াকর্মের অর্ধেকটা চালিত হয় দৈবক্রমে, বাকি অর্ধেকটা তারা চালায় নিজেরাই। এই বইখানা এবং ২০০০ সাল নিয়ে কমিশনের সমস্ত কাজই হল সে সম্পর্কটা বদলাবার একটা প্রয়াস।'*

বর্তমান প্রাচ্যের রাজনৈতিক চিন্তাশীলদের রচনাতেও মাকিয়াভেলির ভাবাদর্শে আগ্রহ লক্ষণীয়। ভাবাদর্শের দিক থেকে যথেষ্ট সুনির্দিষ্ট রূপেই তাঁরা এর ওপর আলোকপাত করেছেন। যেমন, মহাত্মা গান্ধী বিমূর্ত নৈতিক অবস্থান থেকে মাকিয়াভেলির সমালোচনা করেছেন এই বলে যে তাঁর পরম নৈতিক মূল্যবোধ নেই।**

রাজনৈতিক ভাবনার ইতিহাসে মাকিয়াভেলির তাৎপর্যের সত্যকার বৈজ্ঞানিক শ্রেণীগত মূল্যায়নের দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে তাঁর প্রতি মার্কসবাদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতারা ছিলেন রাজনৈতিক ও ব্যবহারশাস্ত্রীয় জ্ঞানে বিদগ্ধ, নিঃসন্দেহেই মাকিয়াভেলির রচনা তাঁদের ভালো জানা ছিল। মার্কসের মহাফেজখানায় সংরক্ষিত আছে মাকিয়াভেলির 'টিটাস লিবিয়াসের প্রথম দশাহ নিয়ে বিচার' গ্রন্থটি থেকে টোকা নানা জায়গার উদ্ধৃতি, তাতে বিশেষ মন দেয়া হয়েছে রাষ্ট্রের শ্রেণী ভিত্তি, সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা, পোপতন্ত্র সম্পর্কে মাকিয়াভেলির

অবস্থান, তাঁর সুসঙ্গত প্রজাতান্ত্রিক ও স্বৈরশাসনবিরোধী ভাবনায়। প্রসঙ্গত, মার্কস মাকিয়াভেলির এই ভাবনাটায় জোর দিয়েছেন যে রাজনৈতিক সংগ্রামের মূলে রয়েছে সম্পত্তির জন্য সংগ্রাম এবং এ সংগ্রামের সবচেয়ে সক্রিয় পক্ষ হল সম্পত্তিমালিকেরা; জনগণের চাপে সে সম্পত্তি খোয়া যাবে বলে তারা ভীত, জনগণ সে সম্পত্তি দখল করতে চায়।*

মাকিয়াভেলির শেষ উল্লেখযোগ্য রচনা — 'ফ্লোরেন্সের ইতিহাস'। একদিক থেকে এটি হয়ে দাঁড়ায় তাঁর ধ্যানধারণার তাত্ত্বিক সাধারণীকরণ। মার্কস একে বলেছেন শ্রেষ্ঠাবদান (১৮৫৭ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর এঙ্গেলসের নিকট পত্রে)।**

'প্রকৃতির দ্বান্দ্বিকতা' গ্রন্থের পুরনো ভূমিকায় এঙ্গেলস রেনেসাঁস যুগের বড়ো বড়ো কর্মবীরদের বর্ণনা প্রসঙ্গে বিশেষ করে বলেন মাকিয়াভেলির কথা। তিনি এই সিদ্ধান্ত টেনেছেন যে মাকিয়াভেলি ছিলেন 'রাষ্ট্রিক কর্মকর্তা, ঐতিহাসিক, কবি এবং, তদুপরি, নবকালের প্রথম উল্লেখযোগ্য সামরিক লেখক'***।

এঙ্গেলস বলেছেন, মাকিয়াভেলির মতো কর্মীদের বুর্জোয়া সীমাবদ্ধতা ছিল না। 'সার্বভৌম'এর লেখক নিচুতলার অভ্যুত্থান দমনের দ্বিধাহীন পক্ষপাতী, কিন্তু তিনিই আবার প্রচার করেছেন যে জনগণ সমগ্রভাবে সার্বভৌমের চেয়ে বেশি প্রাজ্ঞ ও স্থায়ী, 'শুধু একটা জিনিসই জনগণ চায় — নিপীড়িত না হতে'।

আ. ভ. লুনাচার্স্কি মনে করতেন যে রাষ্ট্র সম্পর্কে ঐহিক দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশে 'সার্বভৌম' গ্রন্থটি একটি তুঙ্গ বিন্দু। তাঁর মতে, মাকিয়াভেলি যে ধরনের সার্বভৌমের ছবি এঁকেছেন, তারা বুর্জোয়াকে সমুন্নত করার হাতিয়ার। যে রাজনীতি হবে উদ্দেশ্যোপযোগী, যাতে জয়লাভ করা যাবে, তাকেই মুখ্য করে তুলে মাকিয়াভেলি যতকিছু অনুশাসন, যতকিছু নৈতিক কুসংস্কার, সম্মান, সততা ইত্যাদির সবকিছু ধারণা ছুঁড়ে ফেলে

দেন। কিন্তু 'সার্বভৌম'এ এই যুক্তিবাদ, নির্মম স্থিরমস্তিষ্ক বুদ্ধি, অনতিশির, ক্ষিপ্রক্রিয় ইচ্ছা মাকিয়াভেলির কাছে ছিল রাজনীতির বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক হাতিয়ার, যার সন্ধান করছিল বুর্জোয়ারা। 'এটা ছিল 'সার্বভৌম'এর মধ্যযুগীয়, ঘোলাটে বর্বর, আধা-সন্ন্যাসীসুলভ আচরণকে রাজনৈতিক প্রণালীর যথাযথ ভাষায় অনুবাদ যা বাহ্যত মনে হবে অবজ্ঞাকুটিল।'*

কমিউনিস্টদের প্রকাশ্য ও সচেতন মাকিয়াভেলিপনায় অভিযুক্ত করার চেষ্টা হচ্ছে খাস মার্কসবাদী তত্ত্বের প্রায় জন্ম থেকেই। বুর্জোয়া সাহিত্যে সাধারণত প্রচলিত ছক অনুসারে মার্কসকে মাঝে মাঝে বলা হয় 'প্রলেতারীয় মাকিয়াভেলি'। প্রখ্যাত ইতালীয় ঐতিহাসিক ও দার্শনিক ব. ক্রোচের মতে, মার্কস 'সমাজবিদ্যায় শক্তি ও সংগ্রামের ধারণা ঢোকান এবং তাতে করে এই বিজ্ঞানটিকে পুনরায় ঐতিহাসিক বাস্তবতার মুখাপেক্ষী করেন'**। মার্কসের দৃষ্টিভঙ্গির এরূপ 'সংশোধনের' সঙ্গে মার্কস বা মার্কসবাদের কোনোই সম্পর্ক নেই। বৈজ্ঞানিক আপ্তবাক্য সমালোচনার ভেক নিয়ে ক্রোচে চেষ্টা করছেন মার্কসবাদের বনিয়াদী বৈজ্ঞানিক অভিনবত্ব হরণ করতে, তার বৈজ্ঞানিক মূল্য খাটো করতে।

বর্তমান বুর্জোয়া ভাবাদর্শীদের মধ্যে যারা খোলাখুলি কমিউনিস্ট-বিরোধী, তারা মাকিয়াভেলির ধ্যানধারণায় এমন সব যুক্তি ও প্রস্তাব খুঁজতে চায় যা রাজনৈতিক মত ও আদর্শের বর্তমান সংগ্রামে সাফল্যের সঙ্গে কাজে লাগানো যাবে। রাজনীতিতে মাকিয়াভেলিপনার নেতিবাচক চেহারাটা মনে রেখে কমিউনিস্টবিরোধী ও সোভিয়েতবিরোধীরা রাজনৈতিক মাকিয়াভেলিপনার দিকগুলো চাপাতে চায় সমাজতন্ত্রের রাজনৈতিক ব্যবস্থার ওপর। 'প্রলেতারিয়েতের কমিউনিস্ট একনায়কত্বের মধ্যে রয়েছে,' — লিখেছেন ইংরেজ সমাজবিদ ফ. মাউন্ট, — 'মাকিয়াভেলির মূল ধারণাগুলি, যথা: অনবীভূত সমাজের স্বাভাবিক প্রবণতা হল নৈরাজ্য; তেমন প্রবণতা থাকলে সর্বদাই দেখা দেবে বিপজ্জনক প্রতিপক্ষ, যারা উৎকর্ণ এবং এরূপ পরিস্থিতি থেকে লাভ ওঠাতে সর্বদা প্রস্তুত; রক্ষা

পাওয়া সম্ভব হতে পারে কেবল শক্তি দিয়ে। প্রতিবিপ্লব, শোধনবাদ আর সাম্রাজ্যবাদ হল কেবল প্রতিদ্বন্দ্বী শাসকের অন্য নাম।'*

কমিউনিস্টবিরোধীদের যুক্তিতে বুর্জোয়া রাষ্ট্র গঠিত একেবারেই অন্য ভিত্তিতে। আমেরিকান রাজনৈতিক সমাজবিদ ও ঐতিহাসিক ল. স্ট্রাউস লিখছেন: 'বলা যেতে পারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই বিশ্বে একমাত্র দেশ যা মাকিয়াভেলির নীতির প্রকাশ্য বিরোধিতার ওপর প্রতিষ্ঠিত'। নীতিগত-ভাবে মাকিয়াভেলিবিরোধী ও কমিউনিস্টবিরোধী হিশেবে স্ট্রাউস ধরে নিচ্ছেন যে তা ছাড়া অন্যকিছু হতে পারে না, কেননা, মাকিয়াভেলির মতে, নাকি অপরাধ না করে রাজনৈতিক মহিমা অর্জন করা যায় না**।

আধুনিক কমিউনিস্টবিরোধী যে মাকিয়াভেলির ভাবাদর্শীয় উত্তরাধিকারের দ্বারস্থ হচ্ছে, সেটা খামোকা নয়, তার একটা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য আছে, যথা — মাকিয়াভেলির মতবাদের সবচেয়ে রক্ষণশীল ও প্রতিক্রিয়াশীল বক্তব্যগুলির সাহায্যে নিজেদের ভাবাদর্শীয়-রাজনৈতিক অবস্থান জোরদার করার জন্য এই মনীষীর প্রামাণ্যতা কাজে লাগানো।

মার্কসবাদীদের কাছে মাকিয়াভেলি তাঁর সমস্ত বুর্জোয়া সীমাবদ্ধতা, জনগণের নিচু মহলের প্রতি নেতিবাচক মনোভাব, প্রবল কর্তৃত্বধারী ক্ষমতার জয়গান সত্ত্বেও একজন বড়ো দরের মনস্বী, প্রজাতন্ত্রবাদী, দেশপ্রেমিক, ধর্ম ও প্রতিক্রিয়াশীল পোপতন্ত্রের বিরোধী। রাজনৈতিক ভাবনার ইতিহাসে মাকিয়াভেলির প্রধান অবদান এই নয় যে রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রিক-আইনী ব্যাপারাদিকে তিনি ব্যবহারিক রাজনীতিক ও নিরাসক্ত পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিতে দেখেছিলেন, তাঁর প্রধান কীর্তি হল রাষ্ট্রজীবনের ঘটনাবলিকে তিনি অনুধাবন করেছেন তার ওপর প্রভাবশীল সমস্ত শর্ত, সর্বাগ্রে শ্রেণীগত শক্তি এবং পার্টির গ্রুপগুলির সংগ্রামের সঙ্গে সম্পর্কিত করে, তাছাড়া নির্দিষ্ট একটা ভাবাদর্শীয় ও রাজনৈতিক অবস্থান থেকে সামন্ততন্ত্রের সমালোচনা করেছেন তিনি ও বুর্জোয়া রাজনৈতিক তত্ত্ব ও ভাবাদর্শের গোড়াপত্তনের জন্য জঞ্জাল সাফ করে দিয়েছেন।



§ ৩। টমাস মুর

ষোলো শতকের গোড়ায় উত্তর ইউরোপে যখন আদি পুঁজিবাদী উৎপাদনের প্রথম পদক্ষেপ শুরু হয়, ইংলণ্ডে তখন দেখা দেন আধুনিক কালের প্রথম সমাজতন্ত্রী — টমাস মুর। ১৫১৬ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর 'শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রব্যবস্থা ও নূতন দ্বীপ ইউটোপিয়া সম্পর্কে যেমন হিতকর তেমনি মজাদার স্বর্ণগ্রন্থ' — সংক্ষেপে যা 'ইউটোপিয়া' নামে বেশি পরিচিত। এটি ছড়িয়ে পড়ে ইউরোপের সমস্ত ভাষায়, গোটা একটা রাজনৈতিক ধারা, যা কমিউনিস্ট আদর্শ ঘোষণা করেছিল, কিন্তু তা রূপায়িত করার বাস্তব পথ দেখাতে অক্ষম হয় (মুরের যুগে পুরোপুরি অবজেকটিভ কারণ বশত), তা ইউটোপীয় সমাজতন্ত্র বলে অভিহিত হয় এই বই থেকেই।

টমাস মুরের (১৪৭৮-১৫৩৫) জন্ম লণ্ডনে, ধনী নাগরিক পরিবারে, শিক্ষা লাভ করেন বিশিষ্ট রাজনৈতিক কর্মকর্তা কার্ডিনাল মর্টনের গৃহে। এখানে শাসক মহলের সঙ্গে তাঁর মেলামেশা হয়, পরিচিত হন রাষ্ট্রায়তনে প্রশাসন ও রাজনীতির সমস্যাদির সঙ্গে। তাঁর বিশ্ববীক্ষা গঠনে বড়ো একটা প্রভাব পড়ে অক্সফোর্ডে থাকার সময়, যেখানে পনেরো শতকের শেষে মধ্যযুগীয় স্কলাস্টিসিজমকে কোণঠাসা করছিল নতুন হাওয়া। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে গড়ে ওঠে মানববাদী অধ্যাপকদের চক্র, তাতে ছিলেন উ. গ্রট্‌সিন, ট. লিনাক্র্, ড. কোলেট ও এরাজ্‌মাস ডেসিডেরিয়াস। পরে পিতার জেদাজেদিতে টমাস মুর বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে দিয়ে লণ্ডন স্কুলে (নিউ ইন, লিঙ্কলন ইন) আইন পড়তে বাধ্য হন। ওকালতির জন্য তৈরি হয়ে ওঠেন তিনি এবং সঙ্গে সঙ্গেই তাতে নাম করেন, কেননা লণ্ডন বেনিয়া সম্প্রদায়ের স্বার্থ তিনি রক্ষা করতেন। ছাবিশ বছর বয়সে মুর নির্বাচিত হলেন পার্লামেণ্টে। সম্পত্তির ওপর কর বৃদ্ধির জন্য সপ্তম হেনরির প্রয়াসের তীব্র বিরোধিতা করলেন এই নবীন রাজনীতিক। তাঁর বাগ্মিতায় রাজার দাবি প্রত্যাহৃত হয়। কুদৃষ্টিতে পড়লেন তিনি, কিছু সময়ের জন্য সরে গেলেন সামাজিক জীবন থেকে। কিন্তু সপ্তম হেনরির মৃত্যুর পরেই, ১৫০৯ সালে তিনি লণ্ডন শেরিফের সহকারী নিযুক্ত হলেন। আদালতের কাজে দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার জ্ঞান বাড়িয়ে তোলা সম্ভব হল মুরের পক্ষে। যে মুর এতদিন পর্যন্ত রাজদরবার থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করে এসেছিলেন, 'ইউটোপিয়া' প্রকাশের দু'বছর পর তিনিই নতুন রাজা, অষ্টম হেনরির কাজে যোগ দিলেন এবং অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের মধ্যেই, ১৫২৯ সালে হলেন লর্ড চ্যান্সেলার। মুরের গুণাবলি ও লণ্ডনবাসীদের, বিশেষ করে বেনিয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে তাঁর যে সম্মান ছিল, তার কদর করতেন অষ্টম হেনরি। জার্মানিতে যে সংস্কার আন্দোলন শুরু হয়েছিল, তার বিরুদ্ধে সংগ্রামও রাজাকে তাঁর প্রধান মন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ করে তোলে। অষ্টম হেনরি প্রথমে ছিলেন সনাতনী ক্যাথলিক। ১৫২১ সালে তিনি লুথারের বিরুদ্ধে পুস্তক প্রকাশ করেন। লুথার তার জবাব দেন গালাগালি করে। ১৫২৩ সালে 'ইংলণ্ড রাজ অষ্টম হেনরির ওপর মার্টিন লুথারের ছিটানো টিটকিরির জবাবে ট. মুর' লিখে নিজের রাজপ্রভুকে তিনি সমর্থন করেন।

কিন্তু মুরের প্রকৃতিগত স্বাধীনতা, নিজের আদর্শ রক্ষায় দৃঢ়তা তাঁকে অমোঘভাবে ঠেলে দেয় অষ্টম হেনরির স্বৈরাচারী ক্ষমতার সঙ্গে সংঘর্ষে।

১৫২৩ সালেই পার্লামেন্টের স্পিকার পদে থেকে রাজার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তিনি বাজেটের প্রশ্নে নিম্ন সভার স্বার্থ রক্ষা করেন। মুর এবং অষ্টম হেনরির পথ চূড়ান্তরূপে ভিন্নমুখী হয়ে গেল ব্রিটিশ রিফর্মেশনের পর্বে। পোপের সিংহাসনকে যে নিজের প্রভাবাধীন করা যাবে না, এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হয়ে অষ্টম হেনরি লুথারের সঙ্গে বিতর্কে যে ক্ষিপ্রতায় ক্যাথলিকতার নীতি সমর্থন করেছিলেন, সেইভাবেই স্থির করলেন পোপতন্ত্রের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করবেন, নিজেকে তিনি ঘোষণা করলেন গির্জার প্রধান। অবজেকটিভ দিক দিয়ে অষ্টম হেনরি সম্পাদিত ব্রিটিশ রিফর্মেশনের সুফল ছিল। তার প্রথম উপকার -- পোপকে প্রদেয় গুরুভার কর লোপ। প্রায় সমগ্র জনসমষ্টি এতে সোৎসাহে সায় দেয়। কিন্তু ব্রিটিশ রিফর্মেশনের ছিল একটা ওপর-ওপর, সীমাবদ্ধ চরিত্র, সর্বাগ্রে তার লক্ষ্য ছিল রাজার ক্ষমতা বৃদ্ধি, রাজা এবং বড়ো বড়ো ভূস্বামীদের ধনলাভ। মুর ছিলেন ঘটনাবলির মাঝখানে, চমৎকার দেখতে পাচ্ছিলেন ব্রিটিশ রিফর্মেশনের পেছনকার প্রেরণা ও তার পদ্ধতি, তাই সেটা তিনি অনুমোদন করতে পারলেন না।

১৫৩২ সালে মুর লর্ড চ্যান্সেলারের পদ ত্যাগ করলেন এবং তাতে করে খোলাখুলি দ্বন্দ্বে আহবান করলেন রাজাকে। পূর্ণাকারে যে শপথবাক্য নিতে হত, তাতে রাজাকে ইংলন্ডের চার্চের প্রধান বলে মেনে নেবার কথা ছিল, মুর তাতে রাজি না হওয়ায় টাওয়ারে বন্দী ও রাষ্ট্রীয় বিশ্বাসঘাতকতায় অভিযুক্ত হলেন।

১৫৩৫ সালের ৬ জুলাই মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হল টমাস মুরকে।

মৃত্যুর পরেই মুর হয়ে উঠলেন ইংরেজ ক্যাথলিকদের ভক্তির পাত্র, সংস্কারকদের হাতে নিহত শহীদ বলে পূজা পেলেন। তিন শতাব্দী পরে পোপের ১৮৮৬ সালের ঘোষণায় সরকারিভাবে টমাস মুরকে উন্নীত করা হয় সন্তদের পর্যায়ে।

মুরের জীবন এবং স্বকালের ঝোড়ো ইতিহাসে তাঁর ভূমিকা দুই-ই স্ববিরোধী। 'ইউটোপিয়া'র প্রধান চরিত্রের মুখ দিয়ে তিনি ক্ষমতা থেকে দূরে সরে থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন, আর নিজেই তিনি রাজ কার্যে যোগ দিলেন। 'ইউটোপিয়া'য় স্কলাস্টিসিজম ও ক্যাথলিক যাজকদের তীব্র সমালোচনা করলেও তিনি অস্ত্র ধারণ করলেন মার্টিন লুথার ও জার্মান সংস্কার আন্দোলনের বিরুদ্ধে। ওই একই গ্রন্থে ধর্মীয় সহনশীলতার নীতির অন্যতম প্রথম উত্থাপক হলেও বৃহৎ রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তা হিশেবে তিনি

ব্রিটিশ লুথারপন্থীদের উপর উৎপীড়নে অংশ নিয়েছেন। মুর বিষয়ে প্রটেস্ট্যাণ্ট সাহিত্যে এই দ্বন্দ্বগুলোর ওপর বিশেষ জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে 'ইউটোপিয়া'র লেখক আর রিফর্মেশনের শত্রুর মধ্যে বিরোধ আপোসহীন, প্রটেস্ট্যাণ্টদের উন্মাদ উৎপীড়ক বলে দেখাবার চেষ্টা করা হয়েছে মুরকে। অক্সফোর্ডের মানববাদীদের বন্ধু যে মুর 'ইউটোপিয়া'য় প্রকাশ করেছেন মননশীলতার স্বাধীনতা, তাঁকে যে লর্ড চ্যান্সেলার মুরের সঙ্গে মেলানো কঠিন, এ কথা স্বীকার করেও খানিকটা অপক্ষপাতী গবেষকরা উল্লেখ করেন যে এমনকি শেষের ভূমিকাতেও মুরের মধ্যে 'ইউটোপিয়া' লেখকের পক্ষে বৈশিষ্ট্যসূচক বহু গুণ দেখা গেছে।

চ্যান্সেলার মুর 'ইউটোপিয়া'য় বিধৃত ধর্মীয় সহনশীলতার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন, ব্রিটিশ মার্কসবাদী আ. ল. মর্টন মনে করেন এ মত ভিত্তিহীন। সত্যাই মুর কি পরিমাণে লুথারপন্থীদের পীড়ন করেছিলেন, যাতে তাঁর কিছুটা সন্দেহ আছে, সে প্রশ্ন ছেড়ে দিলেও মর্টন উল্লেখ করেছেন যে মুর 'ইউটোপিয়া'র নীতি অনুসারেই চলেছিলেন, সে নীতি অনুসারে, যে-ধর্মের প্রচারে সামাজিক অসন্তোষ প্ররোচিত হয়, তা নিন্দিত, আর কৃষক অভ্যুত্থান থেকে অবিচ্ছেদ্য সংস্কার আন্দোলন মুরের চোখে ছিল তেমনি প্রচার।*

সংস্কারের গণ আন্দোলনে মুর আপত্তি করেন, কেননা তাতে তিনি দেখেছিলেন মানবিক সংস্কৃতির পক্ষে একটা বিপদ, ভয় পেয়েছিলেন নিপীড়িত জনগণের আন্দোলনে। তিনি বোঝেন নি যে মধ্যযুগীয় ধ্যানধারণা থেকে বহু পরিমাণে অনুপ্রাণিত হয়ে এই সংস্কার আন্দোলন ইউরোপের সামনে একটা নতুন দিগন্ত মেলে ধরছে। তিনি বোঝেন নি যে অবজেকটিভ ক্ষেত্রে এটা প্রগতির পথ। তিনি শুধু তাঁর সমকালীন সমাজব্যবস্থাকেই নয়, যা তার স্থলাভিষিক্ত হতে যাচ্ছিল, সম্পূর্ণতার নামে তাকেও নস্যাৎ করেন।

মুর যে আদর্শ উপস্থিত করেন, সেটা তাঁর যুগ থেকে বহু এগিয়ে ছিল, কিন্তু তিনি সমকালীনদের জন্য তা-ই ধার্য করেন নি। 'ইউটোপিয়া'র কথক তীব্র ব্যঙ্গে বলেছেন যে দ্বীপে তিনি যা দেখেছেন তেমন বহু জিনিস তাঁর কাছে কাম্য হতে পারে, কিন্তু ইউরোপে তা কার্যকৃত হবে বলে তিনি

আশা করেন না। তবে তাঁর প্রস্তাবিত আদর্শের পরিপূর্ণ অবাস্তবতায় ছাড়া পেয়েছিল তাঁর সৃজনী সম্ভাবনা। 'টমাস মুর তাঁর 'ইউটোপিয়ার বাস্তবায়নে আদৌ বিশ্বাস করেন নি,' — লিখেছেন ইয়ে. ভ. টার্লে। 'সেই কারণেই তাঁর সাহিত্যকর্ম এত চিত্তাকর্ষক এই দিক থেকে: তাঁর নির্মিতিগুলিতে আমরা দেখি ব্যবহারিক উন্নয়নের নিষ্ফলতা ও অসম্ভাবিতাটাই মাঝে মাঝে কী পরিমাণে চিন্তার তাত্ত্বিক পরিধি বাড়িয়ে দিচ্ছে, তাকে মুক্ত করছে সমস্ত সংকোচন ও অবরোধ থেকে।'*

মুর ছিলেন মানবতাবাদের, মধ্যযুগের ধর্মীয় আপ্তবাক্য থেকে মুক্ত রেনেসাঁস যুগের বৈজ্ঞানিক ধারার সেরা প্রতিনিধিদের অন্যতম। যুক্তিবাদী বিচারের একটা পরিমণ্ডল নিয়ে রেনেসাঁস যুগ অনুভূত হয় 'ইউটোপিয়া'র প্রতিটি শব্দে, তার পদ্ধতিবিদ্যাতেই। তাঁর ইউটোপীয়বাসীরা তৈলাধারপাত্র নাকি পাত্রাধারতৈল নিয়ে মোটেই মাথা ঘামায় না, 'এমনকি স্বপ্নেও... তারা নক্ষত্র দেখে ভাগ্য গণনার ছাইভস্ম দেখে না,' কিন্তু 'জ্যোতিষ্ক ও গ্রহাদির গতি সম্পর্কে অতি অভিজ্ঞ' ('ইউটোপিয়া', পৃঃ ১৪০)। ইউরোপে রাষ্ট্রিক ক্রিয়াকলাপ এবং শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রব্যবস্থার আলোচনায় মুর পুরোপুরি নির্ভর করেন বিচারবুদ্ধির ওপর, মুক্ত বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ওপর। 'ইউটোপিয়া'য় যেসকল বাস্তব ঐতিহাসিক চরিত্র আছে, তাঁদের একজন, কার্ডিনাল মর্টন ভাবেন যে 'প্রারম্ভিক কোনো পরীক্ষা যখন হয় নি,' তখন কোনো একটা সংস্কার সাফল্য লাভ করবে কি না অনুমান করা শক্ত ('ইউটোপিয়া', পৃঃ ৭০)।

তাঁর সমসাময়িক মাকিয়াভেলি ও বদেনের মতো মুরেরও সামাজিক-রাজনৈতিক ভাবনার বনিয়াদ হয়ে দাঁড়ায় লোকে লোকে সম্পর্ক, ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক নয়। এদিক থেকে মুরকে সমাজ বিষয়ে ঐহিক বিদ্যার একজন প্রতিষ্ঠাতা বলে গণ্য করা চলে, যদিও তাঁর লোকায়তি মাকিয়াভেলির মতো অত সঙ্গতিশীল নয়।

টমাস মুরের তাত্ত্বিক নির্মিতিগুলি প্রগতিতে, সমাজের যুক্তিযুক্ত পুনর্গঠনের বিশ্বাসে প্রদীপ্ত। বিনা গুঞ্জনে ভাগ্যের কাছে আত্মসমর্পণের মধ্যযুগীয় খ্রিস্টীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে এরূপ মনোভাবের মিল ছিল না,

সামাজিক চেতনায় তার প্রবর্তন ঘটে উৎপাদনী শক্তির বিকাশ, বিজ্ঞান ও শিল্পকলার সাফল্যাশ্রয়ী মানবিকতাবাদ দ্বারা।

ইউটোপীয় কমিউনিজমের সর্বাধিক পরিচিত নিদর্শন, প্লেটোর 'রাষ্ট্র' আর ম্রের 'ইউটোপিয়া'র মধ্যে ব্যবধান প্রায় দু'হাজার বছরের। এই সময়ের মধ্যে, সম্ভবত আশিসধন্য অগাস্টিনের 'ঐশ্বরিক নগর', যাকে কখনো কখনো 'ইউটোপিয়া'র দলে ফেলা হয়, তাকে না ধরলে, ওই ধরনের কোনো বড়ো সাহিত্য পাওয়া যায় না। তাহলেও জনগণের চেতনায় ইউটোপীয় আদর্শ টিকে ছিল অতীতের অপ্রত্যাবর্তনীয় স্বর্ণযুগ এবং ঐশ্বরিক রাজ্য সম্পর্কে ধারণায়। জগৎ হল পাপ ও দুঃখকষ্টের এক উপত্যকা, এখন অনুতাপ এবং পরলোকে ত্রাণ ছাড়া মানুষের আশা করার কিছু নেই — এমন একটা ধারণা থেকে উদ্ভূত নম্রতা ও কৃচ্ছ্রসাধনের ইউটোপিয়া ছিল সেটা। এই ব্যাপারেও আধুনিক কালের সবেগ হাওয়া বইয়ে দেন টমাস মুর, তাঁর ক্ষেত্রে আদি পাপের ধারণার সঙ্গে মিলিত স্বর্ণযুগের জন্য হাহুতাশের জায়গায় আসে প্রগতি ও যুক্তির ভিত্তিতে পূর্ণতা প্রাপ্তির ধারণা। মুরের গোটা রচনাটার মূল নীতি হল এই — এমন নীতিতে সমাজ গঠন যা সমাজের, তার সমস্ত সদস্যের কল্যাণের উপযোগী, অর্থাৎ এমন নীতি যা পরে, অবশ্য মুর থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন বোধে দেখা দিয়েছিল উপযোগিতাবাদের ভিত্তিতে।

কয়েক শতক পরে যা মনে হতে পারত, ষোলো শতকেই কমিউনিস্ট আদর্শের প্রতি আবেদন কিন্তু তেমন অদ্ভুত কিছু নয়। মুরের 'ইউটোপিয়া' বেশ পাকাপোক্ত, বিশেষ করে সাহিত্যিক একটা উৎস ছিল তার।

'ইউটোপিয়া'র যা মূল ভাবনা — সাধারণ মালিকানা, সেটা নিঃসন্দেহেই এসেছে প্রাচীন গ্রীক দর্শন ও ইতিহাস থেকে। মানবতাবাদীরা কমিউনিস্ট আদর্শের উৎস পেয়েছিলেন লিকুর্গের আইনে, বন্ধুদের মধ্যে সবকিছু হওয়া চাই সাধারণ — পিথাগোরাসের এই ভাবনায় এবং, বলাই বাহুল্য, সর্বাগ্রে প্লেটোর 'রাষ্ট্র'এ, মুরের ওপর যাঁর প্রভাব ছিল বিপুল এবং নিজেই তিনি 'ইউটোপিয়া'য় তার উল্লেখ করেছেন একাধিকবার। কিন্তু প্লেটোর অনুকরণ করেন নি মুর। 'রাষ্ট্র'এর আদল অনুসরণ করলেও তার সীমাবদ্ধতা তিনি কাটিয়ে উঠতে পেরেছিলেন অনেকটাই। প্লেটোর কমিউনিজমের সম্প্রদায়ভেদী চরিত্র, দাসপ্রথা, শোষণ ও সামাজিক অসাম্যের সঙ্গে তার সম্পর্ক তিনি বর্জন করেন। জাতিগত বৃত্তির প্লেটোনিক ধারণার বদলে তিনি উপস্থিত করেন বিরলতম ব্যতিক্রম বাদে উৎপাদনী কায়িক শ্রমে সমস্ত নাগরিকের যোগদানের বাধ্যতা। কমিউনিস্ট নীতিকে তিনি প্লেটোর মতো গোষ্ঠীসমাজের

মধ্যে সীমিত রাখেন নি, প্রসারিত করেছেন সমগ্র জাতীয় ভূখণ্ড জুড়ে। ব্যক্তিমানুষ সম্পর্কে প্লেটোর অতিমাত্রিক কঠোরতা, সমাজের নিকট তার পরিপূর্ণ অধীনতা পরিহার করতে চেয়েছেন মুর। 'ইউটোপিয়া'র রাজনৈতিক ব্যবস্থায় আছে ব্যক্তিগত রুচি ও আকাঙ্ক্ষা প্রকাশের বেশি সুযোগ, ব্যক্তিসত্তার অবাধ বিকাশের নির্দিষ্ট কিছু গ্যারান্টি। মুরের 'ইউটোপিয়া'য় পরিবার শুধু বজায় থাকছে তাই নয়, তা হল উৎপাদনী ক্রিয়াকলাপ ও সমাজজীবনের গুরুত্বপূর্ণ কোষকেন্দ্র, যেক্ষেত্রে প্লেটোর 'প্রজাতন্ত্র'এ পরিবারকে দেখা হয়েছে রাষ্ট্রীয় স্বার্থের প্রধান বিপদ বলে।

ক্যাথলিক হিশেবে সাধারণ মালিকানার সমর্থনে মুর খিস্টধর্মের প্রামাণিকতার আশ্রয় নেন। মুরের গ্রন্থের কথক হিটলোডেই জানাচ্ছেন যে ইউটোপিয়াবাসীরা সাগ্রহে খিস্টধর্ম গ্রহণ করেছেন, কেননা ওঁদের ওখানে যেরকম সাধারণ জীবনযাত্রা, তেমনটাই খিস্টের ভালো লাগত আর সেটা টিকে আছে বিশুদ্ধ খিস্টীয় গোষ্ঠীসমাজে ('ইউটোপিয়া', পৃঃ ১৯৩)।

তবে সম্পত্তির সাধারণ্যের আদর্শ মুর খুঁজে পান নি তাঁর সমকালীন ক্যাথলিক ঈশ্বরতত্ত্বে, পেয়েছিলেন আদি খিস্টধর্মের ধ্যানধারণায়। সম্পত্তির সাধারণ্য সম্পর্কে খিস্টের যে ধারণা, 'ইউটোপিয়া'য় তা প্রচার করে মুর তাঁর সময়কার সরকারি চার্চের মতবাদের বিরুদ্ধেই যান। আদি খিস্টীয় আদর্শ থেকে মুরের কমিউনিজমের তফাৎ হল তার শ্রমমূলক চরিত্র এবং তা আচরিত কেবল ধর্মবিশ্বাসীদের গোষ্ঠীতে নয়, গোটা সমাজে। 'খিস্টীয় কমিউনিজম' ছিল পরিভোগী ও নিঃস্বদের কমিউনিজম; মুর তার বিপরীতে খাড়া করেন সামাজিক মালিকানার ভিত্তিতে উৎপাদন।

প্লেটো ও আদি খিস্টধর্মের সুস্পষ্ট প্রভাব সত্ত্বেও মুরের বইটি মাত্র একটি সাহিত্যিক সংহিতা নয়, সাহিত্যিক উৎস হাতড়ে তা রচিত হয় নি। এটি হল মুরের সমকালীন সমাজের তন্ন তন্ন বিচারের ফলশ্রুতি, এ সমাজে উদ্ভূত সমস্যা ও দ্বন্দ্বের জবাব। ষোলো শতক ছিল পুঁজিবাদ উদ্ভবের যুগ। সেসময়ই, পুঁজিবাদী বিরোধ যখন প্রথম দেখা দিয়েছে এবং নির্মম শোষণ ও পীড়নে নিক্ষিপ্ত বহুসংখ্যক প্রাক্-প্রলেতারিয়েতের জন্ম দিয়ে আত্ম-প্রকাশ করছে প্রচণ্ড তীব্রতায়, ঠিক তখনই মুর শুধু সামন্ততন্ত্রের নয়, পুঁজিবাদী ব্যবস্থারও স্থায়িত্ব বিদীর্ণ করে শ্রেণীহীন সমাজের ছবি এঁকেছেন, যেখানে ন্যায় বিরাজমান। তাঁর বইটি তৎকালীন বিরোধের সমাধান দানের উদ্দেশ্যে রচিত। এইটেই হল প্লেটো থেকে মুরের একটা পার্থক্য। অনেক গবেষক যা বলেছেন, 'রাষ্ট্র' জন্মেছে আদর্শ পূর্ণোন্নতির

সন্ধান থেকে, তার ব্যাপারটা বিমূর্ত, বিশ্বজনীন, নিপীড়িতদের জন্য দরদের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই। পক্ষান্তরে, মুরের কমিউনিস্ট ব্যবস্থা দেখা দিয়েছে সামাজিক অন্যায়ের সমালোচনা থেকে, তা দূরীকরণের উপায় হিশেবে। মুর শুধু আধুনিক কালের প্রথম ইউটোপিস্টই ছিলেন না, সামাজিক অন্যায়ে সজাগ, মেহনতিদের দুর্ভাগ্য লাঘবে সচেষ্ট গণতান্ত্রিক ইউটোপিয়াপন্থার ঐতিহ্যও সূচিত করেছেন তিনি। ১৬২২ সালের 'নতুন আটলাণ্টিস'এর লেখক ফ্র্যান্সিস বেকন ছিলেন এ ঐতিহ্য থেকে একেবারে মুক্ত। বিজ্ঞান ও অগ্রগতির বিশ্বাস তাতে ব্যাপ্ত। কিন্তু তা চমৎকার এগিয়ে নিয়ে গেছেন ট. কাম্পানেলা তাঁর 'সূর্যের নগর' গ্রন্থে (১৬২৩), যাঁর ধ্বজা বহন করেছেন উনিশ শতকের মহান ইউটোপীয় সমাজতন্ত্রীরা।

সামাজিক বিরোধের সমাধান হিশেবে সম্পত্তির সাধারণ্যের কথাটা মুরের মনে এসেছে শুধু তদ্‌বিষয়ক সাহিত্য থেকেই নয়। সেটা তিনি বাস্তব জীবনেও দেখতে পেয়েছিলেন। ষোলো শতকের গোড়ায় ইংলণ্ডে তখনো পুরনো গোষ্ঠীগত কৃষি টিকে ছিল। কৃষকদের যৌথ ঐতিহ্যের অবসান ঘটায় 'বেড়া তোলা'।

'ইউটোপিয়া'য় দুটি প্রসঙ্গগুচ্ছের প্রাধান্য, সেই অনুসারে তা দু'ভাগে বিভক্ত। একটিতে আছে হিটলোডেই-রূপী মুর কর্তৃক তদানীন্তন ইংলণ্ডীয় সমাজ, সাধারণত তাকে ইউরোপীয়, এমনকি ফরাসি সমাজ বলে তার সমালোচনা, অন্যটায় ইউটোপিয়া দ্বীপে রাষ্ট্রব্যবস্থার ছবি।

মুরের সন্দেহ নেই যে ইংরেজ সমাজকে ন্যায়পরায়ণ বলা অনুচিত, কেননা তা অপব্যয় করে 'অভিজাত' এবং তাদের দাক্ষিণ্যভোগীদের জন্য, কিন্তু 'চাষি, কয়লাশ্রমিক, দিনমজুর, ছ্যাকরা গাড়ির গাড়োয়ান আর শ্রমিক, যাদের ছাড়া আদৌ কোনো সমাজই থাকত না, তাদের জন্য সামান্যতম যত্নও নেয় না' ('ইউটোপিয়া', পৃঃ ২১৩)। এইভাবেই তিনি চিহ্নিত করেছেন উৎপাদক ও ফলাধিকারী শ্রেণীর মধ্যে বৈরবিরোধ। মুরের কাছে তাঁর সমকালীন সমাজের প্রচণ্ড অভিশাপ হল অভিজাত, যাজক সম্প্রদায়, ভৃত্যবাহিনী, ভাড়াটে সৈন্যদের পরগাছাবৃত্তি, এবং সমাজের উচ্চশ্রেণীগুলির অদম্য বিলাস বাসনা। 'বিপুল সংখ্যক অভিজাত,' — লিখেছেন মুর, — 'অলস জীবন যাপন করে পুরুষ মৌমাছির মতো, অন্যের, বিশেষ করে নিজেদের মহালের খাজনাদাতাদের মেহনতের ওপর দিন কাটায়, আর তাদের ছাঁটে একেবারে কাঁচা মাংস পর্যন্ত' ('ইউটোপিয়া', পৃঃ ৫৩)। পরজীবিতা আর কৃষক শোষণের ব্যাপারে মুর সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার

আপোসহীন সমালোচক। কিন্তু পুঁজিবাদী শোষণ যে 'বেড়া তোলার' বিকট রূপ নিয়েছে, তার প্রতিও তিনি কম কঠোর নন। মেষ পালন ও তার লোম বিক্রির জন্য জোর করে জমি থেকে উৎখাত যে চাষিরা স্বল্পবিকশিত শিল্পের পরিস্থিতিতে তাদের শ্রমশক্তি বেচার বাজার পাচ্ছিল না, তারা প্রাক্‌প্রলেতারীয় বাহিনী গড়ে তুলেছিল। ভবঘুরেমি, নিঃস্বতা আর দুষ্কর্মে নিক্ষিপ্ত এই লোকগুলি ছিল দেশের সামাজিক অকল্যাণের প্রকট সাক্ষ্য। সামাজিক প্রশ্ন সম্পর্কে মুরের সজাগতা এবং বর্ধমান পুঁজিবাদ সম্পর্কে তাঁর বিরূপতাটা অনেকখানি এসেছে 'বেড়া তোলার' প্রতিক্রিয়া থেকে। 'ইউটোপিয়া'য় মুর এই ব্যাপারটায় বিশেষ মনোযোগ দিয়েছেন, 'মেষ খাচ্ছে মানুষকে' — এই নিয়ে তাঁর তিক্ততা ও বিদ্রূপ আদি পুঁজিবাদী সঞ্চয়ের বর্বর পদ্ধতির শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক সাক্ষ্য হয়ে আছে। কার্ল মার্কস যে তাঁর 'পুঁজি' গ্রন্থের প্রথম খন্ডের ২৪ অধ্যায়ে 'ইউটোপিয়া'র শরণ নিয়েছেন, সেটা অকারণে নয়।

সামন্ততান্ত্রিক ও আদি পুঁজিবাদী সমাজের সমালোচনায় মুরের একটা কেন্দ্রীয় বিষয় হল অপরাধ সমস্যা। অপরাধকে তিনি দেখেন ন্যায়হীন সমাজের প্রকৃতিগত একটা সামাজিক ব্যাপার হিশেবে। পরজীবিতা, বিলাস, 'বেড়া তোলা', বেকারি সঙ্গত কারণেই অপরাধের জন্ম দেয়। শাস্তির কোনো কঠোরতাই তা থামাতে পারে না, তাই তা অর্থহীন। মুরের মতে, ইউরোপীয় সমাজ নিজেই তার শত্রু সৃষ্টি করেছে তাদের ফাঁসি যাবার দৃশ্য উপভোগ করার জন্য। অপরাধপ্রবণতার সমাধান তিনি দেখেছেন সামাজিক বৈষম্যের বিলোপে, মেহনতিদের জন্য যত্নে, তাদের জমির প্লটগুলি রক্ষায়, ভূমিহীনদের জন্য কর্মসংস্থান ইত্যাদিতে। তাঁর কালের পক্ষে অভিনব এই ধারণা তিনি উপস্থিত করেন যে শাস্তির লক্ষ্য হওয়া উচিত ভয় পাওয়ানো নয়, মানুষকে শোধরানো, শাস্তিকে হতে হবে অপরাধের সমানুপাতিক। মৃত্যুদণ্ডের বিরোধিতা করেন মুর, তার বদলে বাধ্যতামূলক খাটুনির প্রস্তাব দেন।

সামাজিক অন্যায্যতার সমালোচনা মুর রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও প্রসারিত করেন। সামন্ততান্ত্রিক শাসকদের রাজনীতির ওপর তিনি খড়্গহস্ত: প্রজাদের মঙ্গলের চেয়ে রাজা বেশি চিন্তা করে যুদ্ধ আর নিজের ভূখণ্ড বৃদ্ধি নিয়ে। মুরের মতে, রাজা এবং রাষ্ট্রের সত্যকার কাজ যুদ্ধ নয়, সামাজিক কল্যাণ সাধন। সুবিধাভোগী স্তরের স্বার্থ, ধন, ব্যক্তিগত মালিকানা রক্ষার সঙ্গে তাঁর সমকালীন রাষ্ট্রের যোগাযোগের কথা বলেন তিনি। 'বর্তমানের সমস্ত সমৃদ্ধিশীল রাষ্ট্রগুলি সম্পর্কে বার বার মন দিয়ে চিন্তা করার পর দিব্যি

দিয়ে বলতে পারি যে সেগুলি ধনীদের একধরনের চক্রান্ত ছাড়া আর কিছুই নয়, যারা লড়ছে ... নিজেদের ব্যক্তিগত লাভের জন্য,' — বলেন 'ইউটোপিয়া'র নায়ক ('ইউটোপিয়া,' পৃঃ ২১৪)।

সামাজিক অন্যায়ের মূল মুর মনে করেন ব্যক্তিগত মালিকানা। সেই কারণেই তাকে পুরোপুরি ও দৃঢ়ভাবে নাকচ করতে হবে।

হিটলোডেই বলছেন, 'আমি এ বিষয়ে দৃঢ় প্রত্যয়ী যে সঙ্গতির সমান ও ন্যায়সঙ্গত বণ্টন এবং লৌকিক ব্যাপারে মঙ্গল সম্ভব কেবল সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তিগত মালিকানা উচ্ছেদ করে; কিন্তু তা যদি থাকে, তাহলে মানবসমাজের সর্ববৃহৎ ও শ্রেষ্ঠ অংশের ওপর সর্বদাই থাকবে তিক্ত ও অপরিহার্য শোকের বোঝা। আমি অবিশ্যি মেনে নিতে রাজি আছি যে কিছু পরিমাণে তা হালকা করা যায়, কিন্তু জোর দিয়ে বলছি, সে বোঝা দূর করা যাবে না মোটেই' ('ইউটোপিয়া', পৃঃ ৯২)।

এই থিসিস থেকে চলে আসা হয়েছে ইউটোপিয়াবাসীদের আদর্শ সামাজিক ও রাষ্ট্রিক ব্যবস্থার বিবরণে।

'ইউটোপিয়া' দ্বীপে ব্যক্তিগত মালিকানা নেই, মুদ্রা সঞ্চালন নেই, পরিপূর্ণ সমতা সেখানে বিরাজমান। সমাজের ভিত্তি হল শ্রমজীবী পারিবারিক যৌথ। শ্রম সবার পক্ষে বাধ্যতামূলক। কৃষিকাজে সমস্ত নাগরিক যোগ দেয় পালা করে। এজন্য শহর থেকে লোকে গ্রামে উঠে আসে দুই বছরের জন্য (এই রকম মৌলিক ধরনে মুর শহর ও গ্রামের মধ্যে বিরোধ নিরসনের চেষ্টা করেছেন), এবং তাছাড়াও কোনো একটা কারুকর্ম আয়ত্ত করে। প্রতিটি পরিবারের বাড়ি আছে শহরে। মালিকী মনোবৃত্তি যাতে না গজায়, তার জন্য পরিবারগুলি নিয়মিত বাড়ি বদল করে। নাগরিকদের একত্র ভোজনেও যৌথবাদ প্রণোদিত হয়।

মুর বোঝেন যে সামঞ্জস্যপূর্ণ সমাজ সম্ভব কেবল পরিপূর্ণ সচ্ছলতা থাকলে। সচ্ছলতার ব্যবস্থা তিনি করতে চেয়েছেন তাঁর সময়কার অর্থনৈতিক ভিত্তিতে, অর্থাৎ কৃষি ও হস্তশিল্প মারফত। তাঁর প্রাচুর্য সৃষ্টির উপায় ঐতিহাসিক দিক দিয়ে সীমিত। বড়ো রকমের টেকনিকাল অগ্রগতির কথা না ভাবায় মুর তাঁর সময়কার যা সংস্থান, তার আশ্রয় নিয়েছেন এবং মূলত তা পরিণত হয়েছে ইউরোপে তাঁর দেখা দোষগুলির, যথা পরজীবিতা, বিলাস ও অপব্যয়ের উৎসাদনে। এই দোষগুলির বিপরীতে মুর হাজির করেছেন কর্মকর্তা এবং বিজ্ঞান চর্চার জন্য বিশেষভাবে মুক্ত কিছু গুণী লোক ছাড়া উৎপাদনী শ্রমে সমস্ত নাগরিকের যোগদান, 'বাজে এবং ফালতু

কাজের' অবিদ্যমানতা এবং মিতব্যয়। মুর মনে করেছিলেন, এই সমস্ত উপায় কেবল সচ্ছলতা সৃষ্টির পক্ষেই যথেষ্ট তাই নয়, শ্রমও এতে হবে কম হাড়ভাঙা, বিজ্ঞান ও শিল্পকলা চর্চার সময় থাকবে।

টেকনিকাল ভিত্তির পশ্চাৎপদতার দরুন ইউটোপিয়াবাসীদের সাধারণ মানবিক আদর্শ শেষ পর্যন্ত আপোসে যেতে বাধ্য হয়, অপ্রীতিকর কাজ-গুলোর জন্য দাসপ্রথার আশ্রয় নিতে হয় মুরকে। ইউটোপিয়া দ্বীপে দাসের সংখ্যা কম, তারা হল যুদ্ধবন্দী, কলংকজনক কাজের জন্য অভিযুক্ত ইউটোপিয়াবাসীও, এবং অন্য দেশে অপরাধের জন্য মৃত্যুদণ্ডিত লোক। কেবল এক শতক পরেই মাত্র 'সূর্যের নগর' গ্রন্থে ট. কাম্পানেলা পুরোপুরি বর্জন করেন দাসপ্রথা, যা কমিউনিস্ট আদর্শের বিরোধী।

ইউটোপিয়ার রাজনৈতিক ব্যবস্থা গণতান্ত্রিকতার নীতিতে চালিত এবং প্রতিটি পদাধিকারী সেখানে নির্বাচিত: ৩০ পরিবার প্রতি নির্বাচিত হয় এক-একজন ফিলার্খ, জনগণ প্রস্তাবিত চার প্রার্থীর ভেতর থেকে ফিলার্খরা একজনকে নির্বাচিত করে রাজা সারা জীবনের জন্য; তবে স্বৈরশাসনের দিকে ঝুঁকছেন এমন সন্দেহ হলে তাঁকে অপসারিত করা যাবে। বৃদ্ধ ও অভিজ্ঞ নাগরিকদের নিয়ে সিনেট এবং অন্যান্য পদাধিকারীদের নির্বাচন হয় প্রতি বছর। সিনেট বা লোকসভাকে বাদ দিয়ে কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারের ফয়সালা হয় না। প্রতিটি জরুরি প্রশ্নে ফিলার্খরা পরামর্শ করে পরিবারকর্তাদের সঙ্গে। এইভাবে প্রতিনিধিত্বমূলক ব্যবস্থা মিলেছে সরাসরি গণতন্ত্রের উপাদানের সঙ্গে।

মুর সম্পর্কে রচনায়, বিশেষ করে বুর্জোয়া সাহিত্যে এমন একটা মত বেশ প্রচলিত যে, ইউটোপিয়াবাসীদের রাজনৈতিক ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক ছিল না। যেমন, জ. হের্ট্সলার মনে করেন যে সমস্ত রাজনৈতিক ক্ষমতা এক ব্যক্তির হাতে অর্পণই হল 'ইউটোপিয়া'র প্রধান নীতি: 'মুর তাঁর সমুন্নত সমাজব্যবস্থায় একতন্ত্রীর ধারণা এনেছেন। তাঁর আদর্শ ছিল ট্যুডর বংশের একচ্ছত্র রাজারা, তিনি তাঁর ব্যবস্থার শীর্ষে দেখতে চেয়েছিলেন প্রবলপ্রতাপ শাসককে।'*

বাস্তব সামাজিক ঘটনাবলি বিশ্লেষণ করে, যেমন, অসমাপ্ত 'তৃতীয় রিচার্ডের ইতিহাস' গ্রন্থে মুর সামন্ততান্ত্রিক ঝগড়াঝাঁটি বন্ধ করার উপায় হিশেবে সত্যিই দৃঢ় রাজশাসনের পক্ষ নেন, কিন্তু সেক্ষেত্রেও তিনি নির্দ্বিধায়

স্বৈরশাসনের বিরোধিতা করেছেন। তবে আদর্শ রাজনৈতিক ব্যবস্থার বর্ণনায় তিনি তাঁর যুগের পরিস্থিতির ঊর্ধ্বে উঠেছিলেন। নির্বাচনাধীন এবং মূলত নামেমাত্র রাষ্ট্রপ্রধানকে রেওয়াজ অনুযায়ী রাজা নাম দিলেও মুর ইউটোপিয়াবাসীদের সমগ্র জীবন নির্ধারক গণতান্ত্রিক নীতির দিক থেকে তেমন কিছু দোষ করেন নি। ইউটোপিয়ার লোকসভা, সিনেট, ফিলার্খদের পরামর্শদাতা পরিবারকর্তাদের ভূমিকা থেকে দেখা যায় যে ইউটোপিয়াবাসীরা শুধু রাজনৈতিক ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করত তাই নয়, তাতে বাস্তব অংশও নিত। ইয়ে. ভ. টার্লে যা বলেছেন, 'কর্তৃত্বমূলক নীতি 'ইউটোপিয়া'য় প্রায় নেই: রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তা ও শাসকেরা পালন করে দেওয়ান, বাজারসরকার, গোটা গোষ্ঠীর অ্যাটর্নির ভূমিকা, তার বেশি নয়'*।

রাষ্ট্রের প্রধান কাজ হল উৎপাদন ও বণ্টনের ব্যবস্থা করা। সেইসঙ্গে অপরাধের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও বৈদেশিক নীতিও সে দেখবে, যার মুখ্য উদ্দেশ্য হল ইউটোপিয়াবাসীদের জন্য শান্তির পরিস্থিতি নিশ্চিত করা। তবে ন্যায় রক্ষার জন্য অস্ত্র হাতে নিজেদের বন্ধুদের সাহায্যে আসতে তাতে বাধা হয় না। ইউটোপিয়াবাসীদের বৈদেশিক ক্রিয়াকলাপের পার্থক্যসূচক একটা দিক হল অন্যান্য দেশের নিপীড়িতদের সঙ্গে একাত্মতা। যেসব দেশের সঙ্গে তাদের বাণিজ্য চলে, রপ্তানির এক সপ্তমাংশ তারা দান করে সেখানকার নিঃস্বদের জন্য।

ইউটোপিয়াবাসীদের জীবনযাত্রার একটা বৈশিষ্ট্য হল সাধারণ কল্যাণের যা পরিপন্থী নয়, তেমন সমস্ত ব্যক্তিগত বিশ্বাস, রুচি, ঝোঁক সম্পর্কে সহনশীলতা, সামাজিক দায়িত্ব পালনের সঙ্গে যা সংশ্লিষ্ট নয়, তেমন সমস্ত ক্ষেত্রে কঠোর নিয়ামনের অনস্তিত্ব। যৌথ ভোজনের রেওয়াজ, বংশানুক্রমিক পেশা ইত্যাদি সেখানে প্রচলিত। কিন্তু ইচ্ছে করলে বাড়িতে খাওয়া, খুশিমতো পেশা নির্বাচন ইত্যাদি ব্যাপারে সবাই স্বাধীন। নিজেব মর্জিমতো অবকাশ যাপনে, মনমতো কোনো একটা বিজ্ঞান এবং শিল্পকলা চর্চায় কোনো বাধা নেই।

মুরের সমাজতন্ত্র স্বাধীনতার বিরোধী, ব্যক্তিত্বের বিকাশ তা রুদ্ধ করে, তাঁর ব্যবস্থা সমস্ত অব্যবহিতি ধ্বংস করে, বুর্জোয়া গবেষকদের এধরনের থিসিস পক্ষপাতদুষ্ট, বাস্তবের সঙ্গে তা মেলে না। আসলে

ইউটোপিয়াবাসীদের জীবন নিয়ন্ত্রিত হয় বহু ঐতিহ্য ও নিয়মে, কতকগুলি ক্ষেত্রে সংকোচন দ্বারাও, কিন্তু শেষোক্ত ক্ষেত্রে সংকোচন প্রয়োজন হয়েছে সর্বদাই উৎপাদন ও সহবসতির স্বার্থে। যেমন, পর্যটনে বেরুতে হলে অনুমতি দরকার, এটাকে 'ইউটোপিয়া'র কোনো কোনো সমালোচক তার কর্তৃত্বমূলক চরিত্রের সমর্থন, ব্যক্তিস্বাধীনতার ওপর আক্রমণ বলে দেখেছেন। আসলে এ দাবিটা আসছে সমাজের প্রয়োজন থেকে, যেখানে তার প্রতিটি সভ্যই নির্দিষ্ট কিছু শ্রম করতে বাধ্য। বিচারবুদ্ধির ওপর প্রতিষ্ঠিত ইউটোপিয়াবাসীদের জীবনধারাকে চূড়ান্ত ব্যক্তিস্বাধীনতার নামে বলি দেবার মোটেই পক্ষপাতী ছিলেন না মুর। কিন্তু সেইসঙ্গে উৎপাদন ও সংগঠনের স্বার্থ তাঁর ক্ষেত্রে ব্যক্তিত্বের স্বাধীন ও অবাধ বিকাশের পক্ষে কোনো বাধা হয়ে ওঠে নি।

যে বুর্জোয়া ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ তখন পথ করে নিচ্ছিল, যৌথতার ঐতিহ্য অবলম্বন করে তিনি তার বিপরীতে উপস্থিত করেন ব্যক্তিগত ও সামাজিক স্বার্থের সামঞ্জস্যের ধারণা। ইয়ে. ভ. টার্লে লিখেছেন, সংঘর্ষ দেখা দিলে রাষ্ট্র নাকি ব্যক্তি — কার স্বার্থ বিসর্জন দিতে হবে, এ প্রশ্নে 'কিছু বলার আবশ্যকতা টমাস মুর সযত্নে পরিহার করেছেন'; মুর তাঁর বক্তব্য এমনভাবে রেখেছেন যাতে 'রাষ্ট্র ও ব্যক্তির মধ্যে সংঘাত তাঁর কাছে অচিন্তনীয়'*। মুরকে যাঁরা কর্তৃত্বপরায়ণতা ও ব্যক্তিস্বাধীনতা সংকোচনের দায়ে অভিযুক্ত করেন, এইটে তাঁরা লক্ষ করেন না। ব্যক্তিসত্তা বা সমাজ, কাউকেই মুর নস্যাৎ করেন নি। জীবনযাপনের এমন নীতি তিনি খুঁজেছেন যাতে এ দু'য়ের মধ্যে বিরোধ অন্তর্ধান করে। তত্ত্বের দিক থেকে এটাই একমাত্র সঠিক ও পাকাপোক্ত সমাধান।

ইউটোপিয়ার রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সাধারণ মানবিকতা ও সহনশীলতা সবচেয়ে বেশি প্রকটিত ধর্মের ক্ষেত্রে।

ইতালি ও ফ্রান্সের মানববাদীরা উপনীত হয়েছিলেন নিরীশ্বরবাদে। উত্তর ইউরোপের অন্যান্য মানববাদীর মতো মুরও সেদিকে যান নি। তিনি ছিলেন ক্যাথলিক, কিন্তু ক্যাথলিক-সংস্কারক, ধর্মবিশ্বাসকে যিনি সমুন্নত ও পরিষ্কৃত করতে সচেষ্ট। 'ইউটোপিয়া'তেও পাওয়া যায় সংস্কার আন্দোলনের ধ্বনি, যেখানে বলা হয়েছে, 'ধর্মপ্রচারকেরা ধূর্ত লোক... খ্রিস্টীয় নিয়মের সঙ্গে নিজেদের রীতিনীতি খাপ খাওয়ানো লোকেদের

পক্ষে কঠিন, এই দেখে তাঁরা খ্রিস্টের মতবাদকে খাপ খাইয়ে নিয়েছেন রীতিনীতির সঙ্গে' ('ইউটোপিয়া,' পৃঃ ৮৮-৮৯)। পরিপূর্ণ ও বাধ্যতামূলক সাধারণ স্বত্ব বিষয়ে মুরের বক্তব্য গির্জার পাদ্রীদের মতবাদের বিরোধী, তাঁরা মর্ত্যবাসীদের জন্য ব্যক্তিগত মালিকানার পক্ষপাতী।

ইউটোপিয়াবাসীদের ধর্মীয় বিশ্বাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কে বক্তব্যেরও সংস্কারবাদী চরিত্র কম নয়। ইউটোপিয়া দ্বীপে বহু ধর্মবিশ্বাস প্রচলিত, নাগরিকরা যেকোনো ধর্মগ্রহণে স্বাধীন। সেই সঙ্গে সমস্ত ধর্ম যে মূলত একই, 'ঐশ্বরিক প্রকৃতির প্রতি ভক্তিতে' তারা যে সদৃশ, এ ভাবনা ইউটোপিয়াবাসীদের কাছে বিকট কিছু নয়। চারপাশের সমস্ত ধর্মই সমান শ্রদ্ধেয়। ধর্মবিশ্বাসে আঘাত দেয়ায় অনুমোদন নেই ইউটোপিয়াবাসীদের। এক-একটা সম্প্রদায়ের বিশেষ ধর্মাচরণ অনুষ্ঠিত হয় নিজেদের গৃহে। ইউটোপিয়াবাসীরা যে একটা জিনিসের বিরোধী, সেটা হল আত্মার অমরতা ও বিধাতায় পরিপূর্ণ অবিশ্বাস। এধরনের যাদের চিন্তা, অর্থাৎ নিরীশ্বরবাদী, ইউটোপিয়াবাসীরা তাদের শ্রদ্ধা করে না এবং কোনো পদে নির্বাচিত করে না তাদের, কারণ নিজেদের রিপুর তাড়নায় আইন লঙ্ঘনে তারা সক্ষম বলে তারা মনে করে। জনগণের সমক্ষে নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গির প্রচার এসব লোকেদের পক্ষে নিষিদ্ধ, কিন্তু সে দৃষ্টিভঙ্গি তাদের লুকিয়ে রাখতে হবে না, সাধুসন্ত ও গুরুত্বমনা লোকেদের সঙ্গে তা নিয়ে আলোচনা করার অধিকার আছে তাদের। এরূপ বিতর্কে বরং উৎসাহই দেয়া হয়। (মুরের অবস্থানের সঙ্গে প্লেটোর 'রাষ্ট্র'এ অবিশ্বাসীদের প্রতি মনোভাবের তুলনাটা কৌতূহলজনক। প্লেটো তাদের কারাদণ্ড দিতে চান পাঁচ বছর পর্যন্ত, আর ঈশ্বরনিন্দার ক্ষেত্রে মৃত্যুদণ্ড)।

ধর্ম সম্পর্কে মুরের দৃষ্টিভঙ্গিতে গুরুত্বপূর্ণ কতকগুলি সংস্কারক প্রবণতা বর্তমান থাকলেও ফের বলি, তাঁর 'ইউটোপিয়া' প্রকাশের দু'বছর পরে জার্মানিতে যে সংস্কার আন্দোলন শুরু হয়েছিল, তিনি ছিলেন নীতিগতভাবে তার বিরোধী। অধিকাংশ মানববাদীর মতো মুরও সংস্কার বিরোধী ছিলেন সর্বাগ্রে ন্যায় প্রতিষ্ঠার পদ্ধতির দিক থেকে। সংস্কারের গণ বৈপ্লবিক যে পন্থা পরিণত হয় কৃষক সমরে, তা প্রত্যাখ্যান করেন মুর। এর বিপরীতে তিনি উপস্থিত করেন নিছক জ্ঞানমার্গীয় পদ্ধতি, যা সেই সময় থেকে হয়ে দাঁড়িয়েছে ইউটোপীয় সমাজতন্ত্রের ঐতিহ্য। মুরের পথ হল শাসক ও জনগণকে শিক্ষাদান, শ্রেণী সংগ্রামের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই। পণ্ডিতেরা, দার্শনিকেরা ন্যায়পরায়ণ রাষ্ট্রব্যবস্থার পরিকল্পনা

রচনা করেন, তাকে কার্যে পরিণত করেন আলোকপ্রাপ্ত নৃপতি, যিনি নিজের কথা নয়, প্রজাদের কথা ভাবেন। ইউটোপিয়া দ্বীপে রাজা ইউটোপ এইভাবেই সুসম্পূর্ণ আইন জারি করেছিলেন। মুর সহানুভূতির সঙ্গে প্লেটোর এই ভাবনার পুনরুক্তি করেছেন যে 'রাষ্ট্রের শ্রীবৃদ্ধি হবে শুধু তখন যখন দার্শনিকেরা হবে রাজা, অথবা রাজারা — দার্শনিক' ('ইউটোপিয়া,' পৃঃ ৭৫)। এই নীতি অনুসারে ইউটোপিয়াবাসীরা নির্বাচন করে বিজ্ঞানীদের মধ্য থেকে উচ্চপদাধিকারীদের, যাজকদের এবং খোদ রাষ্ট্রপ্রধানকেই।

জনগণের কার্যকলাপে অবিশ্বাস এবং আলোকপ্রাপ্ত নৃপতির ওপর ভরসা রাখায় ইউটোপীয় সমাজতন্ত্রী মুর সংঘাতে আসেন সংস্কারের চৌহদ্দির মধ্যে বৈপ্লবিক গণ আন্দোলনের সঙ্গে, ইউরোপীয় সমাজের বিকাশে বৃহৎ একটা ভূমিকা পালন ছিল যার নির্বন্ধ (মুর সেটা বুঝতে পারেন নি)। টমাস মুরের এই সীমাবদ্ধতার মধ্যেও লক্ষিত হয় ক্ল্যাসিকাল ইউটোপীয় সমাজতন্ত্রের নিয়মবদ্ধতা: তার ছিল প্রগাঢ় জ্ঞানপ্রচারণী চরিত্র, তা বিকশিত হয় বৈপ্লবিক আন্দোলন থেকে আলাদাভাবে, তার প্রতি অবিশ্বাস রেখে।

সামাজিক রূপান্তরের ক্ষেত্রে জন আন্দোলনের বৈপ্লবিক সম্ভাবনা না মানলেও সমাজতন্ত্রের ধারণার ক্ষেত্রে কিন্তু মুর অনেক এগিয়ে ছিলেন তাঁর সমকালীন নিরীশ্বরবাদী ও প্রটেস্টাণ্ট আন্দোলন থেকে, যা প্রায়ই ছিল স্বর্ণযুগে প্রত্যাবর্তনের কৃষক স্বপ্নে আচ্ছন্ন। জনগণের এই ধরনের ইউটোপীয় ধারণাগুলির জন্ম মধ্যযুগীয়তা থেকে, তা ডাকত পেছনে ফিরতে, প্রগতির, নতুন সংস্কৃতির বিরোধিতা করত, জয়গান করত কৃচ্ছ্রসাধনার, চূড়ান্ত অসহিষ্ণুতা, রক্ষণশীলতা, সংকীর্ণ বিশ্ববীক্ষা ছিল তার বৈশিষ্ট্য। মুর তার বিপরীতে হাজির করলেন বিচারবুদ্ধি ও ভবিষ্যৎ-মুখিতার ওপর প্রতিষ্ঠিত সমাজতন্ত্রের ঐহিক ধারণা, যা আনন্দ ও সঞ্জীবনী শক্তিতে পরিপূর্ণ। মধ্যযুগীয় বিষাদ ও কৃচ্ছ্রসাধনার স্থলে তিনি আনলেন এপিকিউরাসের প্রেরণায় বিচক্ষণ উপভোগের জীবনবাদী দর্শন।

মুর ছিলেন সঙ্গতিপরায়ণ সামন্ততন্ত্রবিরোধী অবস্থানে। সামন্ততান্ত্রিক শোষণ ও পরজীবিতার সমালোচনা করে অবজেকটিভ ক্ষেত্রে তিনি প্রকাশ করেছিলেন দ্রুত শক্তিসঞ্চয়ী বণিক সম্প্রদায়ের স্বার্থ। নামকরা উকিল ও রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তা হিশেবে মুর তাদের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। বণিক স্বার্থের এই অবজেকটিভ অভিব্যক্তিই ছিল সমকালীনদের কাছে 'ইউটোপিয়া'র রীতিমতো খ্যাতির কারণ। তবে এটা বৈশিষ্ট্যসূচক যে

তাঁর রচনার আসল ইউটোপীয় দিকগুলি সমকালীনদের কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঠেকে নি। কেবল ঐতিহাসিক দূরত্বেই তাদের তাৎপর্য স্পষ্ট হয়। দেখা দেয় মূল্যবোধের পুনর্বিচার। মুরের সমকালীনদের কাছে যা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছিল, সেগুলি তাদের গুরুত্ব হারিয়ে তাঁর যুগের সঙ্গে বিলীন হয়ে যায় অতীতে। যেগুলিকে মনে হয়েছিল গৌণ, নিতান্ত সাহিত্যিক অলংকরণ, সেগুলি হয়ে উঠল মুখ্য, সুদূর উত্তরপুরুষদের কাছে 'ইউটোপিয়া'র প্রধান বিষয়বস্তু।

ইউটোপিয়াবাসীদের আদর্শ সমাজব্যবস্থা নিয়েই, মুরের সমাজতন্ত্র নিয়েই দেখা দেয় তীব্র ভাবাদর্শীয় সংগ্রাম, মুরের রচনার কালোত্তীর্ণ তাৎপর্য সেইখানেই।

ইতিহাসের দিক থেকে এই দাঁড়িয়েছে যে 'ইউটোপিয়া'র সমাজতন্ত্রবিরোধী, বুর্জোয়া ব্যাখ্যায় প্রধান স্থান নিয়েছে ক্যাথলিক সাহিত্য। মর্যাদালাভ ও প্রচারের উদ্দেশ্যে মুরকে মহাত্মা ঘোষণা করলেও তাঁর সমাজতন্ত্র থেকে একটা পার্থক্য টানতেই হত ক্যাথলিক চার্চকে। আজো পর্যন্ত এ কাজটায় গুরুত্ব দেয় তারা, ক্যাথলিক ঈশ্বরতত্ত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে মুরকে নিয়ে অফুরন্ত গবেষণা তার সাক্ষ্য। এসব সাহিত্যের প্রধান থিসিস হুবহু একটাই, নানা উপায়ে তাতে দেখাবার চেষ্টা করা হয় যে কমিউনিজম মুরের আদর্শ ছিল না।

পোপের যে অনুজ্ঞায় মুরকে ক্যাথলিক সন্ত ঘোষণা করা হয়েছে, তাতে 'ইউটোপিয়া' সম্পর্কে একটি কথাও নেই। পূততম সিংহাসন এ বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ রাখেন নি যে টমাস মুরকে অনুমোদন 'ইউটোপিয়া'র ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। মুরের কমিউনিজম ছিল তাঁর সমকালীন সরকারি চার্চের মতবাদের বিরোধী, যা আদি খ্রিস্টীয় ধর্মের যৌথতার প্রবণতা বিসর্জন দিয়েছিল, আর বর্তমান ক্যাথলিক ধ্যানধারণার তো আরো বিরোধী, যা ব্যক্তিগত মালিকানার ওপর প্রতিষ্ঠিত বুর্জোয়া সমাজের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি সম্পর্কিত। এ ব্যাপারে মুরের সমস্ত ক্যাথলিক ব্যাখ্যাই এক সুরে বাঁধা। যেমন, এ. সুৎস লিখছেন যে কমিউনিজম (যা সাধুসন্ন্যাসী ও খ্রিস্টানুগামীদের জন্য নয়, 'সর্বজনীন ও বাধ্যতামূলক কমিউনিজম') এবং চার্চের মতবাদের মধ্যে বিরোধ বর্তমান, গির্জা-পিতারা ব্যক্তিগত মালিকানার পক্ষে।* নানা উপায়ে এই ধারণাটা মাথায় ঢোকাবার চেষ্টা হচ্ছে যে মুরের

প্রত্যয় মোটেই কমিউনিজম ছিল না, পূর্ণতাপ্রাপ্ত সমাজের বনিয়াদ বলে তিনি তা উপস্থিত করেন নি।

মুরের দৃষ্টিভঙ্গির এরূপ ভাষ্যের সমর্থনে একরাশ স্বকপোলকল্পিত উদ্ভাবনা হাজির করা হচ্ছে। যেমন, যুক্তি দেয়া হচ্ছে যে 'ইউটোপিয়া'য় কমিউনিজম ঘোষিত হয়েছে বইয়ের নায়ক রাফায়েল হিটলোডেইয়ের মুখ দিয়ে, মুর নিজে কিছু বলেন নি; ব্যক্তিগত মালিকানা সম্পর্কে তাঁর মনোভাব জানতে হলে 'ইউটোপিয়া' নয়, হাতড়াতে হবে তাঁর পরবর্তী রচনাগুলি। মুরের যে কমিউনিজমে বিশ্বাস ছিল না সেটা এই বলে দেখানো হচ্ছে যে তেমন আদর্শ থাকলে তিনি যখন রাজদ্বারে দাঁড়িয়েছিলেন তাঁর শত্রুরা তখন সেটা কাজে লাগাতে পারত। শেষত বলা হচ্ছে যে মুরের যে মানববাদী গোষ্ঠীটা ছিল, তাঁদের কারো কমিউনিস্ট প্রত্যয় ছিল না আর তাঁরা নাকি প্রায় সব বিষয়ে পুরোপুরি একমত।*

বৈজ্ঞানিকতার দাবি করলেও এইসব যুক্তির একটাও ধোপে টেঁকে না। 'ইউটোপিয়া'য় কমিউনিজমের ভাবনা কেন যে চাপানো হয়েছে হিটলোডেইয়ের ওপর, কেন যে ব্যক্তিগত মালিকানা সমর্থনে আরিস্টটলের যুক্তি ব্যবহার করে নিজের পক্ষ থেকে মুর সে ভাবনা নাকচ করেছেন, তা স্বতঃস্পষ্ট। এই দূরদৃষ্টির কল্যাণেই মুর সরকারি বাধানিষেধ এড়িয়ে সমকালীন ও উত্তরপুরুষদের চেতনায় কমিউনিজমের ধারণা সঞ্চার করতে পেরেছিলেন, নিজের বৈজ্ঞানিক চিন্তার পরিণাম স্বরূপ যে শাস্তি হতে পারত তা থেকে অব্যাহতি পেয়েছিলেন।

আর তাঁর পরবর্তীকালের রচনাদির কথা যদি ধরি, তাহলে মনে রাখা দরকার যে সেগুলিতে তিনি 'ইউটোপিয়া'র কমিউনিস্ট আদর্শ বিকশিত করেন নি, কারণ এখানে তাঁর ভূমিকাটা সমাজসংস্কারকের নয়। এখানে তিনি ঐতিহাসিক দিক দিয়ে সুনির্দিষ্ট একটা সম্প্রদায়ের মূর্ত-নির্দিষ্ট ও আংশিক কতকগুলি সামাজিক সমস্যার সমাধান দিয়েছেন এবং সেই প্রসঙ্গে তিনি যা বলেছেন তাকে টমাস মুরের দার্শনিক-রাজনৈতিক প্রত্যয়ের স্তরে টেনে তোলার মানেই হয় না কোনো।

মুরের বন্ধু, মানববাদীদের মতামতেও খণ্ডিত হয় না তাঁর কমিউনিস্ট সহানুভূতি। মুরের বন্ধুদের কাছেই যে কমিউনিজম বিজাতীয় ছিল এমন

নয়। যেমন, এরাজ্‌মাস ডেসিডেরিয়াস প্রথমে সাধারণ সম্পত্তির নীতি সমর্থন করেছিলেন, যদিও পরে ঝোঁকেন গির্জার চিরাচরিত মতবাদের দিকে, যাতে বলা হয় যে ব্যক্তিগত মালিকানা সাধারণ হয়ে ওঠে তার ব্যবহার মারফত, প্রতিবেশীদের জন্য যত্ন, পরোপকার ইত্যাদির দ্বারা। কিন্তু যদি মেনেও নেয়া যায় যে মুরের বন্ধুদের কমিউনিস্ট মনোবৃত্তি ছিল না, তাহলেও সেটা 'ইউটোপিয়া'র চিন্তাভাবনাকে বিচার করার পক্ষে কোনো যুক্তি নয়।

সামাজিক-রাজনৈতিক চিন্তার ইতিহাসে দেখা যায় যে কোনো একটা ভাবনা ব্যক্ত হওয়া মাত্র শুরু হয় তার নিজস্ব জীবন। কমিউনিজমের নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত পূর্ণতাপ্রাপ্ত ও ন্যায্য এক সমাজের উজ্জ্বল চিত্রণের কল্যাণে 'ইউটোপিয়া' এবং সেই সঙ্গে মুর বেঁচে থাকছেন লোকেদের চেতনায়।

ক্যাথলিক ভাষ্যকাররা মুরের কমিউনিজমের জায়গায় বসাতে চান ব্যক্তিগত সদাচারের সনাতনী যাজকপন্থী ধারণা। 'আমাদের লড়তে হবে প্রথা-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে নয়, সমস্ত অনাচারের ভিত্তিতে নিহিত আমাদের ধ্বংসাত্মক রিপুর সঙ্গে। ব্যক্তিগত পূর্ণতালাভই ছিল মুর প্রস্তাবিত সংস্কারের কর্মসূচি', লিখছেন পশ্চিমী রাজনীতিবিদ হ. ভ. ডোনার।* ভ্রাতৃস্নেহ, যৌথ প্রেরণা আর ধনলোলুপতা থেকে আত্মমুক্তির বিমূর্ত প্রচারই নাকি 'ইউটোপিয়া'র উদ্দেশ্য ও মর্মার্থ।** ক্যাথলিক লেখকেরা দাবি করেন যে 'ইউটোপিয়া'য় বর্ণিত সামাজিক-রাজনৈতিক ব্যবস্থাটা মুরের চূড়ান্ত আদর্শ নয়, অন্তত তা হতে পারে না একটা অনুকরণীয় নিদর্শন। তাঁরা সাবধান করে দেন, 'ইউটোপিয়া'র নকল করা উচিত নয়, তাকে ছাড়িয়ে যেতে হবে খ্রিস্টীয় আদর্শের ভিত্তিতে। কমিউনিস্ট আদর্শের চেয়ে খ্রিস্টীয় আদর্শের শ্রেষ্ঠতা দেখাবার চেষ্টা পর্যবসিত হয় ইউটোপিয়াবাসীদের সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার সমালোচনায়।

'ইউটোপিয়া'র সমালোচনায় ক্যাথলিক সাহিত্য চার্চের তর্ক সীমানা ছাড়িয়ে যায়। কমিউনিস্ট ও বুর্জোয়া ধ্যানধারণার মধ্যে সংগ্রামে তা যোগ দেয় সক্রিয়ভাবে এবং বলাই বাহুল্য যে তার পক্ষনির্বাচন পূর্বনির্ধারিত। ইউটোপিয়াবাসীদের আদর্শ ব্যবস্থাকে হেয় করতে গিয়ে ক্যাথলিকরা যোগ

দেয় সমাজতান্ত্রিক ভাবনার ইতিহাস নিয়ে ধর্মনিরপেক্ষ লোকায়ত বুর্জোয়া গবেষকদের সঙ্গে। কমিউনিজম মুরের আদর্শ ছিল কি না, তাতে শেষোক্তরা আগ্রহী নয়। মুরকে নিজেদের মহাত্মা ঘোষণা না করলেও ব্যক্তিগত মালিকানার প্রতি তাঁর অনুরাগ প্রমাণেও তাদের মাথাব্যথা নেই। কমিউনিজমের আদর্শের বিরুদ্ধে তাদের সংগ্রাম খোলাখুলি সাংসারিক ও রাজনৈতিক, তার চরিত্রটা খানিকটা অন্যরকম, বাস্তবতার সঙ্গে তার সম্পর্কটা বেশি। ক্যাথলিক লেখকেরা যেক্ষেত্রে জোর দিয়ে বলে যে মুরের কমিউনিস্ট আদর্শ খিস্টীয় পশ্চিমে রূপায়িত হওয়া সম্ভব নয় এবং মুর নাকি সেটা বুঝতে পেরেছিলেন, সেক্ষেত্রে মুরের লোকায়ত সমালোচকদের কাছে এমন অবস্থান প্রত্যয়জনক মনে হয় না। তারা বলে যে কমিউনিজম খারাপ এবং মুরের দ্বারস্থ হয় এইটে দেখাবার জন্য যে গোড়া থেকেই তা খারাপ, এ ছাড়া অন্য কিছু হতে পারে না। 'ইউটোপিয়া'র বিরুদ্ধে গণতন্ত্রবিরোধিতা, ব্যক্তিসত্তার স্বাধীন বিকাশের প্রতি উপেক্ষার যে অভিযোগের কথা আগে বলেছি, সেটা এই অর্থেই। 'মুর সামাজিক সাম্যের আকাঙ্ক্ষী ছিলেন না, এমনকি ব্যক্তিস্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার দাবিও করেন নি তিনি। যাকিছু তিনি চেয়েছিলেন, এবং কাণ্ডজ্ঞানী ব্যক্তি যার বেশি কিছু চাইতে পারে না, সেটা হল সমান সামাজিক সুযোগের ব্যবস্থা করে দেয়া,' — লিখেছেন রাজনৈতিক মতবাদের ইতিহাসের ইংরেজ গবেষক জ. ও. হের্ট্সলার।* মুরের সমাজতন্ত্রকে সমান সুযোগের বুর্জোয়া ধারণার সঙ্গে এক করে দেখার সঙ্গে সঙ্গে এই ঘোষণার মধ্যেই রয়েছে গণতন্ত্রবিরোধিতা, অসাম্য, অর্থাৎ মুরের আদর্শের আকর্ষণহানির যেসব দোষত্রুটি আমাদের পূর্ব-পরিচিত তার মূল। ইউটোপীয় ভাবনার ইতিহাসের গবেষিকা ম. ল. বার্ণারি প্লেটোর 'রাষ্ট্র' এবং মুরের 'ইউটোপিয়া'য় যে দাসপ্রথার অস্তিত্ব আছে, তা স্মরণ করিয়ে দিয়ে একথা ঘোষণা করা প্রয়োজন মনে করেছেন যে, 'এই যে-দিকগুলোয় 'ইউটোপিয়া'র সমর্থকেরা প্রায়ই মনোযোগ দেন না, তা হল কর্তৃত্বাশ্রয়ী ধারণার ফল, ইউটোপিয়ার অনেক কিছুই যার ভিত্তি'**। তিনি লিখেছেন যে কর্তৃত্বমূলক ইউটোপিয়া থেকেই দেখা দেয় যাজক, ক্যাপটেন, স্বৈরশাসক, যে নামই তাদের দেয়া হোক না কেন, পুরনো অর্থনৈতিক দাসপ্রথার বদলে

তারা আনে নতুন দাসপ্রথা: নিজের মালিক বা ইজারাদারের দাস হওয়ার বদলে লোক হয়েছে জাতির ও রাষ্ট্রের দাস। এরকম রাষ্ট্রে ব্যক্তিগত মালিকানা অন্তর্ধান করে, কেননা তাতে বিপন্ন হয় রাষ্ট্রের ঐক্য, আর লোকে হারায় তাদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের অনুভূতি, আবেগ, কেননা তাদের প্রত্যেকটি পদক্ষেপ নিয়ন্ত্রিত, ইত্যাদি। প্লেটোর 'রাষ্ট্র'এর তুলনায় 'ইউটোপিয়া'র অপেক্ষাকৃত গণতান্ত্রিকতার উল্লেখ করেও বার্ণারি ইউটোপিয়াবাসীদের ব্যবস্থাকে হেয় করতে চেয়েছেন এই বলে যে তা গঠিত কেবল প্রশাসনিক ক্ষমতার ওপর, বিধান প্রণয়নের ওপর নয়, কেননা সমস্ত আইনই তাদের দিয়ে রেখেছে রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠাতা, অথবা আইনগুলি সমাজের সমস্ত অংশের পক্ষে একই প্রকার, ব্যক্তিগত ব্যাপারগুলি তা গণ্য করে না। 'ইউটোপিয়া'র এইধরনের আনুষ্ঠানিক-ব্যবহারশাস্ত্রীয় মূল্যায়নে প্রকাশ পায় কেবল যে-করেই হোক মুরের ইউটোপীয় কমিউনিজমে খুঁত ধরার বাসনা। 'ইউটোপিয়া' সম্পর্কে এরূপ মনোভাব সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে, সাচ্চা গণতন্ত্র ও প্রগতির বিরুদ্ধে আধুনিক বুর্জোয়া মতাদর্শীদের সংগ্রামের সঙ্গে জড়িত। ম. ল. বার্ণারির বইয়ের ভূমিকায় পশ্চিমী রাজনীতিবিদ জ. উডকক বলেছেন: 'মার্কসবাদীরা সর্বদা দাবি করেছে যে তারা ইউটোপীয় সমাজতন্ত্রীদের বিপরীতে 'বৈজ্ঞানিক' সমাজতন্ত্রী, তাহলেও কার্যক্ষেত্রে তাদের সামাজিক পরীক্ষায় তারা ক্ল্যাসিক ইউটোপিয়ার সাধারণ কঠোর গঠনটাই শুধু নয়, অনেক আংশিক জিনিসও গ্রহণ করেছে।'* সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রতি নিজের বিরূপতা উডকক খোলাখুলি চাপিয়েছেন ইউটোপিয়ার ক্ষেত্রে। ইউটোপিয়াকে একটা নিরীহ স্বপ্নচারণ বলে ভাবতে তিনি অক্ষম, সত্যসত্যই তা জীবন প্রভাবিত করছে, এটা স্বীকার করে তিনি তার রূপায়ণে ভীত। সমাজতন্ত্র সত্যিই বাস্তব হতে পারে, এই ভয় থেকে ন. বের্দিয়ায়েভ লিখেছিলেন: 'আমরা আগে যা ভাবতাম, ইউটোপিয়াগুলি দেখা গেল তার চেয়ে বেশি সাধনযোগ্য। এখন আমাদের সামনে একেবারে নতুন দিক থেকে কষ্টকর সমস্যাটা হল এই: কী করে তার বাস্তব রূপায়ণ পরিহার করতে পারি?... ইউটোপিয়া বাস্তব হতে পারে, জীবন চলেছে ইউটোপিয়ার দিকে। সম্ভবত নতুন একটা যুগের শুরু হচ্ছে, যখন বুদ্ধি-জীবী ও সংস্কৃতিশীল শ্রেণী ইউটোপিয়া থেকে পরিত্রাণ পেয়ে এমন

সমাজের দিকে ফেরার কথা ভাববে যা ইউটোপীয় নয়, অর্থাৎ যা হবে কম 'পূর্ণতাপ্রাপ্ত' এবং বেশি স্বাধীন।'*

উডককের ভরসা আছে যে ইউটোপিয়ার প্রভাব হ্রাস পাবে, কারণ উনিশ শতকেও তাদের সেরাগুলির যে সাহিত্যিক ও সামাজিক প্রসিদ্ধি ছিল, তা এখন পাকাপাকি ইউটোপিয়া-বিরোধিতায় ঘুরে গেছে। তিনি এটা ভেবে দেখেন নি যে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের বিস্তৃতির যুগে ইউটোপিয়ায় আগ্রহ হ্রাসটা সমাজতান্ত্রিক আদর্শের পরাজয় নয়, বিজয়ই সূচিত করছে। সমাজতন্ত্রের প্রতি বিদ্বেষবশত তিনি ঘোষণা করছেন যে সাম্প্রতিক ইউটোপিয়া-বিরোধিতা ইউটোপীয় সমাজতন্ত্রে নিহিত প্রবণতারই বিকাশ। যেমন, ইংরেজ লেখক জ. অরওয়েলের '১৯৮৪'-কে তিনি বলেছেন 'প্লেটোর 'রাষ্ট্র' এবং মানবিক ব্যক্তিসত্তা বিরোধী অন্যান্য সমস্ত ইউটোপিয়ার যুক্তিসঙ্গত উপসংহার'। তিনি বলে উঠেছেন: 'অতীতের ইউটোপিয়াপন্থী কর্তৃত্ববাদীদের একজন কী সোৎসাহেই না চিন্তনের সমরূপিতা সৃষ্টির কৌশলটা লুফে নিত, কেননা সেসময়ের পক্ষে পাঠকক্ষীয় দিব্যদর্শনের বিষয়বস্তু হওয়ার মতো এমন ঘটনা ছিল বড়োই সুদূরপরাহত।'** এই প্রতীপস্থাপনায় দুটি গুরুতর ভুল হয়েছে উডককের। তিনি ভুলে গেছেন যে অ্যান্টিইউটোপিয়ার জন্ম দিয়েছে ইউটোপিয়া নয়, বাস্তবতা। তিনি ভেবে দেখেন নি যে ইউটোপিয়ার কতকগুলি নেতিবাচক দিক, যথা, মুরের দাসপ্রথা, এসেছে মহান ইউটোপিয়াপন্থীদের তজ্জনিত সহানুভূতি থেকে নয়, তাঁদের বাস্তব পরিবেশের ঐতিহাসিক সীমাবদ্ধতা থেকে।

বুর্জোয়া সাহিত্যে ইউটোপিয়া-বিরোধিতা হল সামাজিক চিন্তার ইতিহাসের ক্ষেত্রে কমিউনিজমবিরোধিতার প্রচার। কিন্তু সামাজিক চিন্তার বিকাশে ইউটোপীয় সমাজতন্ত্র ও টমাস মুরের 'ইউটোপিয়া'র স্থান ও ভূমিকা বিকৃত করে দেখাতে তা অক্ষম। সমাজতন্ত্রের ভাবনা প্রচারে ইউটোপিয়াপন্থীদের অবদান তা বরং পরোক্ষে স্বীকারই করে নেয়।

টমাস মুর যেসময় লেখেন তখন মধ্যযুগীয়তার বিরুদ্ধে কঠিন সংগ্রামে অনেক প্রগতিশীল নীতির ভিত্তি পত্তন হচ্ছিল, যা পরবর্তী যুগগুলিতে পুষ্ট হয়ে ওঠে। সামন্ততান্ত্রিক-স্বৈরতান্ত্রিক আমলের দৃপ্ত সমালোচনা ও ইউটোপিয়াবাসীদের আদর্শ ব্যবস্থার অনুপ্রাণিত, কিন্তু যুক্তিযুক্ত

বর্ণনায় অতীন্দ্রিয় আবিষ্কারের ছিটেফোঁটাও নেই। সামাজিক ও রাজনৈতিক চেতনাকে ধর্ম থেকে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে টেনে আনার যে মানবিক প্রয়াস শুরু হয়েছিল টমাস মুর তাতে বিপুল অবদান যোগ করেন।

এ প্রক্রিয়ায় মুরের স্থানটা অদ্বিতীয় এইজন্য যে আধুনিক কালে ইউটোপীয় কমিউনিজমের ধারণার সূত্রপাত করেন তিনিই প্রথম। প্রাচীন জগতের কমিউনিস্ট ভাবনার ও মধ্যযুগীয় যৌথ আচারের সমস্ত উত্তরাধিকার আত্মস্থ করে তিনি তাতে একটা সুসমাপ্ত রূপ দেন এবং তা থেকে ভবিষ্যতের সঙ্গে, পরবর্তী কালের সমাজতান্ত্রিক ধ্যানধারণা ও আন্দোলনের সঙ্গে একটা সেতু পাতেন।

মুর শুধু সমাজতন্ত্রের ইউটোপীয় গোষ্ঠীর প্রবর্তকই নন, তার গণতান্ত্রিক ধারার, যা সমাজতন্ত্রকে কেবল একটা যুক্তিযুক্ত সমাজব্যবস্থা হিশেবে দেখে না, দেখে সামাজিক বিরোধ ও অসাম্য দূর করার উপায় হিশেবে, সামাজিক ন্যায়ের, অর্থাৎ যে সমাজতন্ত্র নিপীড়িত শ্রেণীদের প্রয়োজন থেকে উদ্ভূত তার বিজয় হিশেবে দেখে, তারও জনক।

মুরের সমাজতন্ত্র এবং তাঁর সময়কার বৈপ্লবিক আন্দোলনের মধ্যে বিভেদটা নিয়মসঙ্গত। ধর্মীয় অন্ধ আতিশয্যের কবলিত জনআন্দোলনকে গ্রহণ করতে পারেন নি বিজ্ঞানী। পাঠকক্ষীয় ইউটোপীয় সমাজতন্ত্র আর শোষণ প্রতিরোধের জনসাধারণী পদ্ধতির মধ্যে ফারাকটা বজায় ছিল আরো বহু বছর। কেবল উনিশ শতকেই সমাজতন্ত্র বিষয়ে বিজ্ঞান আর শ্রমিক শ্রেণীর বৈপ্লবিক আন্দোলনকে মেলাবার মতো পরিস্থিতি গড়ে ওঠে।

তাঁর যুগ থেকে যা অনেকটা এগিয়ে ছিল, এমন বহু ধারণার উৎস ছিল মুরের 'ইউটোপিয়া'। বাধ্যতামূলক, সর্বজনীন শিক্ষা, ধর্মীয় সহিষ্ণুতা, বিশ্রাম আর সাংস্কৃতিক বিকাশের জন্য সময় রেখে হ্রস্ব কর্মদিনের ধারণায় যাঁরা প্রথম উপনীত হয়েছিলেন মুর তাঁদের একজন।

গণতন্ত্র ও ব্যক্তিত্বের অবাধ বিকাশের নীতির সঙ্গে সাধারণ সম্পত্তির ধারণাকে মেলাতে পেরেছিলেন মুর। তাঁর সমাজতন্ত্রবিরোধী সমালোচকেরা যাই বলুন, 'ইউটোপিয়া'র সঙ্গে পরিচয় থাকলে সন্দেহ থাকবে না যে তাঁর ত্রুটিগুলির কারণ সেই যুগেই নিহিত, বর্ণিত ব্যবস্থাটা মুক্তি, মানবিকতা ও সমাজতন্ত্রের নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। এই কারণেই 'ইউটোপিয়া' আজো পর্যন্ত দৃষ্টি আকর্ষণ করছে, মানবিক বিচারবুদ্ধির অতি সমুজ্জ্বল ও সমুন্নত অভিব্যক্তি হিশেবে উদ্রেক করছে অনুরাগের।



§ ৪। হ্যুগো গ্রটিয়াস

প্রমুখ ওলন্দাজ ব্যবহারশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত হ্যুগো গ্রটিয়াসের (১৫৮৩-১৬৪৫) ক্রিয়াকলাপের সময়টায় শুরু হয়েছিল সামন্ততন্ত্রের ভেঙে পড়া, পশ্চিম ইউরোপের মধ্যযুগীয় নির্দিষ্ট ধর্মীয় ঐক্যের পতনের পর্ব। গ্রটিয়াসের জন্মভূমি হল্যান্ড অন্যান্য ইউরোপীয় দেশের আগে পুঁজিবাদী বিকাশের পথ নেয়। এতে অনেকখানি সাহায্য করে নেদার্ল্যান্ডসের বিপ্লব, যা স্পেনীয় সামন্তদের হাত থেকে মুক্ত করে দেশকে। হল্যান্ডের ছিল শক্তিশালী বাণিজ্য নৌবহর, ইংলন্ডের নৌবহরের সঙ্গে তা প্রতিযোগিতা চালায় সাফল্যের সঙ্গে।

গ্রটিয়াস ছিলেন তাঁর সময়ের পক্ষে প্রগতিশীল বুর্জোয়া ব্যবহারশাস্ত্রের অন্যতম

প্রতিষ্ঠাতা। 'মৎস্য শিকারের অধিকার বিষয়ে' গ্রন্থে (১৬০৫-১৬০৬) তিনি উন্মুক্ত সমুদ্রে সমস্ত পতাকার জাহাজের অবাধ চলাচলের অধিকার সমর্থন করেন, প্রমাণ করেন যে প্রথমে একমাত্র স্পেন ও পোর্তুগালের, পরে ইংলণ্ডের সামুদ্রিক আধিপত্যের দাবি অসিদ্ধ। এই গ্রন্থে আন্তর্জাতিক আইনের যে মূলকথাগুলো বলা হয়েছিল, তা পরে পরিবিকশিত হয় 'যুদ্ধ ও শান্তির আইন বিষয়ে' — তাঁর প্রধান রচনায়। এটি লিখিত হয় ফ্রান্সে, প্রকাশিত হয় ১৬২৫ সালে।

'যুদ্ধ ও শান্তির আইন বিষয়ে' গ্রন্থের উৎসর্গপত্রে গ্রটিয়াস উল্লেখ করেছেন যে বইটি 'লেখা ন্যায়পরতা রক্ষায়'*। হল্যাণ্ডের মনীষী যুদ্ধকালে রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে সম্পর্কের নিষ্ঠুরতা ও বিশ্বাসঘাতকতাকে ধিক্কার দিয়েছেন। তিনি ঘোষণা করেছেন, লোকেদের অন্তর 'সার্বত্রিক শান্তি স্থাপনের জন্য তৃষিত'।

যেসকল বিদ্বান কেবল রোমক ও স্বদেশী আইনের বিবরণদানে ও টীকায় ব্যাপৃত থাকেন, কিন্তু যে আইনে বহু জাতির বা তাদের শাসকদের মধ্যে সম্পর্ক নির্দিষ্ট হচ্ছে সমগ্রভাবে বা সুসঙ্গতরূপে তা অনুধাবন করেন না, তাঁদের নিন্দা করেছেন গ্রটিয়াস। তিনি দেখিয়েছেন যে এধরনের লেখা আরো বেশি প্রয়োজন এই কারণে যে 'আমাদের কালে বা আগেকার কালে আইনের এই দিকটা যারা তাচ্ছিল্য করেছে তেমন লোকের অভাব হয় নি কখনো'**। আন্তর্জাতিক সম্পর্কে নির্ধারক হল শক্তি এবং যুদ্ধের সময় সমস্ত আইনই স্তব্ধ, এ কথা যারা বলে, তাদের সঙ্গে গ্রটিয়াস একমত নন।

যুদ্ধ ও আইনের মধ্যে সম্পর্কের যে সমস্যা এই প্রসঙ্গে ওঠে, তার সমাধানের জন্য গ্রটিয়াস সর্বাগ্রে বিশ্লেষণ করেছেন আইনের মর্মার্থের প্রশ্নটি। আইনের মর্মার্থ সম্পর্কে একটা বাস্তববাদী ধারণাই গ্রটিয়াসের বৈশিষ্ট্য। তিনি লিখেছেন: 'আইন যদি হয় বাস্তবে রূপায়িত হবার শক্তি থেকে বঞ্চিত, তাহলে তার বাহ্যিক রূপায়ণও জোটে না'***। সেই সঙ্গে তিনি এও বলেছেন যে এর অর্থ এমন নয় যে আইন কার্যকরী হতে পারে কেবল

শক্তিবলে। লোকে স্বেচ্ছাতেও আইনের বিধিবিধান মেনে চলে, কেননা 'অন্যায় লাভ করে ঈশ্বরের বিরূপতা, ন্যায় — তাঁর আশীর্বাদ'*।

নীতিশাস্ত্রীয় আচরণ থেকে আইনের বিধিকে তফাৎ করার চেষ্টা করেছেন গ্রটিয়াস, যদিও বেশ কিছু ক্ষেত্রে আইনী ধারা আর নৈতিকতা, 'ন্যায়পরায়ণতার' দাবিকে অভিন্ন করে দেখেছেন। যেমন, 'যুদ্ধ ও শান্তির আইন বিষয়ে' গ্রন্থে তিনি লিখেছেন: 'শক্তিপুষ্ট না হলে আইন একেবারে অকেজো, এমন কথা বলা যায় না, কেননা ন্যায় অনুসরণ করলে পাওয়া যায় বিবেকের শান্তি, আর স্বৈরশাসকদের অন্তরের যে-কথা প্লেটো লিখেছেন, অন্যায় করলে হয় তেমনি যন্ত্রণা আর কষ্ট'**।

কিন্তু আইন পালন নিশ্চিত করা যায় যে বাধ্যবাধকতায়, তার চরিত্র গ্রটিয়াস বোঝেন নি। কৌলিক সমাজেও তো ছিল রীতিনীতি আশ্রিত কিছুটা বাধ্যবাধকতা, কিন্তু আইনী ধারা কিছু ছিল না। গ্রটিয়াসের এই বোধ ছিল না যে তাঁর সমকালীন রাষ্ট্রে বাধ্যবাধকতা কার্যকর হচ্ছে সংখ্যালঘুর স্বার্থে, তিনি এগিয়েছিলেন মানুষের শাশ্বত প্রকৃতি ও প্রয়াস যার অনুসারী, সেই অপরিবর্তনীয় স্বাভাবিক বিধি থেকে।

এই দিক থেকে স্বাভাবিক বিধির তত্ত্ব বিকাশে গ্রটিয়াসের অবদান গুরুত্বপূর্ণ। গবেষকরা স্বাভাবিক বিধির নজির দিয়েছিলেন তাঁর অনেক আগেই। স্বাভাবিক-বিধিমূলক মতবাদের উপাদান ছিল প্রাচীন গ্রীসের সফিস্ট, স্টোইকদের বিশ্বাসে, আরিস্টটলের রচনায়, সামন্ততান্ত্রিক যুগের লেখায়। গ্রটিয়াস যে ফিলোন, টের্টুলিয়ান, মার্কাস অরিলিয়াস, সিসেরো, লাকটানটিয়াস, রোমের ব্যবহারজীবী পল ও উলপিয়ানের উল্লেখ করেছেন, সেটা অকারণে নয়। কিন্তু স্বাভাবিক বিধিকে তিনি দেখেছেন কাণ্ডজ্ঞানের, প্রকৃতির নির্দেশ বলে। প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় মনীষীদের থেকে ভিন্ন একটা বোধ তাতে আরোপ করেছেন তিনি। স্বাভাবিক বিধি সম্পর্কে টমাস আকুইনাসের মতবাদ ছিল সামন্ততন্ত্র ও ধর্ম রক্ষায় নিয়োজিত। মধ্যযুগে যাঁরা স্বাভাবিক-আইনী মত পোষণ করতেন, তাঁদের ধারণা ছিল এটা ঐশ্বরিক বিধানের প্রকারভেদ ছাড়া আর কিছু নয়। গ্রটিয়াস কিন্তু এতে একটা বুর্জোয়া চরিত্র দান করেন, তার সাহায্যে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা থেকে উন্নততর সমাজে উত্তরণের যুক্তিযুক্ততা প্রতিপাদন করেন তিনি।

আইন বলতে গ্রটিয়াস বোঝেন সামগ্রিক আচরণবিধি, অথবা অবজেকটিভ আইন। স্বাভাবিক বিধির অন্যতম প্রধান তত্ত্বকার হলেও তাঁর কাছে আইনের মূল রূপ হল পজিটিভ আইন, যাতে বোঝা হয় ক্ষমতাধরের আজ্ঞা, আদেশ-নির্দেশ, মর্জির সমষ্টি। আইনকে মর্জির অভিব্যক্তি জ্ঞান করাই হল বিভিন্ন ধরনের আইন বোঝার সূত্র।

গ্রটিয়াসের মতে, স্বাভাবিক বিধি ঈশ্বরের ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপর নির্ভরশীল নয়, এতই তা অটল যে স্বয়ং ঈশ্বরও তা বদলাতে পারেন না। স্বাভাবিক বিধির তিনটি মূলনীতি নির্ধারণ করেছেন তিনি: অপরের সম্পত্তি আত্মসাৎ না করা, চুক্তি মেনে চলা, দুষ্কর্মে শাস্তি।

স্বাভাবিক বিধি ছাড়াও আছে অভিপ্রেত, পজিটিভ আইন। তাঁর কাছে স্বাভাবিক বিধি ও পজিটিভ আইন সোপানতান্ত্রিক ধারায় সন্নিবিষ্ট ও ব্যবহারশাস্ত্রের দিক থেকে পরস্পর সংযুক্ত। স্বাভাবিক বিধি ধরা পড়ে কাণ্ডজ্ঞানে, a priori, পজিটিভ আইন a posteriori, অভিপ্রায় প্রকাশ মারফত।

গ্রটিয়াস মনে করেন, অভিপ্রেত আইন হতে পারে ঐশ্বরিক অথবা মানবিক। ঐশ্বরিক আইন আসতে পারে সরাসরি ঈশ্বরের ইচ্ছায়। স্টোইকরা যে বলতেন আইনের, ন্যায়ের উৎস খুঁজতে হবে কেবল প্রকৃতি ও স্বয়ং ঈশ্বর (জুপিটার) ছাড়া আর কোথাও নয়, এতে তিনি একমত। এই কথায় তিনি জোর দিয়েছেন যে লোকেদের স্বার্থে উদ্দাম আবেগকে স্বাধীনতা দেন নি ঈশ্বর, নির্দিষ্ট সীমা ও ন্যায্য পরিধির মধ্যে তাকে সংযত রেখেছেন।

মানবিক আইনকে গ্রটিয়াস ভাগ করেছেন রাষ্ট্রাভ্যন্তরীণ এবং 'বেশি ব্যাপক' ও 'রাষ্ট্রাভ্যন্তরীণের তুলনায় বেশি সংকুচিত অর্থে' মানবিক আইনে। তাঁর কাছে 'বেশি সংকুচিত অর্থে' মানবিক আইন হল, দৃষ্টান্তস্বরূপ, পিতা ও প্রভুর আদেশ। আর 'বেশি ব্যাপক অর্থে' মানবিক আইন বলতে তিনি বোঝেন আন্তর্জাতিক আইন যা বলবৎ হয় সমস্ত বা বহু জাতির ইচ্ছাক্রমে। এক্ষেত্রে তিনি সতর্ক করে দিয়েছেন যে সমস্ত জাতির পক্ষে সাধারণ, জনগণের এমন আইন প্রায় দেখাই যায় না। তিনি লিখেছেন: 'কেননা প্রায়শই ভূগোলকের এক খণ্ডে জনগণের এমন আইন আছে যা বাকি অংশে বলবৎ নয়, যেমন, যুদ্ধ বন্দীদের অবস্থা আর শাস্তি চুক্তির পরিবেশ সম্পর্কে আইন।'*

জনগণের আইনকে গ্রটিয়াস পজিটিভ আইন বলেছেন, যাদের অস্তিত্ব সুসিদ্ধ হয়েছে 'রাষ্ট্রাভ্যন্তরীণ অলিখিত আইনের মতো একই উপায়ে, যথা নিরন্তর মেনে চলার ঘটনা এবং ওয়াকিবহাল লোকেদের সাক্ষ্য দ্বারা'*। এ ব্যাপারে তিনি বেশি মূল্য দিয়েছেন ইতিবৃত্তগুলিতে উল্লিখিত নজিরের।

আন্তর্জাতিক আইনের বৈশিষ্ট্য হল বাধ্যকরণের কোনো কেন্দ্রীয় ব্যবস্থার অভাব। এই কথাটা বহু বুর্জোয়া ব্যবহারশাস্ত্রী, যেমন বুর্জোয়া সমাজের উদয়কালে, তেমনি তার পরেও ব্যবহার করেছেন এইটে 'প্রমাণ' করার জন্য যে আন্তর্জাতিক নিয়মাদির কোনো আইনী চরিত্র নেই। আন্তর্জাতিক আইনের অস্তিত্ব সম্পর্কে গ্রটিয়াসের কিন্তু কোনো সন্দেহ ছিল না।

'যুদ্ধ ও শান্তির আইন বিষয়ে' গ্রন্থে রাষ্ট্রাভ্যন্তরীণ আইনের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তিনি রাষ্ট্রের উদ্ভব হল কোথা থেকে, রাষ্ট্র জিনিসটা কী, তা নিয়ে আলোচনা করেছেন। রাষ্ট্র গড়ে ওঠায় বড়ো একটা ভূমিকা তিনি দেখেছেন লোকেদের মিশুক প্রকৃতিতে, সমাজ বেঁধে থাকার স্পৃহা ও প্রয়াসে। এ ব্যাপারে তাঁর ধারণা হবস থেকে একেবারেই ভিন্ন, যিনি স্বাভাবিক পরিবেশে মানুষকে মনে করতেন বিচ্ছিন্ন এক-একটা স্বতন্ত্র ব্যক্তি, পরস্পরের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন।

গ্রটিয়াসের কাছে মেলামেশা হল একটা নৈতিক প্রয়োজন, লোকে মেলামেশা করতে চায় কোনো একটা লাভের আশায় নয়, মানবিক প্রকৃতিবশেই। লোকে প্রকৃতিবশেই জীবন ও সমাজের অনুরাগী, কোনো আইনের হুকুম ও দাবিতে বা উপকারের লোভে নয়, যদিও সামাজিক জীবনের লাভটা প্রত্যক্ষই: তাতে স্বতন্ত্র এক-একজন ব্যক্তির দুর্বলতা ও ত্রুটি দূর হয়। তাঁর মতে, মেলামেশার সম্পর্ক দৃঢ় করা, সাধারণ প্রশান্তি নিশ্চিত করার জন্যই গড়ে উঠেছে রাষ্ট্র। তিনি লিখেছেন: 'রাষ্ট্র হল স্বাধীন লোকেদের পূর্ণতাপ্রাপ্ত একটা সমিতি, যা চুক্তিবদ্ধ হয়েছে আইন পালন ও সাধারণ উপকারের জন্য।'**

তিনি বলেছেন, জুলুম-জবরদস্তি প্রতিরোধ করা বিচ্ছিন্ন এক-একটা পরিবারের পক্ষে যে অসম্ভব, এ বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে লোকে মিলিত হয়েছে রাষ্ট্রে। এই প্রসঙ্গে তিনি জোর দিয়েই বলেছেন যে 'লোকে রাষ্ট্রে মিলিত

হয়েছে ঐশ্বরিক আদেশে নয়, স্বেচ্ছায়'*। তাহলেও তিনি যোগ করেছেন, 'মানবজাতির পক্ষে হিতকর' একটি সংগঠন হিশেবে ঈশ্বরের অনুমোদন আছে রাষ্ট্র গঠনে।** তবে সমগ্রভাবে তিনি রাষ্ট্রকে দেখেছেন এমন একটা ব্যবস্থা বলে যা সৃষ্ট ও সক্রিয় ঈশ্বরের অপেক্ষা না করেই।

মধ্যযুগীয় ঈশ্বরতাত্ত্বিকদের থেকে গ্রটিয়াসের পার্থক্য এই যে তিনি রাষ্ট্র উদ্ভবের ঐহিক তত্ত্ব বিকশিত করেন, নাগরিক ক্ষমতাকে তিনি বলেছেন 'মনুষ্যপ্রতিষ্ঠিত'। রাজনৈতিক মতবাদের ইতিহাসে এই ধারাটির বর্ণনায় মার্কস লিখেছেন: 'ততদিনেই মাকিয়াভেলি, কাম্পানেলা, পরে হবস, স্পিনোজা, হুগো গ্রটিয়াস থেকে শুরু করে রুসো, ফিখ্‌টে, হেগেল পর্যন্ত সবাই রাষ্ট্রকে দেখতে থাকেন মানুষের দৃষ্টিতে, তার স্বাভাবিক নিয়মগুলিকে তাঁরা প্রতিপাদন করেছেন ঈশ্বরতত্ত্ব দিয়ে নয়, বিচারবুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা থেকে'***। বলাই বাহুল্য, গ্রটিয়াস বোঝেন নি যে রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়েছে বৈরী শ্রেণীতে সমাজের বিভাজন এবং শ্রেণী দ্বন্দ্বের অমীমাংসেয়তা থেকে।

রাষ্ট্রকে লোকেদের ঐক্যবদ্ধ করার ফল হিশেবে দেখায় গ্রটিয়াস এই ধারণায় উপনীত হন যে রাষ্ট্রের উদ্ভবটা চুক্তিমূলক। এই তত্ত্বের পক্ষপাতীরা রাষ্ট্রকে মনে করতেন নির্দিষ্ট কিছু লক্ষ্যের জন্য লোকেদের ইচ্ছায় কৃত্রিমভাবে গড়া। সামাজিক চুক্তি থেকে রাষ্ট্রের উদ্ভব বিষয়ে মতবাদটা গ্রটিয়াসের বেলায় তেমন সুনির্দিষ্টতায় অভিব্যক্ত নয়, যা হয়েছিল তাঁর অনুগামী হবস, লক, রুসোর ক্ষেত্রে। তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই, কেননা এ ধারার আদি প্রতিনিধিদের তিনি অন্যতম।

গ্রটিয়াস অনেক মন দিয়েছেন রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব, সর্বোচ্চ ক্ষমতার প্রশ্নে। তাঁর মতে, রাষ্ট্র গঠিত হয় সামাজিক শান্তি রক্ষার জন্য। 'রাষ্ট্রীয় লক্ষ্য সাধনের জন্য প্রয়োজন বলে' তা লোকেদের এবং তাদের সম্পত্তির ওপর হুকুমদারির সর্বোচ্চ অধিকার রাখে****।

গ্রটিয়াসের ভাবাদর্শগত পূর্বসূরী জাঁ বদেন সার্বভৌম ক্ষমতার

বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে বলেন যে সার্বভৌমত্ব হল এক এবং অদ্বৈত। ফরাসি এই আইনবিদের মতে, পরিবারের সঙ্গে রাষ্ট্রের পার্থক্য হল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সর্বোচ্চ, সার্বভৌম চরিত্রে, সর্বোচ্চ সার্বভৌম ক্ষমতাই রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য। তিনি এই কথায় জোর দেন যে সার্বভৌমত্বের অর্থ নাগরিক ও প্রজাদের ওপর সীমাহীন, আইন থেকে স্বাধীন ক্ষমতা। সুতরাং, নিজের জারি করা আইনের সঙ্গে সার্বভৌম বাঁধা নন, তিনি শুধু ঐশ্বরিক ও স্বাভাবিক নিয়মের ওপর নির্ভরশীল। রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের যে মতবাদ গ্রটিয়াস বিকশিত করেন তা অনেক দিক দিয়ে বদেন থেকে অভিন্ন। শাসকদের অতি ব্যাপক কর্তৃত্বের সমর্থন করেন তিনি, রাষ্ট্রিক ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাঁরা জনগণ থেকে স্বাধীন বলে গ্রটিয়াস মনে করতেন।

সর্বোচ্চ ক্ষমতার, সার্বভৌমত্বের সাধারণ ধারক, তাঁর মতে, রাষ্ট্র আর প্রকৃত অর্থে ক্ষমতার ধারক হল 'কোনো একটা জাতির আইন ও রীতিনীতি অনুযায়ী একজন বা কতিপয় ব্যক্তি'*। 'সর্বত্র এবং বিনা ব্যতিক্রমে সর্বোচ্চ ক্ষমতায় অধিকার জনগণের' এবং শাসক তার ক্ষমতার অপব্যবহার করলে তাকে 'সিংহাসনচ্যুত করা, শাস্তি দেবার' অধিকার জনগণের আছে, এরকম মত তিনি মানতেন না**।

রাষ্ট্র গঠনের চুক্তিমূলক চরিত্র, যেখানে স্বেচ্ছায় এক বা কতিপয় ব্যক্তির ক্ষমতা মেনে নিচ্ছে লোকসমাজ, তা সমর্থন করলেও গ্রটিয়াস এ চুক্তি লংঘনের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ক্ষমতার কোনো দায়িত্বের উল্লেখ করেন নি।

অধীনস্থদের পক্ষ থেকে সর্বোচ্চ ক্ষমতা অথবা তার কাছ থেকে ভারপ্রাপ্ত কোনো সংস্থার বিরুদ্ধে প্রতিরোধের অধিকার তিনি দৃঢ়ভাবে অগ্রাহ্য করেছেন। তিনি স্বীকার করেছেন যে 'জবরদস্তি হলে স্বভাবতই তা প্রতিরোধ করার অধিকার আছে সবারই', কিন্তু সেই সঙ্গেই আবার ঘোষণা করেছেন যে সামাজিক শান্তি ও রাষ্ট্রিক শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য প্রতিরোধের এই সর্বজনীন অধিকারে নিষেধাজ্ঞা জারির অধিকার আছে রাষ্ট্রের। পক্ষান্তরে, গ্রটিয়াসের মতে, 'প্রতিরোধের অমন সর্বজনীন অধিকার যদি বজায় রাখা হয়, তাহলে আর রাষ্ট্র থাকবে না, থাকবে

সাইক্লোপিয়ানদের মতো বিশৃঙ্খল জনতা'*। তাঁর মতে, ক্ষমতার প্রতিরোধ অনুচিত আরো এই জন্য যে প্রভুত্ব ও অধীনতার ব্যবস্থা ঈশ্বর অনুমোদন করেছেন এবং পরোক্ষে রাষ্ট্রক্ষমতাও স্থাপন করেছেন তিনিই।

'যুদ্ধ ও শান্তির আইন বিষয়ে' গ্রন্থে গ্রটিয়াস রাজার পূর্ণ ক্ষমতার ন্যায্যতা প্রতিপাদন করতে চেয়েছেন। তার কারণ এই বলে ব্যাখ্যা করা যায় যে বইটি যেখানে লেখা হয়েছিল সেই ফ্রান্সে এবং আরো কয়েকটি ইউরোপীয় দেশে নিরংকুশ রাজতন্ত্রের প্রগতিশীল ভূমিকা ছিল তখনো। হস্তশিল্প কারখানা, অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্যের বিকাশ, রাষ্ট্রের আরো কেন্দ্রীকরণ, বুর্জোয়া উপাদানের বৃদ্ধিতে তা সাহায্য করছিল।

গ্রটিয়াসের মতে, সমগ্র রাষ্ট্রীয় ক্রিয়ার ভিত্তি হল সর্বোচ্চ ক্ষমতা। তা কাজ করে দুই মূল ধারায়: একটা দেখে সাধারণ ব্যাপার, অন্যটা চালায় মূর্ত-নির্দিষ্ট কাজকর্ম। প্রথম ধারাটিতে পড়ে আইনপ্রণয়ন, দ্বিতীয়টিতে বিচারকার্য। সরকারের দৈনন্দিন কার্যকলাপ বা বিচারকার্য চলে বিশেষ প্রশ্ন নিয়ে, কিন্তু তা জনসাধারণের স্বার্থ সাধনে চালিত, তার উদ্দেশ্য হল 'সামাজিক শান্তি' রক্ষা। কাজের ধারা অনুসারে গ্রটিয়াস রাষ্ট্রক্ষমতাকে বিভিন্ন প্রকারভেদে ভাগ করেছেন, কিন্তু এটা অখণ্ড ও অবিভাজ্য সর্বোচ্চ ক্ষমতার ভাগ নয়।

মূর্ত-নির্দিষ্ট এই ক্রিয়াকলাপের প্রেক্ষিতে ব্যতিক্রমমূলক ক্ষেত্রে, যখন 'কর্তৃপক্ষীয় ব্যক্তির জুলুমের' ফলে স্পষ্টতই লোকেদের জীবন বিপন্ন হয়, তখন ক্ষমতার বিরুদ্ধাচরণ সঙ্গত মনে করেছেন গ্রটিয়াস। তদুপরি, শুধু প্রতিরোধ নয়, তিনি বলেছেন সশস্ত্র প্রতিরোধের কথাই, আপত্তি করেছেন কেবল সেইসব ক্ষেত্রে, যেখানে 'রাষ্ট্রকে প্রচণ্ডতম ঝাঁকুনি না দিয়ে অথবা বহু নিরপরাধ লোকের প্রাণহানি না ঘটিয়ে প্রতিরোধ সম্ভব নয়'**। সশস্ত্র প্রতিরোধের অধিকার সবিশেষ যুক্তিসঙ্গত যখন সমগ্র জনগণের সর্বনাশ করার মতলব আঁটে শাসক। জনগণের অধিকার লঙ্ঘন করে অন্যায় যুদ্ধ মারফত যখন ক্ষমতা দখলের ব্যাপার ঘটে, তখনো প্রতিরোধ সঙ্গত বলে তিনি মনে করেছেন।

এইভাবে, খুবই সংকীর্ণ সীমার মধ্যে হলেও জনগণের অভ্যুত্থানের অধিকার গ্রটিয়াস মেনেছেন। পরবর্তী কালের যে বুর্জোয়া ভাবাদর্শীরা

র‍্যাডিকেল বুর্জোয়া মহলের স্বার্থ প্রকাশ করেছেন, তাঁরা বাড়িয়ে দিয়েছেন অভ্যুত্থানে জনগণের অধিকারের পরিধি। রুসো তাঁর 'সামাজিক চুক্তি'তে সর্বোচ্চ ক্ষমতা ও তার ধারকের প্রসঙ্গে গ্রটিয়াসের রক্ষণশীল মতবাদ, বিশেষ করে জনগণের সার্বভৌমত্ব পুরোপুরি অস্বীকার করার থিসিসটিকে তীব্র সমালোচনা করেছেন। তাঁর মতে, জনগণ স্বেচ্ছায় নিজেদের সমস্ত ক্ষমতা রাজার হাতে তুলে দিতে পারে, এ কথা বলার অর্থ জনগণকে 'পাগল গণ্য করা: পাগলামি আইন রচনা করে না'*। গ্রটিয়াস থেকে রুসোর তফাৎ এই যে রাষ্ট্রে জনগণের নেতৃত্বে তিনি বিশ্বাস করতেন দৃঢ়ভাবে।

সর্বোচ্চ ক্ষমতা ভোগের বিভিন্ন উপায় নিয়ে আলোচনা করেছেন গ্রটিয়াস। যেমন, তিনি বলেছেন, ক্ষমতা ভোগ করা যায় পূর্ণ মালিকানার অধিকারে, অথবা উজুফ্রুক্টের অধিকারে। প্রথম ক্ষেত্রে ধরা হয়েছে যে ক্ষমতা অর্জিত হচ্ছে ন্যায়সঙ্গত যুদ্ধ মারফত, অথবা যখন 'অধিকতর অমঙ্গল এড়াবার জন্য কোনো একটা জনগোষ্ঠী বিনাশর্তে অধীনতা মেনে নেয়'**। এগুলি হল পৈত্রিক রাষ্ট্র। গ্রটিয়াসের মতে, প্রজাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার সঙ্গে এসব রাষ্ট্রের প্রধানদের কোনো সম্পর্ক নেই, এমনকি যেকোনো মালিকের মতো যাকে খুশি ক্ষমতা হস্তান্তর করার অধিকারও তাদের আছে। গ্রটিয়াস এই কথায় জোর দিয়েছেন যে এ ক্ষেত্রে হস্তান্তরিত হচ্ছে মানুষ নয়, লোকেরা নয়, তাদের ওপর শাসনের অধিকার।

দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ক্ষমতা থাকে রাজার হাতে। প্রথমে তারা নির্বাচিত হয়েছিল অথবা ক্ষমতা পেয়েছে উত্তরাধিকার সূত্রে। গ্রটিয়াস এখানে রোমক আইনের একটি পরিভাষা ব্যবহার করেছেন — 'উজুফ্রুক্ট'। তাই, এতে ক্ষমতা ব্যবহার, রাষ্ট্র শাসন চলে 'পরের সম্পত্তি' চালাবার ধরনে। তবে, গ্রটিয়াসের মতে, জনগণ এক্ষেত্রে কতকগুলি অধিকার রাখে। জনগণের অভিপ্রায়ই বহু রাজতন্ত্রের আদি উদ্ভবের কারণ। পৈত্রিক রাষ্ট্র থেকে এগুলির তফাৎ হল প্রজাদের সম্মতি ছাড়া রাজারা শাসনভার হস্তান্তর করতে পারে না।

ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলে রাষ্ট্রের ওপর রাজার যে অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চান গ্রটিয়াস, সেটা রাষ্ট্রের প্রাধান্য সম্পর্কে তাঁরই নিজের ধারণারই

বিরোধী: একটা সমগ্র বস্তু হিশেবে রাষ্ট্র তার একাংশের, সুতরাং রাজারও সম্পত্তি হতে পারে না। এই স্ববিরোধ মেটাবার জন্য তিনি তেমন মুক্ত রাষ্ট্রকেই শ্রেষ্ঠ ও যোগ্য জ্ঞান করেছেন, যেখানে নাগরিকদের রাজনৈতিক অধিকারও আছে। তিনি স্বীকার করেছেন যে জনগণ যেখানে বাধ্য হয়ে নয়, স্বেচ্ছায় সার্বভৌমের অধীনতা মেনে নিয়েছে, সেখানে 'সর্বোচ্চ ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য জনগণ রাজাকে সম্মতি জানিয়েছে এমন কথা ধরে নেয়া অনুচিত'*। সার্বভৌমের উত্তরাধিকার স্বত্বে ব্যাপারটা বদলায় না, কেননা আদিতে যা নির্বাচন দ্বারা স্থির হয়েছিল, উত্তরাধিকারে শুধু তারই অনুবর্তন চলে। স্বাভাবিক বিধি, ঐশ্বরিক বিধান এবং জনগণের আইন অনুসারে গ্রটিয়াস সর্বোচ্চ ক্ষমতার ওপর একগুচ্ছ সীমারোপ করেছেন। 'কোনো রকম প্রতিশ্রুতি না দিলেও সমস্ত সার্বভৌমই তাতে বাঁধা'**। অধীনস্থদের রাজা স্বেচ্ছায় যে প্রতিশ্রুতি দেয় তাতেও তার সর্বোচ্চ ক্ষমতা সীমিত হয়। সার্বভৌম যদি তার স্বেচ্ছাপ্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পালন না করে, তাহলে প্রথমবার তার কাজকে ঘোষণা করা হবে বেআইনী, দ্বিতীয়বার কিন্তু 'যোগ্যতার অভাব হেতু' তাকে বলা হবে তুচ্ছ, কেননা 'কার্যকর প্রতিশ্রুতি প্রদত্তকে অধিকার দেয়'***। গ্রটিয়াস ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে এর অর্থ এমন নয় যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতাধর কোনো উচ্চতন বিচারকের কাছে আত্মসমর্পণ করছে; তার কাজ তুচ্ছ হতে পারে কেবল আইনের বলেই। এই ধরনের দৃষ্টান্তের তিনি উল্লেখ করেছেন কিংবদন্তি থেকে। যেমন, মিশরের পরাক্রান্ত রাজারা অনেক প্রথা মেনে চলতে বাধ্য ছিল। তা লঙ্ঘন করলে জীবদ্দশায় তাদের শাস্তি দেয়া চলত না, কিন্তু মৃত্যুর পর জমকালো অন্ত্যেষ্টি হত না তাদের। প্রাচীন কালের ঐতিহাসিক ইয়োসিফ ফ্লাভিয়াসের সাক্ষ্য অনুসারে একই ভাবে ইহুদিদের যে রাজারা ন্যায়পর হত না, তারা সমাধিস্থ হত রাজকীয় সমাধিক্ষেত্রের বাইরে। এই ধরনের ঘটনার উল্লেখ করে গ্রটিয়াস সন্তোষের সঙ্গে লিখেছেন: 'এ ছিল একটা চমৎকার ব্যবস্থা। এতে সর্বোচ্চ ক্ষমতার পবিত্র চরিত্র নষ্ট হত না, অথচ মরণোত্তর বিচারের ভয়ে বিশ্বস্ততার শপথ ভঙ্গ থেকে বিরত থাকত রাজারা'****।

গ্রটিয়াস হয়ে ওঠেন আন্তর্জাতিক আইনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। যুদ্ধের আইন, আন্তর্জাতিক আইনের সমস্যাগুলিতে তিনি খুব মন দেন, বিশেষ করে 'যুদ্ধ ও শান্তির আইন বিষয়ে' গ্রন্থে। আন্তর্জাতিক আইন বা জনগণের আইন তিনি তাকে বলেছেন যা সমস্ত বা অধিকাংশ জাতির ইচ্ছাক্রমে বলবৎ হবে বাধ্যতামূলকভাবে*। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে আইন গড়ে ওঠে পারস্পরিক সুবিধার বিবেচনায় চালিত রাষ্ট্রগুলির পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে। এইভাবে, গ্রটিয়াসের মতে, রাষ্ট্রগুলির সম্মতি হল আন্তর্জাতিক আইনের মূল উৎস। ওলন্দাজ ব্যবহারশাস্ত্রজ্ঞ বারম্বার বলেছেন, দেশের অভ্যন্তরীণ আইন মানতে লোকে যেমন বাধ্য, আন্তর্জাতিক আইন মানতেও জাতিরা তেমনি বাধ্য।

যুদ্ধ সাধারণভাবেই অননুমোদনীয়, এমন মত পোষণ করতেন না গ্রটিয়াস। তিনি মনে করতেন 'শুধু সেই বলপ্রয়োগটা নিষিদ্ধ যা সমাজের সঙ্গে খাপ খায় না, অর্থাৎ যা অপরের অধিকার লঙ্ঘন করে।'** তাই সমস্ত যুদ্ধই জনগণের আইন, তথা স্বাভাবিক বিধি, ইতিহাস, খ্রিস্টের বিধির বিরোধী এমন নয়।

গ্রটিয়াসের কাছে যুদ্ধ হল সংগ্রামের অবস্থা, রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে সশস্ত্র সংঘর্ষ। তাকে তিনি ন্যায় ও অন্যায় যুদ্ধে ভাগ করেছেন। জনগোষ্ঠী যখন যুদ্ধ চালায় নিজেদের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার জন্য, স্বাভাবিক বিধির বিরুদ্ধে তা যাচ্ছে না, তখন তা ন্যায় বলে গণ্য। তিনি লিখেছেন: 'আমাদের জানা সমস্ত জনগোষ্ঠীর আইন অনুসারে, আক্রমণের বিপদ দেখা দিলে অস্ত্র হাতে যে নিজের জীবন রক্ষা করে সে নির্দোষ।'*** দখলদারি যে যুদ্ধ চালানো হয় স্বার্থপরতাবশে, অপরের উর্বর ভূমি ও অন্যান্য সম্পদ হরণের জন্য, অন্য জাতিকে দাস করার উদ্দেশ্যে, সেটাকে গ্রটিয়াস মনে করতেন অন্যায় যুদ্ধ। প্রতিবেশী যে রাষ্ট্র আক্রমণের সংকল্প করে নি, তার ক্রমবর্ধমান শক্তিতে অকারণ ভয় পেয়ে যে যুদ্ধ প্রস্তুতি, সেটাও অন্যায়। অন্যায় যুদ্ধের ফলাফলের জন্য তার প্ররোচকদের দায়ী করেছেন গ্রটিয়াস।

ন্যায় ও অন্যায় ছাড়াও সর্বসাধারণী, ব্যক্তিগত ও মিশ্র -- যুদ্ধের এই তিনটে উপবিভাগও তিনি করেছেন। সর্বসাধারণী যুদ্ধ আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক দুই হতে পারে। আনুষ্ঠানিক যুদ্ধ কেবল ন্যায় ও আইনসঙ্গতই নয়। আরো প্রয়োজন, প্রথমত, উভয় পক্ষ থেকে যেন যুদ্ধ চালানো হয় রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতা যাদের ওপর ন্যস্ত তাদের ইচ্ছায় এবং দ্বিতীয়ত, নির্দিষ্ট কিছু রীতি যেন মেনে চলা হয়।

অনানুষ্ঠানিক সর্বসাধারণী যুদ্ধ হতে পারে রীতিনীতি ও অনুষ্ঠানাদি থেকে মুক্ত, তা চালানো হয় ব্যক্তিবিশেষ বা রাষ্ট্রের যেকোনো পদাধিকারীর ক্ষমতার বিরুদ্ধে। গ্রটিয়াস সিদ্ধান্ত করেছেন প্রত্যেক কর্মকর্তাই যেমন তাঁর নিকট ভারার্পিত জনগণের রক্ষার জন্য, তেমনি ক্ষমতা জারি করার জন্য 'প্রতিরোধ দেখা দিলে যুদ্ধ চালাবার অধিকারী'*।

ব্যক্তিগত যুদ্ধ চালায় এমন লোক যে ক্ষমতার ভার পায় নি। মূল তার বহু অতীতে প্রোথিত, স্বাভাবিক বিধির বিরোধী তা নয়, কারো পক্ষ থেকে বলপ্রয়োগের উপক্রম হলে এ যুদ্ধ তা প্রতিহত করে। এ যুদ্ধ নিষিদ্ধ হতে পারে বিচারালয়ের সিদ্ধান্তে। কিন্তু আইন বলবৎ হয় যখন বিচারালয়ের আশ্রয় নেবার সুযোগ থাকে। সমুদ্রে, মরুভূমিতে, অনধ্যুষিত অঞ্চলে বিচারের কোনো সংস্থা নেই। অন্য কারো পক্ষ থেকে জুলুমের চেষ্টা হলে নাগরিক নিজেই আত্মরক্ষা করে। এ ধরনের ঘটনাকে গ্রটিয়াস বলেছেন যুদ্ধ, তাতে করে যুদ্ধকে রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে সশস্ত্র সংঘাত বলে তিনিই যে সংজ্ঞা দিয়েছিলেন সেটাই পালটে যাচ্ছে। এখানে তিনি প্রয়োজনীয় প্রতিরক্ষা এবং বলপ্রয়োগে লঙ্ঘিত আইনের পুনঃপ্রতিষ্ঠাকে যুদ্ধের সঙ্গে এক করে দেখছেন। যে যুদ্ধ একদিক থেকে সর্বসাধারণী, অন্য দিক থেকে ব্যক্তিগত, তাকে গ্রটিয়াস বলেছেন মিশ্র।

তাঁর মতে, যুদ্ধে অতি নিষ্ঠুরতম ব্যবস্থা গ্রহণ স্বাভাবিক বিধির পরিপন্থী নয়। কিন্তু যুদ্ধে যারা দৈবাৎ অথবা বাধ্য হয়ে শত্রুপক্ষে গিয়ে পড়েছে, তাদের প্রতি উদারতা প্রদর্শনের দাবি জানিয়েছেন তিনি, যুদ্ধের প্ররোচক ও তাদের অধীনস্থদের মধ্যে তফাৎ করেছেন। যুদ্ধবন্দী, নারী, বৃদ্ধ, শিশুদের প্রতি মানবিক আচরণের দাবি করেছেন তিনি, যুদ্ধ চালাবার পদ্ধতি হিশেবে দেশ ছারখার করায় আপত্তি জানিয়েছেন।

অন্যায়, দখলদারি যুদ্ধের নিন্দা করতে গিয়ে তিনি এই বলেও সতর্ক

করে দিয়েছেন যে ন্যায় যুদ্ধও শুরু করা উচিত ভেবেচিন্তে, সাবধানে। যে কলহ যুদ্ধে পরিণত হতে পারে, তার মীমাংসা শান্তিপূর্ণ পথেই শ্রেয় বলে তিনি মনে করেন। এইরকম শান্তিপূর্ণ তিনটি পথের উল্লেখ করেছেন তিনি: (১) আলাপ-আলোচনা; (২) সালিশী আদালত; (৩) লটারি।

যুদ্ধ সীমিত রাখার ব্যাপারে স্বাভাবিক বিধির দাবিতে খুবই গুরুত্ব দিয়েছেন গ্রটিয়াস। শাসক ও জনগণ কেবল আইনের ধারায় আবদ্ধ তাই নয়, সদাচার ও নীতিশাস্ত্রের দাবিও তাদের মানতে হবে। যুদ্ধের কারণ যে লোকেদের কুপ্রবৃত্তিতে নিহিত, বিশেষ করে তাদের ভোগ-লালসা, লোভ, মাত্রাধিক অহংকার আর ক্ষমতাপ্রিয়তায়, প্লুটার্কের এই বক্তব্যের সঙ্গে তিনি একমত। সমস্ত বুর্জোয়া ভাবাদর্শীর মতো গ্রটিয়াসও যুদ্ধ প্ররোচকদের এই ধরনের ব্যক্তিগত দোষের পেছনে রাষ্ট্রে তাদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থান, ব্যক্তিগত মালিকানার আধিপত্য, যুদ্ধে আগ্রহী শোষক শ্রেণীগুলির পলিসির প্রভাব দেখতে পান নি।

গ্রটিয়াসের আন্তর্জাতিক আইনের যা ধারণা, তাতে স্বাভাবিক নিয়মের ভিত্তিতে রাষ্ট্রগুলির মধ্যে চুক্তি পালনের ডাক দেয়া হয়েছে। ব্যক্তিগত অধিকার লঙ্ঘিত হয় যে অন্যায় যুদ্ধে তা নিষিদ্ধ করার দাবি তুলেছেন তিনি; শত্রুর সম্পত্তি ধ্বংস করা, বেসামরিক জনগণের প্রতি অন্যায় নিষ্ঠুরতা থেকে বিরত থাকতে হবে যুধ্যমান পক্ষদের।

গ্রটিয়াস তাঁর প্রধান গ্রন্থ 'যুদ্ধ ও শান্তির আইন বিষয়ে' শেষ করেছেন 'বিবেকবত্তা ও শান্তি অনুসরণের জন্য একান্ত আবেদন জানিয়ে উপসংহার' দিয়ে। যারা ক্ষমতাসীন তাদের তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে চুক্তির প্রতি বিশ্বস্ত থাকা উচিত, 'প্রত্যাশিত বিজয়ের চেয়ে শান্তি ভালো ও নিরাপদ'*। অ্যারিস্টটল, সিসেরো, সেনেকার যুক্তি উদ্ধৃত করে তিনি বলেছেন যে বিবেক লোপ পেলে মানুষ হয়ে দাঁড়ায় বন্য পশুর মতো। লোকেদের মধ্যে যে সুসম্পর্ক থাকার কথা, রাষ্ট্রে রাষ্ট্রেও তাই থাকা উচিত, এই যে ধারণাটা পরে শান্তি আন্দোলনের অনুগামীদের মধ্যে, যুদ্ধবিরোধীদের মধ্যে প্রসার লাভ করে, সেটার প্রবর্তন ও সূত্রবন্ধন করেন তিনি। কথাটাকে তিনি প্রকাশ করেছেন এই ভাষায়: 'ব্যক্তিমানুষদের মৈত্রী সম্পর্কে যে কথা আগে বলা হয়েছে... তা একই ভাবে প্রসারিত হতে পারে সর্বসাধারণী ক্ষেত্রেও'**।

গ্রটিয়াসের 'যুদ্ধ ও শান্তির আইন বিষয়ে' গ্রন্থে প্রথম সংরচিত হয় আন্তর্জাতিক আইন ব্যবস্থার মূল সমস্যাদি। তাঁর ধারণার তাৎপর্য এই যে তিনি জাতিতে জাতিতে সম্পর্ককে আইনী ভিত্তির ওপর স্থাপন করার চেষ্টা করেছিলেন। আন্তর্জাতিক আইন বিদ্যার পরবর্তী বিকাশের যাত্রাবিন্দু হয়ে দাঁড়ায় তাঁর ধারণাগুলি।



§ ৫। বেনেদিক্ত স্পিনোজা

রাষ্ট্র ও আইন সংক্রান্ত সমস্যাদির সংরচনে, রাজনৈতিক-ব্যবহারশাস্ত্রীয় ব্যাপারাদির পদ্ধতিবিদ্যায় বৃহৎ অবদান রেখেছেন হুগো গ্রটিয়াসের কনিষ্ঠ সমকালীন, তাঁর স্বদেশবাসী, মহান ওলন্দাজ বস্তুবাদী দার্শনিক বেনেদিক্ত (বারুখ) স্পিনোজা (১৬৩২-১৬৭৭)। রাজনৈতিক ও আইনী চিন্তার বিকাশের ইতিহাসে রীতিমতো ছাপ ফেলেছে তাঁর 'ঈশ্বরতাত্ত্বিক-রাজনৈতিক ভাষ্য', 'নীতিশাস্ত্র', 'রাজনৈতিক ভাষ্য' প্রভৃতি রচনা।

স্পিনোজার তাত্ত্বিক চৈতন্য গঠনে প্রভাব ফেলেছে দেকার্তের ধারণা, রাষ্ট্রবিরোধী মনোভাবাপন্ন কিছু কোয়েকার গোষ্ঠীর সর্বেশ্বরবাদী দৃষ্টিভঙ্গি [৫]। হবসও তাঁকে

কম প্রভাবিত করেন নি, বিশেষ করে সামাজিক চুক্তি, রাষ্ট্রের প্রকৃতি ইত্যাদির বোধে। স্পিনোজার দৃষ্টিভঙ্গির গঠনে ও প্রস্তাবাদিতে প্রাচীন কালের সুবিখ্যাত গণিতবিদ ইউক্লিডিসের জ্যামিতিক আদর্শেরও একটা ছাপ আছে।

আইন ও রাষ্ট্র বিষয়ে স্পিনোজার বিশ্ববীক্ষার মূলে আছে এই প্রথা-প্রতিষ্ঠানগুলিকে প্রকৃতির অঙ্গ বলে ধরার ধারণা। প্রকৃতি নিজেই নিজের কারণ হওয়ায় কোনো কিছুর বা কারো প্রয়োজন তার নেই। তা প্রকাশ পায় রাশি রাশি অশেষ অদল-বদলে। ব্যাপারটা যখন এইরকম, তখন, স্পিনোজার মতে, প্রকৃতির ব্যাখ্যা করতে হবে প্রকৃতি থেকেই: প্রকৃতির অন্তর্নিহিত অভ্যন্তরীণ শক্তি, তার ভেতর সক্রিয় কার্য-কারণ সম্পর্ক, অবজেকটিভ নিয়মবদ্ধতা দিয়ে। এই সাধারণ পদ্ধতিগত দৃষ্টিভঙ্গি পুরোপুরি রূপ নিয়েছে রাজনীতি, রাষ্ট্র ও আইনের ক্ষেত্রে লোকেদের ক্রিয়াকলাপ নিয়ে স্পিনোজার গবেষণায়।

সমস্ত প্রকৃতির ওপর আধিপত্যকারী সর্বোচ্চ যে নিয়ম, সেটা হল আত্মরক্ষার নিয়ম। তার অধীনস্থ হয়ে প্রত্যেকটি ব্যাপার নিজের সত্তা প্রতিষ্ঠায় চেষ্টিত। লোকেরাও ('প্রকৃতির কণিকা') যতটা পারে তার চেষ্টা করে। অস্তিত্ব নিশ্চিত হয় শক্তিতে। অস্তিত্বের সূচনা এবং জাড্যের নিয়ম অনুসারে তার প্রলম্বনের জন্য এ শক্তি প্রয়োজন, এই নিয়ম ক্রিয়াশীল যেমন পদার্থীয় তেমনি সামাজিক জগতেও। প্রকৃতির শক্তি, পরাক্রমই হল প্রকৃতির আইন। ব্যক্তির শক্তি, পরাক্রম তার স্বাভাবিক বিধির সমার্থক। আইনের আয়তন এই শক্তির সমতুল্য: 'প্রতিটি ব্যক্তির ততটা আইন থাকে, যতটা তার শক্তি'।

স্পিনোজা তাদের সঙ্গে বিতর্কে নামেন যারা মনে করে ব্যক্তির স্বাভাবিক বিধির উৎস হল প্রজ্ঞা, সদাচার ইত্যাদির প্রতিমূর্তি যুক্তি। তাঁর মতে, স্বাভাবিক বিধি লোকেদের বিচিত্র আকর্ষণে, রিপুতে নিহিত। আবেগ, উন্মত্ততা যার দ্বারা লোকে (স্বতন্ত্র ব্যক্তি) আত্মরক্ষা ও আত্মপ্রতিষ্ঠায় চেষ্টিত, তা স্বতন্ত্র ব্যক্তির ক্রিয়াকলাপ চালিত করে। মানুষের ঝোঁক প্রায়ই এমন যে লোকে পরিণত হয় শত্রুতে, সমাজে সংঘর্ষ জাগিয়ে তোলে, প্রতিটি স্বতন্ত্র ব্যক্তির যে স্বাভাবিক বিধি আছে, তা কাজে লাগানো অসম্ভব হয়ে ওঠে।

এখন পরিষ্কার বোঝা যায় যে স্পিনোজা লোকেদের সামাজিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার উদ্ভব ও কারণ ব্যাখ্যায় মনস্তাত্ত্বিক ভাষ্যই দিয়েছেন, যাতে

ঐতিহাসিক মূর্ত-নির্দিষ্টতা ও শ্রেণীগত প্রভেদাত্মক দিক নেই। তবে দুটো ব্যাপার ভোলা অনুচিত। প্রথমত, এই ব্যাখ্যান ছিল বাস্তব সমস্যা ও সামাজিক জীবনের বিরোধগুলি নিয়ে যুক্তিবাদী চিন্তার একটা উপায়। দ্বিতীয়ত, তার সাহায্যে বিভিন্ন গ্রুপ ও ব্যক্তির স্বার্থের মধ্যে সংগ্রামের যে চেতনায় তিনি উপনীত হন, তা সতেরো শতকের মাঝামাঝি পশ্চিম ইউরোপীয় বিজ্ঞানে অবজেকটিভ ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিকতার যে নিরিখ গড়ে উঠেছিল, তার সঙ্গে পুরোপুরি মেলে।

স্পিনোজার মতে, লোকে অস্তিত্ব বিসর্জন দিচ্ছে, যে পরিস্থিতিতে সবাই একেবারে সবকিছুই করতে পারে এবং কেউ-ই নিজেকে নিরাপদ মনে করে না। প্রত্যেকের প্রকৃতিপ্রদত্ত যে অধিকার আছে সেটা মিলিতভাবে ভোগ করা তাদের পক্ষে সুবিধাজনক ও হিতকর। কিন্তু তার জন্য দরকার রিপুর বিশৃঙ্খল খেলাকে বন্ধ করা, ব্যক্তিগত মর্জিকে সংযত করা। একটা অখণ্ড গোষ্ঠীতে ঐক্যবদ্ধ হওয়া উচিত লোকেদের, নিজেদের ক্রিয়াকর্মে অনুসরণ করা উচিত সাধারণ অভিপ্রায়। একত্র ও শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবনে, নাগরিকত্বের অবস্থায় তাদের ঠেলে দেয় পরস্পরের উপকার করার চাহিদা, 'পারস্পরিক সাহায্যে', যা আসছে সমাজের সদস্যদের মধ্যে শ্রম বিভাগ থেকে। নাগরিক অবস্থাতে উত্তরণের পূর্বশর্ত যথেষ্টেরও বেশি গড়ে উঠছে, এ নিয়ে লোকেদের এখন একটা চুক্তি গ্রহণ করাই বাকি।

স্পিনোজার মধ্যে 'সামাজিক চুক্তির' অনুগামী ও মৌলিক ব্যাখ্যাকার দেখা দিয়েছে। অবশ্য, 'সামাজিক চুক্তি' কথাটা মনীষী ইতিহাসের 'প্রাক্‌সামাজিক' পর্যায় থেকে নাগরিক ব্যবস্থায়, রাষ্ট্রপাটে উত্তরণের পার্থক্য রেখা হিশেবে মোটেই বোঝান নি। এমন একটা পর্যায় সত্যিই আছে কিনা, তা নিয়ে গুরুত্ব সহকারে ভাবেন নি তিনি। উল্টে বরং, তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে কার্যক্ষেত্রে ব্যক্তি অবিরাম বাস করেছে ও করছে নির্দিষ্ট এক-একটা গোষ্ঠীতে; এ গোষ্ঠী হল রাষ্ট্রিক-সাংগঠনিক সহবসতি। 'যেমন বর্বরেরা, তেমনি সভ্যেরা, সমস্ত লোকেই সর্বত্রই থাকে আদান-প্রদানের মধ্যে এবং সৃষ্টি করে কিছু কিছু নাগরিক অবস্থা'*। তাঁর মতে, প্রকৃতিগতভাবে লোকে নাগরিক অবস্থার জন্য চেষ্টিত, তা থেকে লোকে একেবারে বেরিয়ে এল, এ কখনো ঘটতে পারে না। এই

বিচারে পরিষ্কার ফুটে ওঠে যে তার সেরা প্রতিনিধিদের মধ্যেও ১৭ শতকের সামাজিক চিন্তা সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে পার্থক্য করার স্তরে সমগ্রভাবে এখনো উঠতে পারে নি, তাদের প্রত্যেকটির বৈশিষ্ট্য বোঝার পর্যায়ে পৌঁছয় নি।

'সামাজিক চুক্তি' বর্গটা স্পিনোজার প্রয়োজন হয়েছিল প্রথমত স্বাভাবিক বিধি ও রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্কের চরিত্রটা প্রকাশ করার জন্য। সেটাকে সাতিশয় সুস্পষ্ট ও বিশ্বাসযোগ্য করার জন্য তিনি এগিয়েছেন 'উল্টো পথে'। দার্শনিক এই প্রশ্ন তুলেছেন: লোকে যদি নাগরিক অবস্থায় নয়, 'স্বাভাবিক', রাষ্ট্রহীন অবস্থায় গিয়ে পড়ে, তাহলে কী হত তাদের। এর জবাবটাকে তিনি কাজে লাগিয়েছেন রাষ্ট্রের মর্মার্থ, কাজ ও লক্ষ্য ব্যাখ্যা, বিভিন্ন ধরনের রাষ্ট্রপাটের তুলনা, জনসাধারণী শাসনের বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন, মানুষ (লোকজন) ও রাষ্ট্রের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের নীতির মূল্যায়নে একটা উপযুক্ত উপলক্ষ হিশেবে।

স্বতন্ত্র ব্যক্তিদের বিভক্ত থাকার পরিস্থিতিতে তাদের স্বাভাবিক বিধি সুরক্ষিত থাকে না, কার্যত তা অসম্ভবই। এ বিধির সুনিশ্চিতি সম্ভব হয় কেবল স্বতন্ত্র ব্যক্তিদের একক সমগ্রে (রাষ্ট্রে) মিলিত করে। রাষ্ট্রে ঐক্যবদ্ধ প্রতিটি বিষয়ী যে তার শক্তি, তার স্বাভাবিক বিধি অর্পণ করছে, এই সমগ্রটা হল তার পরিণাম। এই অর্থে দেখলে রাষ্ট্র হল স্বাভাবিক বিধির প্রলম্বন; কিন্তু এখন তা আর পৃথক পৃথক ব্যক্তির স্বাভাবিক বিধি হিশেবে নয়, তাদের সমষ্টিরূপে, এখন থেকে তা যেন একটি প্রেরণায় চালিত। রাষ্ট্রিক ব্যবস্থার সমাজে স্বাভাবিক বিধির রাজত্ব নির্মূল না হয়ে অন্য আকার ধারণ করে।

ব্যক্তিগত স্বাভাবিক বিধি, ব্যক্তিগত শক্তির সাধারণ যোগফল হিশেবে গড়ে ওঠায় 'জনশক্তিই', স্পিনোজার মতে, হল রাষ্ট্রের মর্মার্থ। এই মর্মার্থটা বহুমুখী। কাজের নির্দিষ্ট একটা নীতি হিশেবে তা দেখা দেয় সর্বোচ্চ ক্ষমতা রূপে। রাষ্ট্রপাট হল 'দেহ', সর্বোচ্চ ক্ষমতার বৈষয়িক প্রচ্ছদ।

ব্যক্তিরা যেহেতু তাদের অনুরূপদের সঙ্গে মিলিত হয় রাষ্ট্রে, নিজেদের স্বাভাবিক বিধি তাতে অর্পণ করে, তাই সচেতনভাবেই তারা তাদের স্বাভাবিক স্বাধীনতা ছেড়ে দেয়, সর্বোচ্চ ক্ষমতার নিকট অধীনতা মেনে নেয়, সকলের মোট ক্ষমতার নিকট অধীনতা, যা এক-একজন লোকের ক্ষমতাকে অপরিমেয়রূপে ছাড়িয়ে যায়। যে এই অধীনতা এড়াতে চাইবে, তাকে সাধারণ ইচ্ছায় গঠিত 'জনশক্তির' বাধ্য হতে হবে। স্বতন্ত্র ব্যক্তি

সর্বোচ্চ ক্ষমতাকে যত বেশি তার স্বাভাবিক বিধি অর্পণ করবে, তার নিজস্ব এক্তিয়ারে থেকে যাওয়া বিধি হবে ততই কম।

স্পিনোজা এই সিদ্ধান্ত টেনেছেন: রাষ্ট্রীয় মেলে জীবনযাত্রার স্বাভাবিক পরিস্থিতি ভোগের জন্য ব্যক্তির অপরিহার্য 'দাম' হল সর্বোচ্চ ক্ষমতার নিকট পরিপূর্ণ অধীনতা। সর্বোচ্চ ক্ষমতা স্বাধিকারী। তার অর্থ এ ক্ষমতার প্রাধিকার ও সম্ভাবনার সীমা পুরোপুরি মিলে যায় তারই বাস্তব শক্তির সীমার সঙ্গে। শুধু এই ক্ষমতাই স্থির করে রাষ্ট্রে বাধ্যতামূলক ন্যায় ও অন্যায়ের নিরিখ; নির্দেশ দেয় লোকেদের কী প্রয়োজন, কী নিষ্প্রয়োজন; কেবল তাই লোকেদের ক্রিয়াকর্মের একমাত্র বিচারক ইত্যাদি। মানুষের কর্তব্য হল রাষ্ট্রের আজ্ঞা পালন করা, যদিও মনে মনে সে তার সঙ্গে একমত না হতে পারে, তাকে জ্ঞান করে অন্যায়।

তাঁর পূর্ববর্তী মাকিয়াভেলি এবং প্রায় সমকালীন হবসের মতো (হবস অবিশ্যি তাঁর প্রধান রাজনৈতিক রচনা প্রকাশ করেন কিছুটা আগে, ১৭ শতকের ৪০ ও ৫০-এর দশকে) স্পিনোজাও রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্যকে সমাজের জনক্ষমতা রূপ সংগঠন বলে উপলব্ধির সঠিক দিকে এগিয়েছিলেন। অবজেকটিভ ক্ষেত্রে তিনি এই সিদ্ধান্তে আসেন যে রাষ্ট্র কতকগুলি দিক দিয়ে তার সংগঠক লোকেদের থেকে স্বাধীন হয়ে দাঁড়ায়, নিজস্ব অনুশাসনে চলতে থাকে, প্রতিটি পৃথক লোকের জীবনধারা যে অনুশাসনে চালিত, তা থেকে সেটা পৃথক। রাষ্ট্র ও ব্যক্তিসত্তার সম্পর্ক যে আকারে প্রতিসৃত সেই আকারে স্পিনোজা সূক্ষ্মভাবে 'ধরেছেন' দ্বান্দ্বিকতার সাধারণ ও একবিধের কয়েকটি দিক। রাষ্ট্রের নিকট ব্যক্তিসত্তার অধীনতা, অসমাধিকার ইত্যাদি বলে নির্দিষ্ট সম্পর্কটির মূল্যায়নে প্রতিফলিত হয়েছে রাষ্ট্রে ব্যক্তির সত্যকার অবস্থা, মনস্বী যা জানতেন এবং অনুধাবন করেছেন। এক-একটা সামাজিক স্তর ও গ্রুপ কর্তৃক নিজেদের বিশেষ স্বার্থে সর্বোচ্চ ক্ষমতার ব্যবহার সম্পর্কে যথেষ্ট বিকশিত ধারণারও দেখা পাওয়া যায় তাঁর রচনায়। স্পিনোজা চিন্তা করেছেন বাস্তববাদীর মতো। যদিও বলা উচিত যে ১৭ শতকে পশ্চিম ইউরোপীয় রাজনৈতিক তত্ত্বের উল্লিখিত ধারণাটা অভিনব ছিল না।

স্পিনোজার মতে, সর্বোচ্চ ক্ষমতা রাষ্ট্রের মাধ্যমে কতকগুলি কর্তব্য পালনে আহূত: সহনশীলতার প্রেরণায় ধর্মীয় জীবনের শৃঙ্খলাসাধন, সম্পত্তির অলঙ্ঘনীয়তা নিশ্চিতকরণ, অবাধে ব্যবসাবাণিজ্য চালাবার গ্যারাণ্টি দান, শিক্ষা প্রসারে অংশ গ্রহণ। তাছাড়া, এ ক্ষমতার উচিত 'প্রত্যেকের

আচরণ বিচার করা, অপরাধীদের শাস্তি দেয়া, নাগরিকদের মধ্যে আইন নিয়ে কোনো প্রশ্ন উঠলে তার সমাধান করা অথবা বলবৎ আইন বিষয়ে ওয়াকিবহালদের নিযুক্ত করা, যাতে তার হয়ে ওরা ঐ ব্যাপারটা নিয়ে খাটে; তাছাড়া, যুদ্ধ (চালানো) ও শান্তি (রক্ষার) জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা স্থিরীকৃত ও গ্রহণ করা'*। রাষ্ট্রের মধ্যে স্পিনোজা দেখতে চেয়েছিলেন সমাজ জীবনকে প্রভাবিত করার মতো সক্রিয় কারিকা। এদিক থেকে রাষ্ট্রের কর্তব্য ও ভূমিকা সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ১৮ শতক ও ১৯ শতকের গোড়ার আদিবুর্জোয়া উদারনৈতিক ধারণা থেকে বেশ পৃথক, এই শেষোক্তদের মতে, রাষ্ট্রযন্ত্রের সামাজিক কাজ হল কেবল সমাজের 'নৈশ প্রহরী' হওয়া।

এরূপ লক্ষ্য সাধনে সবচেয়ে বেশি সহায়ক হয় প্রজাতান্ত্রিক-গণতান্ত্রিক ধারায় গঠিত রাষ্ট্রগুলি। নীতিগতভাবে স্পিনোজা এই ধরনের রাষ্ট্রের সমর্থক। প্রকৃতি প্রত্যেককে যে স্বাধীনতা দিয়েছে, অন্যান্য রাষ্ট্ররূপের চেয়ে এটা তার কাছাকাছি, কেননা তাতে 'ভবিষ্যতে ভোটের অধিকার থেকে নিজেকে বঞ্চিত করে প্রত্যেকে তার স্বাভাবিক বিধি অর্পণ করছে অপরকে নয়, গোটা সমাজের অধিকাংশের কাছে, যার কণিকা সে নিজে'**। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সবাই কথা কয়ে নেয় যে তারা এমনভাবে চলবে যাতে সাধারণ নির্দেশের শক্তি বর্তায় তেমন সব সিদ্ধান্তে যার পেছনে আছে অধিকাংশের ভোট এবং ব্যক্তিগত ও সামাজিক স্বার্থ যাতে মেলে। গণতন্ত্র সম্পর্কে তাঁর ধারণা ও তার প্রতি তাঁর আনুগত্যে স্পিনোজা বহু পরিমাণে ১৮ শতকের প্রখ্যাত ফরাসি রাজনৈতিক মনীষী রুসোর পূর্বসূরী।

প্রজাতান্ত্রিক-গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে বাঞ্ছনীয় মনে করলেও স্পিনোজা সেইসঙ্গে অন্যান্য রাজনৈতিক রূপেরও আইনসঙ্গতি মেনেছেন। বিশেষ করে রাজতান্ত্রিক শাসনের, তাঁর সময়ে সেটা ছিল ক্ষমতাকে রাষ্ট্রে সংগঠিত করার সবচেয়ে প্রচলিত উপায়। তাঁর মতে, রাজতন্ত্র সেক্ষেত্রে গ্রহণীয় যেখানে সার্বভৌমের ইচ্ছা অবশ্য-অবশ্যই পরিপূরিত ও সীমিত হচ্ছে জনগণের ইচ্ছা দ্বারা, যারা কোনো না কোনো ভাবে শাসন চালনায় অংশ নিচ্ছে। রাজার অধীনে শাসক পরিষদের নেতৃত্বে অধিকারধারী প্রতিষ্ঠানাদির পুরো একটা ব্যবস্থাকে দেশ চালনায় নাগরিকদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে

হবে। এই ব্যবস্থায় শুধু জনগণের স্বাধীনতা রক্ষা সম্ভব হবে তাই নয়, রাষ্ট্রের দৃঢ়তাও পুষ্ট হবে।

সর্বোচ্চ ক্ষমতা অবিভাজ্যরূপে কেবল একজন লোকের হাতে থাকবে, স্পিনোজা এর ঘোর বিরোধী। এ অবস্থার বিরোধী তিনি নানা কারণে: এক ব্যক্তির মর্জি অত্যন্ত পরিবর্তনশীল ও অস্থায়ী, একজনের শাসন আনুষঙ্গিক নানা ঘটনাচক্রে (পীড়া, সার্বভৌমের স্থবিরতা ইত্যাদি) মুশকিলে পড়ে, একজনের হাতে সমস্ত ক্ষমতার কেন্দ্রীভবনে নাগরিক নিক্ষিপ্ত হয় অধিকারহীনতার অবস্থায়। এক ব্যক্তির নিরঙ্কুশ শাসন বাঞ্ছনীয়, কেননা রাষ্ট্রে তা নিশ্চিন্ততা ও শৃঙ্খলার ব্যবস্থা করতে পারে, নিশ্চিত করতে পারে শান্তি, এ যুক্তি মনীষী অস্বীকার করেন। পাঠকদের স্পিনোজা জিজ্ঞাসা করেছেন: 'স্বৈরশাসনের রাষ্ট্রে যে দাসত্ব, বর্বরতা, শূন্যতার রাজত্ব, তাকে কি আপনারা শান্তি বলতে শুরু করবেন? এমন শান্তির চেয়ে লজ্জাকর কোনো কিছু কল্পনা করা কঠিন'*।

পরম ক্ষমতার ওকালতির বিপরীতে দার্শনিক পেশ করেন ব্যক্তির অনপহরণীয় অধিকারের ধারণা, সর্বোচ্চ ক্ষমতা তাতে সংকুচিত হয়। এ ক্ষমতার অধিকার সেখানেই শেষ যেখানে শেষ হয় কার্যত এ অধিকারের শক্তি। সর্বোচ্চ ক্ষমতা যতই পরাক্রান্ত হোক, তা সবকিছু এবং সেইভাবে করতে অক্ষম যা তার ইচ্ছে হচ্ছে। মানবিক প্রকৃতির নিয়ম থেকে অবশ্য-অবশ্যই যা আসে, তা উপেক্ষা করতে সে পারে না। প্রকৃতিগতভাবেই স্বতন্ত্র ব্যক্তি এমন যে, দৃষ্টান্তস্বরূপ, তার স্বাভাবিক অধিকার পুরোপুরি ত্যাগ করা তার পক্ষে অসম্ভব, নইলে সে আর মানুষ থাকে না। এগুলির মধ্যে সর্বাগ্রে পড়ে অস্তিত্ব ও ক্রিয়াকলাপের অধিকার, বিবেক ও চিন্তার স্বাধীনতা ('প্রকৃতির মহত্তম বিধিতে প্রত্যেকেই স্বীয় চিন্তায় প্রভু'**। এভাবে সর্বোচ্চ ক্ষমতার হাতে কেউই সবকিছু তুলে দিতে পারে না। তবে, স্পিনোজা মনে করেন, তার প্রয়োজনও নেই। মানুষের অনপহরণীয় অধিকার দমন রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ স্বার্থের কোনো অজুহাতেই ক্ষমার্হ নয়।

প্রকৃতির যেসব নিয়ম রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে তাদের ক্রিয়াকলাপ প্রসারিত করছে, সর্বোচ্চ ক্ষমতা তার অধীন হতে বাধ্য। রাষ্ট্রে জারি করা আইন অবশ্য পালনীয়। তবে এরূপ পালন বাস্তব ঘটনা হয়ে ওঠে, যদি তা লোকেদের মধ্যে শাস্তির ভয় ততটা নয়, যতটা কোনো একটা কাম্য কল্যাণের

আশা জাগায়; তখন প্রত্যেকেই সাগ্রহে পালন করবে রাষ্ট্রের নির্দেশ। 'এটা দৃষ্টিচ্যুত করা অনুচিত যে অধিকাংশকে যা রুষ্ট করে, তা রাষ্ট্রের আইনের মধ্যে পড়ে সবচেয়ে কম'*। স্পিনোজার গণতান্ত্রিকতা এখানেও প্রতিফলিত।

রাজনৈতিক-ব্যবহারশাস্ত্রীয় ব্যাপারের প্রজ্ঞানের ক্ষেত্রে স্পিনোজা যে পদ্ধতি প্রণয়ন করেছেন, তা রাষ্ট্র ও আইন বিষয়ক বিদ্যায় রীতিমতো একটা অগ্রপদক্ষেপ। রাষ্ট্র ও আইনের অধ্যয়নে প্রকৃতিবাদী মনোভাব অবলম্বনে তিনি প্রথমদেরই একজন, এগুলিকে তিনি প্রাকৃতিক শক্তির ব্যবস্থা বলে ব্যাখ্যা করেছেন, যা সমগ্র বিশ্বের আরো সাধারণ যন্ত্রব্যবস্থার অঙ্গাঙ্গি। এই পথে এমন রাজনৈতিক রূপের সন্ধান চলে যার কাঠামোর মধ্যে সামাজিক জীবনের কর্তব্য ও লক্ষ্যের রূপায়ণ আপতিক ঘটনার খেয়াল-খুশি, শাসকের মর্জি ও লোকহিতৈষার ওপর নির্ভর করবে না, তা ঘটবে আপনা-আপনি, সমাজের সুযৌক্তিক রাষ্ট্রিক-আইনী সংগঠনের নীতিগুলির ক্রিয়ায়। এমন নীতি স্পিনোজা নিষ্কাশিত করতে চেয়েছেন 'মানবিক প্রকৃতির গঠন থেকেই'। দার্শনিক যে পর্বে বেঁচে ছিলেন ও কাজ করেছেন, তখন নুবিদ্যাপ্রবণতা বাধা দেয় নি, বরং সাহায্যই করেছে রাজনৈতিক ক্ষেত্রটা নিয়ে যৌক্তিক চিন্তায়।

রাষ্ট্র ও আইন বিষয়ে প্রজ্ঞানের যে পদ্ধতি স্পিনোজা রচনা করেন তা হল কেপলার আর গ্যালিলিও, নিউটন আর হিউগেন্স, হার্ভেই আর পাস্কাল প্রভৃতি মহা মহা প্রকৃতিবিজ্ঞানীর বৈজ্ঞানিক কৃতিত্ব বিশ্বের একেবারেই যে নতুন বোধের উদ্বোধন করে ১৭ শতকে, তাকে রাজনৈতিক-ব্যবহারশাস্ত্রীয় গবেষণায় প্রবর্তনের একটা সফল পরীক্ষা। অবশ্যই রাষ্ট্র ও আইনের ব্যাখ্যায় প্রকৃতিবাদী মনোভাব আধিবিদ্যকতায় খুবই দুষ্ট এবং নিজের পরিসীমার মধ্যে রুদ্ধ করে রাখে এইসব ঘটনার সামাজিক (অর্থনৈতিক, শ্রেণীগত ইত্যাদি) নির্ধারক কী তার আবিষ্কার। কিন্তু তখন তার ন্যায্যতা ছিল। রাজনৈতিক-ব্যবহারশাস্ত্রীয় 'জগৎটা' যে অবজেকটিভ প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন, এই দিকটার ওপর প্রচন্ড জোর না দিলে পরবর্তী কালে, সামাজিক বিকাশের অনেক বেশি উঁচু স্তরে এবং দ্বান্দ্বিক-বস্তুবাদী দর্শনের অবস্থান থেকে রাষ্ট্র ও আইনের মধ্যে শ্রেণী সমাজের স্বাভাবিক-ঐতিহাসিক ভাবে দানা বেঁধে ওঠা ও বিকাশমান প্রথা-প্রতিষ্ঠানগুলির উদ্ঘাটন বড়ো একটা সম্ভব হত না।



§ ৬। টমাস হবস

টমাস হবস (১৫৮৮-১৬৭৯) হলেন আধুনিক কালের প্রথম লেখক যিনি স্বাভাবিক বিধির ভিত্তিতে রাষ্ট্র বিষয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ ও প্রণালীবদ্ধ মতবাদ বিকশিত করেন। স্টুয়ার্ট রাজবংশের সঙ্গে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের তীব্র সংগ্রামের যুগে তাঁর আবির্ভাব। পার্লামেণ্টে প্রকাশ পেয়েছিল প্রগতিশীল শ্রেণীদের, শহুরে বুর্জোয়ার স্বার্থ, যারা নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ এবং সামন্তদের রাজনৈতিক প্রাধান্যের অবসানে আগ্রহী, পার্লামেণ্ট ছিল কৃষক সম্প্রদায় ও শহরবাসীদের স্বার্থের প্রকাশক। রাজার পক্ষপাতী ও পার্লামেণ্টের পক্ষপাতীদের মধ্যে গৃহযুদ্ধে ইংলণ্ড ভাগ হয়ে যায় দুই শত্রু শিবিরে, যা বজায় ছিল ১৬৪৯ সালে রাজা প্রথম চার্লসের মৃত্যুদণ্ডের পরেও।

হবস ছিলেন বেকনের বস্তুবাদী দর্শনের অনুগামী। বেকনের কাছে বিশ্ব জীবনের নিয়ম হল বলবিদ্যার নিয়ম, কিন্তু সামাজিক পরিবেশে প্রয়োগের ক্ষেত্রে তিনি তা বিকশিত করেন নি। সেটা করেন হবস। তাঁর দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি রাজনৈতিক মতবাদের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। তাঁর 'নাগরিক' ও 'লেভিয়াথান' গ্রন্থদুটি রচিত রাষ্ট্রিক ও সামাজিক ব্যবস্থা নিয়ে।

প্রকৃতির গড়া স্বাভাবিক দেহ থেকে রাষ্ট্রের পার্থক্য হল তা মানুষের গড়া, কৃত্রিম একটা দেহ বলে হবস মনে করেন। রাষ্ট্রের কাজ চলে বলবিদ্যার নিয়ম মেনে, এ হল একটা জটিল যন্ত্রব্যবস্থা, তাকে বোঝা যাবে মনে মনে তার অঙ্গগুলিকে বিচ্ছিন্ন করে। হবস মনে করেন এ যন্ত্রব্যবস্থার মৌল কণিকা হল মানুষ। রাষ্ট্র একটা চিরন্তন ব্যাপার নয়। তার আগে লোকেরা ছিল স্বাভাবিক অবস্থায়, লোকেদের প্রকৃতিজাত স্বাভাবিক নিয়ম দ্বারা চালিত।

মানুষ জন্মগতভাবেই স্বার্থপর ও আত্মস্বাতন্ত্র্যপ্রিয় এই বুর্জোয়া ধারণাটা হবসের মতবাদে প্রতিফলিত। প্রত্যেকেই নিজের জন্য চায় মঙ্গল, এড়ায় অমঙ্গল। নিজের জন্য যা প্রয়োজনীয় বোধ হচ্ছে, স্বাভাবিক অবস্থায় তা পাবার অধিকার আছে প্রত্যেকেরই।

১৬৫১ সালে প্রকাশিত হয় হবসের সর্বাধিক তাৎপর্যপূর্ণ রচনা — 'লেভিয়াথান', এতে তিনি তাঁর রাজনীতির ও রাষ্ট্রের তত্ত্ব উপস্থিত করেছেন সবচেয়ে পূর্ণাকারে ও পরিসমাপ্ত রূপে। বইটি চার অংশে বিভক্ত: ১) মানুষ; ২) রাষ্ট্র; ৩) খ্রিস্টীয় রাষ্ট্র; ৪) তমসার রাজ্য।

হবসের মতে, মহা লেভিয়াথান — রাষ্ট্র হল মানুষের কারিগরির ফল। সেইসঙ্গে রাষ্ট্র বা লেভিয়াথান হল অতিকায়, সর্বশক্তিমান এক কৃত্রিম মানুষ। যাজকতন্ত্রী ও রাজভক্ত লেখকেরাও রাষ্ট্রের তুলনা দেন কৃত্রিম মানুষের সঙ্গে, যার মস্তিষ্কের কাজ চালায় রাজা, দেহের কাজটা — প্রজারা। তবে তাঁদের থেকে হবসের পার্থক্য হল এই যে রাষ্ট্র তাঁর কাছে আলাদা আলাদা লোকের একটা যান্ত্রিক সংযুক্তি, তার মোট ফল হল একটা বিশাল শক্তি। সর্বোচ্চ যে ক্ষমতা সারা দেহে জীবন ও গতি সঞ্চার করে, হবসের কাছে সেটা হল কৃত্রিম প্রাণ। বিচার ও প্রশাসন বিভাগের লোক সমেত কর্মকর্তারা হল হাড়ের কৃত্রিম জোড়। পারিতোষিক ও শাস্তি দানে স্নায়ুর কাজ সম্পন্ন হয়।

রাষ্ট্রিক অবস্থার আগে ছিল লোকেদের স্বাভাবিক অবস্থা, সেখানে

তাদের জীবন চালিত হত কেবল স্বাভাবিক নিয়মে। মানুষ এমন এক জীব, জন্মগতভাবেই যার ঝোঁক সামাজিক জীবনের দিকে, এ মত অগ্রাহ্য করেন হবস। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে মানুষ প্রকৃতিগতভাবেই হিংস্র ও স্বার্থপর, প্রত্যেকেই তাদের সমাজ খোঁজে যাদের কাছ থেকে বেশি লাভ ও সম্মান পাওয়া যাবে। তিনি লিখেছেন: 'সমাজে ঐক্যবদ্ধ হবার আগে লোকেদের স্বাভাবিক অবস্থায় চলত যুদ্ধ... সবার সঙ্গে সবার যুদ্ধ'*। খোদ প্রকৃতিই প্রত্যেককে সবকিছুর অধিকার দিয়েছে, আর এটা ছিল কোনো আইন না থাকারই সমতুল্য। সবার সঙ্গে সবার যুদ্ধের স্বাভাবিক অবস্থায় অন্যায় হতে পারত না, কেননা ন্যায় আর অন্যায় — এটা সমাজবদ্ধ লোকেদের গুণাগুণ। সেখানে সম্পত্তি ছিল না, মালিকানা ছিল না, তোমার আমার মধ্যে সুনির্দিষ্ট পার্থক্য ছিল না; 'নেই সাধারণ ক্ষমতা, নেই আইন, আর যেখানে আইন নেই, সেখানে অন্যায়ও নেই কিছু'**।

'লেভিয়াথান'এ হবস সে সময়কার পক্ষে প্রগতিশীল হুগো গ্রটিয়াস ও স্বাভাবিক বিধির স্কুল ও রাষ্ট্র উদ্ভবের চুক্তি তত্ত্ব বিষয়ে অন্যান্যদের তত্ত্বগুলি মূলত গ্রহণ করলেও সেগুলিকে মিলিয়েছেন মানুষের প্রকৃতি সম্পর্কে মাকিয়াভেলি এবং তাঁর সমকালীন গুইচার্দিনির দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে, যাঁরা বুর্জোয়া সমাজ সম্পর্কের ভিত্তিতে শক্তির তাৎপর্যই প্রধান বলে মনে করতেন। তাঁরা ঘোষণা করেন যে অতীতে, বর্তমানে, ভবিষ্যতে — সর্বকালেই আইন শক্তিশালীর পক্ষে, আইন হল শক্তি।

যেমন, গুইচার্দিনি লিখেছেন: 'রাষ্ট্র ও ক্ষমতা প্রজাদের উপর বলপ্রয়োগ ছাড়া আর কিছু নয়'***।

এই প্রসঙ্গে মার্কস লিখেছেন: 'আরো আগেকারদের কথা না বললেও আধুনিক কালের মাকিয়াভেলি, হবস, স্পিনোজা, বদেন ও অন্যান্য মনীষী থেকে শুরু করে সবাই শক্তিকে ধরেছেন আইনের ভিত্তি বলে'****।

সমাজ সম্পর্ক থেকে পবিত্রতার ঘোমটা খসিয়ে দেন মাকিয়াভেলি ও

গ্যুইচার্দিনি, তাঁদের মতবাদ ও তত্ত্বের নির্ধারক দিক হিশেবে সজ্ঞানে ও প্রকাশ্যে তুলে ধরেন বলের রাজনীতি, যা পরে বহু বুর্জোয়া ভাবাদর্শীর মধ্যে সুপ্রচলিত হয়। মাকিয়াভেলি ও গ্যুইচার্দিনির অনেক মতামতই হবস গ্রহণ করেছিলেন।

হবসের রাষ্ট্র তত্ত্ব যুক্তিসঙ্গতভাবেই এসেছে তাঁর আইন ও নৈতিকতার তত্ত্ব থেকে। তাঁর ক্ষেত্রে, যেমন ১৭-১৮ শতকের অন্যান্য জ্ঞানপ্রচারকদের ক্ষেত্রে সামাজিক ঘটনার বিশ্লেষণে ঐতিহাসিকতার অভাব একটা সাধারণ লক্ষণ। নানাভাবে ব্যাখ্যা করলেও মানবপ্রকৃতিকে তাঁরা মনে করতেন চিরস্থায়ী এবং অপরিবর্তনীয়। ভাঙন্ত সামন্ততান্ত্রিক এবং উদীয়মান বুর্জোয়া সমাজের সম্পত্তিমালিকদের চরিত্রকে হবস ভিত্তি হিশেবে ধরেছিলেন। স্বাভাবিক অবস্থা, সবার সঙ্গে সবার যুদ্ধের অবস্থা (bellum omnium contra omnes) মানুষের সবচেয়ে বড়ো দুর্ভাগ্য, কেননা অপরের হামলা থেকে কেউই নিরাপদ নয়। এরূপ অবস্থা মানবপ্রকৃতির একটা মূল ধর্ম — আত্মরক্ষা প্রবৃত্তির পরিপন্থী। সেই কারণে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে মানবপ্রকৃতি যুদ্ধের অবসান ও শান্তি স্থাপনের দাবি করে।

আইন (jus) এবং নিয়মের (lex) মধ্যে পার্থক্য করেছেন হবস, যারা পৃথক এ দুটি জিনিসকে গুলিয়ে ফেলে, তাদের সমালোচনা করেছেন। এক্ষেত্রে তিনি স্বাভাবিক বিধি ও স্বাভাবিক নিয়মের কথা বলতে চেয়েছেন। হবসের মতে, স্বাভাবিক বিধিতে সর্বজনীন শত্রুতা, বিদ্বেষ, লোকেদের মধ্যে সংগ্রাম নাকচ হয় না, বরং সেটাই ধর্তব্য, কেননা এটা হল নিজ জীবন রক্ষার জন্য নিজের বিবেচনামতো নিজ শক্তি ব্যবহারে স্বাধীনতা।

স্বাভাবিক বিধির বিপরীতে হবস রেখেছেন স্বাভাবিক নিয়ম এবং স্বাভাবিক নিয়ম বলতে তিনি বোঝেন নির্দেশ বা সুবুদ্ধি দ্বারা আবিষ্কৃত সাধারণ রীতি, যাতে নিজের জীবনের পক্ষে মারাত্মক কোনো কিছু করা মানুষের পক্ষে নিষিদ্ধ।

স্বাভাবিক নিয়মের যে সূত্রায়ণ হবস করেছেন তা পালন হল লোকেদের মধ্যে সম্পর্কে শৃঙ্খলা বিধানের পূর্বশর্ত। সর্বাগ্রে সমস্ত লোকই হল দৈহিক ও আত্মিক দিক থেকে পরস্পর সমান। দৈহিক শক্তির পার্থক্য অকিঞ্চিৎকর, তাতে কেউ এমন সুবিধা দাবি করার অধিকার পায় না, যা অন্যদের অধিকারে নেই। এ তত্ত্ব সামন্ততান্ত্রিক বিশেষাধিকারের বিরুদ্ধে চালিত, সামন্ততন্ত্রের মতাদর্শীদের কাছে তা অনুমোদন পেতে পারে না। সেই কারণে সবার সঙ্গে সবার যুদ্ধের অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার উদ্দেশ্যে

প্রথম ও বনিয়াদী স্বাভাবিক নিয়ম দাবি করে 'শান্তির সন্ধান ও তা পালন'*। এ থেকে আসছে দ্বিতীয় স্বাভাবিক নিয়ম: '...অন্যদের এতে সম্মতি থাকলে মানুষের উচিত শান্তি ও আত্মরক্ষার জন্য যতটা প্রয়োজন সেই পরিমাণে সমস্ত জিনিসের উপর অধিকার ত্যাগ এবং নিজের প্রসঙ্গে অন্যান্যদের যতটা স্বাধীনতা সে অনুমোদন করে, অন্যদের প্রসঙ্গে নিজের ততটা স্বাধীনতাতেই সন্তুষ্ট থাকা'**।

নিরাপত্তার নিশ্চিতি ও যুদ্ধের বিপর্যয়কর অবস্থা থেকে মুক্তির উপরোক্ত উদ্দেশ্যগুলিই হল রাষ্ট্রগঠনের কারণ। সর্বজনীন কল্যাণ ও পারস্পরিক সম্মতির স্বার্থে লোকেদের উচিত নিজেদের অধিকার ত্যাগ করে এক ব্যক্তি বা লোকসভার হস্তে তা অর্পণ করা, যারা সকলের অভিপ্রায় ব্যক্ত করে প্রত্যেককে বাধ্য করবে সাধারণ শান্তি লঙ্ঘন না করতে, গৃহীত সিদ্ধান্ত মেনে চলতে। এইরূপ অধিকার সমর্পণই হল রাষ্ট্র গঠন। লোকে যে ব্যক্তি বা সভার অধীনতা গ্রহণ করছে তাকে বলা হয় সর্বোচ্চ ক্ষমতা, সার্বভৌম আর বাকিরা হল প্রজা। এইভাবে হবস সামাজিক চুক্তি তত্ত্বের ভিৎপত্তন করেন, যাকে আঠারো শতকে পরিবিকশিত করেন রুসো। হবসের মতে, চুক্তি সাধারণ অভিপ্রায়কে রূপ দেয়, যা হল অধিকাংশের অভিপ্রায়। কিন্তু সার্বভৌম ও জনগণের মধ্যে চুক্তিতে যে শেষোক্তের নিকট প্রথমোক্ত দায়িত্বশীল এমন কথা হবস বলেন নি।

প্রাণ হরণের অধিকার ছাড়া প্রজাদের উপর সীমাহীন ক্ষমতা হবস দিয়েছেন সার্বভৌমকে। স্বাভাবিক অবস্থায় যে যে অধিকার মানুষের প্রকৃতিগত, তা সবই বর্তাল রাষ্ট্রে। হবসের ধারণায়, ভূমির উপর রাষ্ট্র ক্ষমতার চেয়ে উচ্চতর ক্ষমতা কিছু নেই, এমন কেউ নেই যে সে ক্ষমতার কাছে কিছু দাবি করতে পারে, তার কার্যকলাপের জন্য তাকে দায়ী করা তো দূরের কথা। বিচার, যুদ্ধ ও শান্তির ঘোষণা, উপদেশক ও মন্ত্রী নির্বাচন প্রভৃতি সব ধরনের অধিকার আছে সার্বভৌমের। 'লেভিয়াথান' পুস্তকের লেখক কঠোর রাষ্ট্রীয় সেন্সর ব্যবস্থার পক্ষপাতী, সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকার সংকোচন সমেত সর্ববিধ ক্ষতিকর মতবাদের প্রচার সর্বোচ্চ ক্ষমতা নিষিদ্ধ করতে পারে।

সার্বভৌমের অধিকারগুলি অবিভাজ্য, অপ্রদেয়। রাজা, লর্ড সভা ও

কমন্স সভার মধ্যে ক্ষমতা ভাগাভাগির ঘোর বিরোধী ছিলেন হবস, মনে করতেন যে ওটাই রাষ্ট্র পতনের একটা কারণ। তাঁর জীবদ্দশায় ইংলণ্ডে যে গৃহযুদ্ধ হয়েছিল, হবসের মতে, তার কারণ হল ক্ষমতার এই বাঁটোয়ারা। তিনি মনে করতেন যে, রাষ্ট্র ক্ষমতা হওয়া উচিত অবিভাজ্য ও সার্বভৌম; তা কোনো বিচার বা নিয়ন্ত্রণের অধীন নয়, সমস্ত আইনের তা ঊর্ধ্বে, কেননা আইন তারই রচিত।

রাষ্ট্রকে হবস বলেছেন 'একক ব্যক্তি, বহু লোকের সম্মতিক্রমে যার অভিপ্রায় সবার অভিপ্রায় বলে স্বীকৃত, ফলে শান্তি ও সাধারণ স্বার্থ রক্ষার জন্য তা সমাজের আলাদা আলাদা ব্যক্তির শক্তি ও সামর্থ্যের উপর হুকুম খাটাতে পারে'*। সমাজজীবনের একমাত্র রূপ তাঁর কাছে রাষ্ট্রীয় সংগঠন, শ্রেণী সমাজ, রাষ্ট্র ছাড়া সমাজের অস্তিত্ব তিনি কল্পনা করতে পারতেন না। হবস বোঝেন নি যে শ্রেণীবৈরের সমাজে রাষ্ট্রক্ষমতা অধিপতি শ্রেণীটির স্বার্থবাহক, গোটা সমাজকে রক্ষার কোনো দায়িত্ব তার নেই।

তিন ধরনের রাষ্ট্রক্ষমতার কথা বলেছেন হবস: সর্বোচ্চ ক্ষমতাপ্রাপ্ত লোকেদের সংখ্যা অনুসারে (সভা, পরিষদ, বহু বা এক ব্যক্তি) গণতান্ত্রিক, আভিজাতিক, রাজতান্ত্রিক।

হবসের মতে, শ্রেষ্ঠ শাসনব্যবস্থা হল রাজতন্ত্র, কেননা তাতে থাকে সমাজের শ্রীবৃদ্ধির পক্ষে প্রয়োজনীয় সর্বাত্মক ও নিরঙ্কুশ ক্ষমতার শর্ত। সেইসঙ্গে তিনি অতি গুরুত্বপূর্ণ এই বক্তব্য রেখেছেন যে রাষ্ট্রক্ষমতার জন্য সর্বোচ্চ আইন হল জনকল্যাণ। এ কল্যাণ হল সর্বাগ্রে শান্তি রক্ষা: এ শান্তি যে লঙ্ঘন করে, সে স্বাভাবিক নিয়মের, রাষ্ট্রীয় আজ্ঞার বিরোধী। হবস মনে করতেন যে রাজতান্ত্রিক শাসনেও ক্ষমতার চূড়ান্ত উৎস হল জনগণ। তিনি লিখেছেন: 'সমস্ত রাষ্ট্রেই শাসন করে জনগণ। রাজতন্ত্রেও সে হুকুম খাটায়, কেননা সেখানে সে তার ইচ্ছা প্রকাশ করে একজন ব্যক্তির মাধ্যমে... গণতান্ত্রিক ও আভিজাতিক রাষ্ট্রে নাগরিকরা দলবদ্ধ আর তাদের সভাই হল জনগণ। রাজতন্ত্রে রাজাই জনগণ।'

নাগরিক বা প্রজা আর নিরঙ্কুশ ক্ষমতার মধ্যে সম্পর্কের যে ব্যাখ্যা হবস দিয়েছেন, সেটা চিত্তাকর্ষক। সমস্ত ক্ষমতাকেই — লোকসভা, অভিজাততন্ত্র, রাজা — সবাইকেই তিনি মনে করেন পরম বা সীমাহীন

ক্ষমতার অধিকারী। পরম ক্ষমতার কাছে নাগরিক বা প্রজার ততক্ষণ অবধি বাধ্যবাধকতা থাকে, যতক্ষণ সে ক্ষমতা নাগরিকদের রক্ষা করার যে দায়িত্ব নিয়েছে তা পালন করার অবস্থায় থাকছে। যে ক্ষমতার উচ্ছেদ হয়েছে তার অধীন থাকতে প্রজারা বাধ্য নয়, যে ক্ষমতা সত্যসত্যই দেশ চালায় কেবল তার অধীনতায় তারা থাকবে। পুরনো ক্ষমতা যদি সৈন্যদের ভরণপোষণ করতে, জীবনধারণের জন্য তাদের ন্যূনতম প্রয়োজন মেটাতে না পারে, তাহলে ফৌজও নতুন ক্ষমতার পক্ষে চলে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে রাজার প্রতি বিশ্বস্ততার শপথ থেকে সৈন্যরা মুক্ত। হবসের এই থিসিসটির চরিত্র দ্বিবিধ। নির্দিষ্ট কতকগুলি পরিস্থিতিতে তা যেমন প্রগতিশীল, বৈপ্লবিক, তেমনি আবার প্রতিক্রিয়াশীল ভূমিকাও পালন করতে পারে।

রাজা প্রথম চার্লসকে উচ্ছেদ করে ক্রমওয়েলের যে একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় তা হবসকে পীড়ন করেই নি, বরং সম্মানই দেখিয়েছে। আবার পুনঃপ্রতিষ্ঠার পরে নতুন রাজা দ্বিতীয় চার্লসের কাছ থেকেও হবস মর্যাদা পেয়েছেন। বিদ্যমান ক্ষমতার নিকট বশ্যতার থিসিস যেমন রাজা তেমনি ক্রমওয়েল উভয়ের পক্ষেই ছিল লাভজনক।

হবস শাসনের রূপ হিশেবে গণতন্ত্রের উপর বিরূপ, তাতে তিনি কেবল দুর্বলতাই দেখেন। গণতন্ত্রে সবকিছুই নির্ধারিত হয় সংখ্যাধিক্যে, আর সংখ্যাধিকেরা যেহেতু ব্যাপার-স্যাপার সম্পর্কে স্বল্পজ্ঞানী, তাই, তাঁর মতে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে কর্ম ও সিদ্ধান্ত হয় বেঠিক। গণতন্ত্রে গোপনে কাজ চালানো একেবারে অসম্ভব। গণতন্ত্রের বিরোধিতা করে হবস পার্টিগুলিকে ভেঙে দেবার প্রস্তাব দেন। পার্টিকে তিনি মনে করেন কোঁদল ও রাষ্ট্রাভ্যন্তরীণ সংগ্রামের উৎস।

আইনের অদৃঢ়তাও, তাঁর মতে, গণতন্ত্রের একটা ত্রুটি, তারও কারণ এই যে [বিধান] সভায় সংখ্যাধিক্য ঘটে কখনো এক পার্টির, কখনো অন্য পার্টির। তিনি লিখেছেন: 'ঢেউয়ে ভেসে যাওয়ার মতো আইন এক্ষেত্রে একদিক থেকে অন্যদিকে যায়'*।

স্বদেশবাসীকে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সর্বনাশা পরিণতি এবং রাষ্ট্রের একব্যক্তিক চালনার সুফল দেখাবার জন্য তিনি এথেন্স গণতন্ত্রের নজির দিয়েছেন। নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রের সঙ্গে পিউরিটানদের [৬] সংগ্রাম

তাঁর কাছে মনে হয়েছিল সুদূর অতীতে এথেন্সে অভিজাত দলের সঙ্গে গণতন্ত্রের সংগ্রামের পুনরাবৃত্তি।

তবে পার্লামেণ্টী শাসনের বিপরীতে রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা সমর্থন করলেও হবসের রাষ্ট্র তত্ত্বের একটা বুর্জোয়া তাৎপর্য ছিল। মানুষ সবাই একেবারে সমান, তাঁর এই তত্ত্ব আর সামাজিক-রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি রাষ্ট্রক্ষমতাকে ঐশ্বরিকতা দান এবং লোকোত্তর শক্তির ইচ্ছাক্রমে রাষ্ট্রের উদ্ভব এই সামন্ততান্ত্রিক তত্ত্বের পরস্পরবিরোধী। বেকনের পরে সামন্ততান্ত্রিক ভাবাদর্শের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যান হবস, মধ্যযুগীয় তমসাচ্ছন্নতা, ধর্ম, গির্জার বিরুদ্ধে প্রবল আঘাত হানেন।

কিন্তু রাষ্ট্র শ্রেণীর ঊর্ধ্বে, রাষ্ট্র ও সমাজ এক, এমন একটা ধারণা ছিল তাঁর। পরবর্তী সমস্ত বুর্জোয়া ভাবাদর্শীর মতো তাঁর কাছেও ব্যক্তিগত মালিকানা মানুষের একটা অলঙ্ঘনীয় অধিকার, সমাজের উদ্ভব থেকে তা বিদ্যমান। বস্তুবাদী হওয়ায় শ্রেণী সংগ্রামের মধ্যে তিনি দেখেছেন কেবল সবার সঙ্গে সবার সংগ্রাম, লক্ষ করেন নি একই শ্রেণীর মধ্যে ঐক্য। তিনি ছিলেন পুরোপুরি আধিবিদ্যক ও যান্ত্রিক বস্তুবাদের অবস্থানে। বিশ্বের সমস্ত বৈচিত্র্য, মানুষের সামাজিক ও আত্মিক জীবনকে হবস দেখেছেন কেবল যান্ত্রিক গতির নিয়মাধীন বস্তুর সমষ্টি হিশেবে। তাঁর বস্তুবাদের এই একদেশদর্শিতার উল্লেখ করেছেন মার্কস।*

যেমন বুর্জোয়ার শ্রেণীগত ভাবাদর্শ, তেমনি রাজনৈতিক-আইনী ব্যাপার প্রণিধানের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির বিকাশেও হবসের রাজনৈতিক মতবাদের একটা বিশেষ স্থান আছে। বর্তমানে, বুর্জোয়া গণতন্ত্রের সংকটের যুগে এ মতবাদের প্রাসঙ্গিকতা খুবই নিয়মসঙ্গত। বুর্জোয়া ব্যবস্থার ঊষাকালেই হবস বুর্জোয়া রাষ্ট্রপাটের অনেক মৌলিক দিকের বিশ্লেষণ করেন, কর্তৃত্বপরায়ণ বুর্জোয়া রাজনৈতিক ব্যবস্থার একটা মডেল রচনা করেন তিনিই প্রথম।

হবসের মতবাদ যে ইংলন্ডের ক্ষেত্রে বুর্জোয়া রাষ্ট্রপাটের মূল ভিত্তি নিয়ে তীব্র আলোচনার গতিপথে দেখা দিয়েছিল, সেটা দৈবাৎ নয়। তখন হবসের বুর্জোয়াধর্মী পরারাজতান্ত্রিক মতবাদ আর লকের উদারনৈতিক-নিয়মতান্ত্রিক ধারণা ছিল পরস্পরবিরোধী। ইংলন্ডে সতেরো শতকের বুর্জোয়া বিপ্লবের প্রত্যক্ষদর্শী ও ভাবাদর্শী হবস শুধু সামন্ততন্ত্রবিরোধী

ও যাজকতন্ত্রবিরোধী নয়, একইসঙ্গে গণতন্ত্রবিরোধী অবস্থানও নেন। কোন পথে ক্ষমতার বুর্জোয়া ধাঁচা গড়ে উঠবে, এ প্রশ্ন যখনও অমীমাংসিত, সে পরিস্থিতিতে হবসই প্রথম তাত্ত্বিকভাবে সূত্রবদ্ধ করেন বুর্জোয়া রাষ্ট্রপাট বিকাশের গুরুত্বপূর্ণ বিশেষত্ব, যা পরে, বিশেষ করে সাম্রাজ্যবাদের যুগে বহুবার সমর্থন লাভ করেছে, যথা — সামাজিক সংকট, শ্রেণী সংগ্রামের তীব্রতাবৃদ্ধির সময় রাষ্ট্রক্ষমতার নিয়মতান্ত্রিক সংকোচনের কথাটাই নাকচ করার প্রবণতা।

সেই সঙ্গে হবসের মতবাদকে দেখা উচিত তার মূর্ত-নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতে। সতেরো শতকে যে বুর্জোয়া শক্তি সঞ্চয় করছে, প্রবল একটা রাষ্ট্রক্ষমতা যার প্রয়োজন, তার আশাবাদী মনোবৃত্তির বাহক ছিল সেটা। বুর্জোয়া রাজনৈতিক-আইনী চিন্তার ভবিষ্যৎ বিকাশে যত পার্থক্য ও বিরোধিতা দেখা গেছে, তা যেন ভ্রূণাবস্থায় নিহিত ছিল তখন। সেদিক থেকে হবসকে সঙ্গতকারণেই বলা যায় দক্ষিণপন্থী বুর্জোয়া র‍্যাডিকেলিজমের প্রবর্তক। চরম রক্ষণশীল ও গণতন্ত্রবিরোধী বুর্জোয়া ধারণার কোনো না কোনো দিক এসেছে হবস থেকে। সর্বশক্তিমান রাষ্ট্রকে মহিমান্বিত করায় এসে গেছে নিরঙ্কুশ ক্ষমতার ধারণা; 'সবার সঙ্গে সবার' সংগ্রাম, 'শ্রেষ্ঠ ও প্রবলের' জন্য আধিপত্যের থিসিস পরে বিকশিত হয়েছে সামাজিক ডারউইনবাদ ও বর্ণবাদী তত্ত্বে।

তবে অত্যুক্তি না করেই বলা যায় যে হবসের মতবাদ সত্যকার 'পুনর্জন্ম' লাভ করেছে সাম্রাজ্যবাদের যুগে, বিশেষ করে বিগত দশকগুলিতে। আধুনিক বুর্জোয়া রাজনৈতিক ভাবনার বিকাশে ঐতিহাসিক-তাত্ত্বিক দিকটা যতটা গুরুত্ব ধরে তাতে হবসের প্রভাব অতীব লক্ষণীয়। হবস সম্পর্কে যেমন ক্রমবর্ধমান প্রকাশনা, তেমনি তাঁর মতবাদের আধুনিক ভাষ্যের পদ্ধতিও তার সাক্ষ্য। তথোপযোগী ভাষ্য অনুসারে চেষ্টা করা হয় আধুনিক বুর্জোয়া রাষ্ট্রপাটের ন্যায্যতা প্রতিপন্নের, তেমনি বাস্তবে বিদ্যমান সমাজতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার অপযশ কীর্তনের। বুর্জোয়া ভাবাদর্শীদের হবস ব্যাখ্যায় উদারনৈতিক ও 'সর্বগ্রাসী' এই দুই ধারাই এই দুই সামাজিক কাজে লিপ্ত।

এই শতকের তিরিশের দশকে যখন বুর্জোয়া সাহিত্যে হবস সম্পর্কে এই ধারণা প্রচারিত হচ্ছিল যে তিনি সর্বগ্রাসী রাষ্ট্র তত্ত্বের (সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে তার একটা প্রকারভেদ বলে মিথ্যা কুৎসায় নিন্দিত করা হচ্ছিল) প্রবর্তক, তখন অন্য বুর্জোয়া লেখকদের পক্ষ থেকে যে এতে আপত্তি

করা হয়, সেটা বৈশিষ্ট্যসূচক। বিশেষ করে, বলা হয় যে ফ্যাসিস্ট মতবাদ থেকে হবসের তফাৎ এই যে তিনি যুক্তিবাদী, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য নীতির অনুগামী*। এ কথা সত্যি যে প্রজাদের দেহ ও মনের উপর আধিপত্য, 'অনিষ্টকর' ভাবনা দমন ইত্যাদি হবসের যেসব দিক ছিল লেভিয়াথানে তার অনেকগুলিই দেখা গেছে ফ্যাসিস্ট শাসনে। এদিক থেকে ধরা যেতে পারে যে লেভিয়াথানের রূপে হবস প্রথম যে বুর্জোয়া স্বৈরতন্ত্রের তাত্ত্বিক বর্ণনা দিয়েছেন, ফ্যাসিস্ট সর্বগ্রাসিতা তারই পরবর্তীকালের একটা বাস্তব রূপ। কয়েক শতকের ব্যবধান থাকলেও দুই মতবাদেরই আছে শ্রেণীগত আত্মীয়তা। সেই সঙ্গে হবসের লেভিয়াথান আর সর্বগ্রাসী-ফ্যাসিস্ট বুর্জোয়া রাষ্ট্রপাটের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্যও বিদ্যমান। সর্বগ্রাসিতা হল বুর্জোয়া সমাজের অস্তমান, সাম্রাজ্যবাদ পর্বের, বিকাশের তুঙ্গবিন্দু পেরিয়ে আসা বুর্জোয়া ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের স্খলন যুগের চরিত্র-লক্ষণ। হবসের ক্ষেত্রে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের উপর রাষ্ট্রের সর্বগ্রাসী আধিপত্যের লক্ষ্য কেবল উদীয়মান বুর্জোয়া শাসনব্যবস্থাকে একটা আকার দান, তা আসছে স্বয়ং বুর্জোয়া ব্যক্তিসত্তারই স্বার্থ সম্পর্কে একটা স্বকীয় বোধ থেকে।

হবসের রাজনৈতিক মতবাদের আধুনিক 'সর্বগ্রাসী' ভাষ্যকে কাজে লাগানো হচ্ছে কমিউনিজম-বিরোধিতায়। নাম করা কমিউনিস্টবিরোধী মতপ্রবক্তা ক. ফ্রিডরিখ 'রাষ্ট্রের ব্যাপারে সোভিয়েত নাগরিকের কোনো অধিকার নেই' — এই রায় দিয়ে মনে করেছেন যে 'সোভিয়েত সর্বগ্রাসিতা' হল 'রাজনীতিতে হবস প্রবণতার চূড়ান্ত পরিণতি'**। একই মত পোষণ করেন রাজনীতি নিয়ে পশ্চিমের আরো কিছু গবেষক।

হবস যাকে বলেছেন সবার ওপর এবং সব কিছুতে আধিপত্যকারী মর্ত্য দেব, কমিউনিস্টবিরোধী বুর্জোয়া ভাবাদর্শীরা বলতে চান সোভিয়েত ব্যবস্থা সেই লেভিয়াথানের মতো সর্বগ্রাসী একনায়কত্ব। বহু বুর্জোয়া

লেখক নানা উপায়ে চেষ্টা করেন হবসের মতবাদ আর মার্কসবাদকে এক করে দেখাতে। যেমন, আমেরিকান রাজনীতিবিদ ড. ফেলমান হবস আর মার্কসের মধ্যে মিল দেখেছেন এই দিক থেকে যে, উভয়েই নাকি 'শক্তি তত্ত্বের' একইরকম প্রতিনিধি,* আর আমেরিকান প্রফেসর ম্যাকফার্সন সোজাসুজি ঘোষণা করেছেন যে 'ব্যক্তিমালিকী বাজারের উপর প্রতিষ্ঠিত সমাজের ধারণা' রচনায় হবসই মার্কসের প্রায় পূর্বসূরী**। অথচ মার্কসীয় মতবাদের মূলে আছে যে দ্বান্দ্বিক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ তা হবসের যান্ত্রিক বস্তুবাদ থেকে যে পরিমাণে পৃথক, মার্কসের রাজনৈতিক মতবাদের বিষয়বস্তুও ঠিক সেই পরিমাণে ভিন্ন, বুর্জোয়া সমাজের বিশ্লেষণ তা করেছে একেবারেই অন্য শ্রেণী ও বৈজ্ঞানিক অবস্থান থেকে।

যখন আধুনিক পশ্চিমী সমাজ ও রাষ্ট্রের কথা ওঠে, তখন, বুর্জোয়া সাহিত্যে হবসের মতবাদের 'সর্বগ্রাসী' ব্যাখ্যার সমালোচনা থেকেই যা দেখা যায়, আঠারো ও উনিশ শতকের উদারনৈতিক ও নরমপন্থী-রক্ষণশীলেরা এ মতবাদকে যেভাবে হেয় করেছেন বুর্জোয়া লেখকেরা সেটা উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেন। বুর্জোয়া লেখকেরা একদিকে উপেক্ষা করেন এ মতবাদের বৈপ্লবিক-বস্তুবাদী দিকগুলি, অন্যদিকে, তাঁদের মতে, পশ্চিমের রাজনৈতিক চিন্তার 'খিস্টীয়-উদারনৈতিক' বিবর্তনের প্রধান ধারায় যেগুলি নাকি পড়ে সেগুলিকে তুলে ধরে কর্তৃত্বপরায়ণ-নিরঙ্কুশ ক্ষমতার দিকগুলির গুরুত্ব ছোটো করে দেখান। এইভাবে হবসের মতবাদের আধুনিকীকরণ চলছে তাকে 'উদারনীতিক' বানিয়ে। বেশ কিছু বুর্জোয়া গবেষক এই কথায় জোর দেন যে হবসের নৈতিক মতবাদ, সার্বভৌমের নিকট বশ্যতার যুক্তিটা এসেছে স্বাভাবিক বিধির খিস্টীয় ঐতিহ্য থেকে, ঐশ্বরিক ক্ষমতায় ভীতির ভিত্তিতে ঈশ্বরের প্রতি নৈতিক বাধ্যবাধকতা তার অন্তর্গত। অন্যেরা হবসের নৈতিকতায় খুঁজে পান বলপ্রয়োগে নিহত হবার আশংকা হেতু প্রতিটি ব্যক্তির আত্মরক্ষার স্বাভাবিক বিধি সমর্থনের যুক্তি। প্রতিরোধের স্বাভাবিক বিধি যে হবস স্বীকার করেছেন, সেদিকে বিশেষ মনোযোগ দেন পশ্চিম জার্মানির ঐতিহাসিক ও ব্যবহারশাস্ত্রী প. মেয়ের-টাশ।

হবসের মতবাদে দার্শনিক বস্তুবাদ আর রাজনৈতিক অন্তঃসারের মধ্যে সম্পর্ককে নতুনভাবে দেখাবার চেষ্টা করেন হবসের মতবাদের সাম্প্রতিক বুর্জোয়া ভাষ্যকাররা। আগেকার বুর্জোয়া সাহিত্যে রাষ্ট্রের ধারণায় বস্তুবাদকে ভিত্তি করায় হবসকে নিন্দা করার একটা রেওয়াজ ছিল। হবসের মতবাদের যে দিকগুলি আধুনিক বুর্জোয়ার পক্ষে গ্রহণযোগ্য তার ওপর জোর দিয়ে বুর্জোয়া লেখকেরা দাবি করেন যে হবসের নিরঙ্কুশ ক্ষমতার তত্ত্ব তাঁর বস্তুবাদ থেকে আসে নি, এবং অন্যদিকে, তাঁর মতবাদের কর্তৃত্বপরায়ণতার দিকটা তাঁর 'বিজ্ঞান বোধের' সঙ্গে মেলে না।

মার্কসবাদী দৃষ্টিকোণে, হবসের বস্তুবাদ তাঁর রাজনৈতিক মতবাদের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত, সেটাই তার দার্শনিক ভিত্তি। ঠিক বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গির ফলেই বুর্জোয়া রাষ্ট্রপাটের একগুচ্ছ মূলনীতিগত দিক উদ্ঘাটিত করা সম্ভব হয় তাঁর পক্ষে। হবসের বস্তুবাদ তাঁর মতবাদের প্রতিক্রিয়াশীল নয়, সেকালের পক্ষে প্রগতিশীল দিকগুলির সঙ্গেই জড়িত। শেষ বিচারে তাঁর দার্শনিক বস্তুবাদ ও রাজনৈতিক মতবাদ দেখা দিয়েছিল সতেরো শতকের ব্রিটিশ বুর্জোয়া সমাজের বিকাশের চাহিদা থেকে, যদিও তাঁর রাজনৈতিক মডেলকে নাকচ করে দেয় আধিপত্যকারী বুর্জোয়া ভাবাদর্শ। নিজের মতবাদে তিনি সমগ্রভাবে সমাজ ও ব্যক্তিগত, আত্মপর বুর্জোয়া স্বার্থের মধ্যে প্রগাঢ় বিভেদ প্রতিফলিত করেছেন। বুর্জোয়া শ্রেণীর সাধারণ স্বার্থকেই কাম্য মনে করেছিলেন হবস, রাষ্ট্রিক আইনের বুর্জোয়া তত্ত্বের বিকাশে বৃহৎ একটা অবদান যোগ করেছেন। সামন্ত-তান্ত্রিক যুগ থেকে পাওয়া এবং যথোপযুক্তরূপে সম্পূর্ণ করে তোলা সার্বভৌম রাষ্ট্রক্ষমতার নিরঙ্কুশ রূপকে তিনি মেলাতে চেয়েছিলেন সে ক্ষমতার বুর্জোয়া রাজনীতির অন্তঃসারের সঙ্গে, ভেবেছিলেন তাতে বুর্জোয়ার সাধারণ শ্রেণী স্বার্থের অধীনে এক-একজন বুর্জোয়ার স্বার্থকে বেঁধে রাখার সমস্যার সমাধান হবে। একই সমস্যার সমাধান দেয়া হয়েছে লকের মতবাদেও, তবে বুর্জোয়া নিয়মতান্ত্রিক শাসনের মাধ্যমে, যাতে সরকারের কাজ হবে এক-একজন বুর্জোয়ার আত্মপর স্বার্থের সংঘাত মেটানো ও ভারসাম্য রক্ষা। প্রকৃতিতে পদার্থ-দেহগুলির সংঘাতের মতো সমাজকে সংগ্রামরত স্বার্থাদির একটা ব্যবস্থা বলে বিশ্লেষণ, রাষ্ট্রকে 'মানবিক রিপু' সংকোচনের যন্ত্র বলে দেখা ছিল পুঁজিবাদে উৎক্রমণের পর্বে বুর্জোয়ার রাজনৈতিক স্বার্থের পরিপোষক।

ম্যাকফার্সন মনে করেন, হবসের মতবাদে এই ঘটনাটা প্রতিফলিত

হয়েছে যে ব্যক্তিমালিকী বাজারের ওপর প্রতিষ্ঠিত সমাজে স্বতন্ত্র ব্যক্তিদের এমন সার্বভৌম ক্ষমতার প্রয়োজন হয় যা ঐ সমাজে শৃঙ্খলা রক্ষা করবে।* পশ্চিম জার্মানির গবেষক ম. এনিকে উল্লেখ করেছেন যে হবস তাঁর নিরঙ্কুশ-সার্বভৌম রাষ্ট্রের মডেলকে মেলাতে চেয়েছেন বুর্জোয়া ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী সমাজের স্বার্থ-কাঠামোর সঙ্গে। সত্যই হবস রাষ্ট্রক্ষমতাকে বুর্জোয়ামুখী একটা কর্মসূচি দিতে চেয়েছিলেন, তবে সে কর্মসূচি সম্পাদন থেকে যে আইনী সংকোচন দেখা দেয়, সেটা রাষ্ট্রের ওপর না চাপিয়ে। হবসের ভয় ছিল যে আইনী সংকোচন থাকলে সবার সঙ্গে সবার লড়াই চাঙ্গা হয়ে উঠবে, নষ্ট হবে প্রধান মূল্যবোধ — সামাজিক শান্তি। সেই সঙ্গে হবসের মতবাদে সাহায্য হয়েছে ঈশ্বরতাত্ত্বিক বিশ্ববীক্ষা থেকে বুর্জোয়ার ক্লাসিক বিশ্ববীক্ষা, ব্যবহারশাস্ত্রীয় বিশ্ববীক্ষার চলে আসতে।

হবস বস্তুবাদী ও নাস্তিক ছিলেন শুধু তাই নয়। তাঁর গোটা রাষ্ট্রীয়-আইনী মতবাদটার চরিত্রই লোকায়ত, তা এসেছে স্বাভাবিক বিধি ও আইনে ভাগাভাগির একটা ঐহিক ধারণা থেকে, সামাজিক চুক্তির ধারণাটা থেকেও। তাঁর তত্ত্বের এই দিকটা যে সামন্ততান্ত্রিক-রাজতান্ত্রিক ও যাজক মহলের আক্রমণস্থল হয়ে উঠেছিল, সেটা অকারণে নয়।

বাণিজ্যিক অবাধ নীতির ঊষাকালে বুর্জোয়া রাষ্ট্রপাটের নিয়মতান্ত্রিক বিকাশের যে প্রবণতা দেখা গিয়েছিল, হবসের মডেল ছিল অবজেকটিভ দিক থেকে তার পরিপন্থী। রাষ্ট্রকে গোটা সমাজের ঊর্ধ্বে স্থান দিলে কার্যক্ষেত্রে শুধু গণতান্ত্রিক জনগণের ওপর নয়, খোদ বুর্জোয়ার ওপরেও রাষ্ট্রের পীড়ন সমর্থন পায়। অবস্থাটা আমূল বদলে যায় সাম্রাজ্যবাদের যুগে। একচেটিয়া কারবারী বুর্জোয়ারা নানা ধরনের রাজনৈতিক ক্ষমতা কেন্দ্রীকরণে আগ্রহী, তাদের প্রয়োজন সর্বত্রসঞ্চারী ক্ষমতার ক্রিয়াকলাপে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রবর্তন। হবসের মতবাদের প্রাসঙ্গিকতা, তাঁর ধ্যানধারণায় বর্তমান বুর্জোয়া রাজনীতিবিদ্যার আগ্রহের অন্যতম কারণ হল এইটে। সামাজিক শান্তি নিশ্চিত করার পদ্ধতি ও শর্ত বিষয়ে হবসের দৃষ্টিভঙ্গিতে বুর্জোয়া ভাবাদর্শীরা সবিশেষ উৎসুক।

সাম্রাজ্যবাদ যেসব আন্তর্জাতিক সংঘাত ঘটাচ্ছে, নতুন বিশ্ব যুদ্ধের যে বিপদ দেখা দিয়েছে, তাতে বুর্জোয়া ভাবাদর্শীরা সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে হবসের মতবাদেও দৃষ্টি দিচ্ছেন। তাঁরা বিশেষ আকৃষ্ট 'হবস' টাইপের বিশ্ব

ক্ষমতার প্রয়োজনীয়তার ধারণায়, যদিও পৃথক পৃথক রাষ্ট্রের ওপর তার সীমাহীন অধিকার থাকবে না।

হবসের মতবাদে প্রাসঙ্গিকতা আরোপ, সাম্প্রতিক ভাবাদর্শীয় সংগ্রামে তাঁর ধ্যানধারণার প্রয়োগ বুর্জোয়া রাজনীতিবিদ্যার তীব্র বিকাশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। ইংরেজ প্রফেসর জ. কেটলিন হবসকে বলেছেন রাজনীতিবিদ্যার আদি প্রতিষ্ঠাতাদের একজন। এ বিদ্যার মূল প্রতিপাদ্যগুলির সংরচনে, বিশেষ করে ক্ষমতার তত্ত্ব, রাজনৈতিক আচরণের সামাজিক-মনস্তাত্ত্বিক কারণ নির্দেশ, সাংখ্যিক পদ্ধতির প্রয়োগে তিনি যে অবদান রেখেছেন, তাকে খুবই উচ্চ স্থান দিয়েছেন প্রফেসর। রাজনৈতিক ঘটনাবলি নিয়ে যে বিজ্ঞান, তার বিকাশে সত্যিই একটা নতুন যুগের সূত্রপাত করে গেছেন হবস। তাঁর বিশ্লেষণের স্বার্থকতায় সহায়ক হয়েছে বস্তুবাদী পদ্ধতি। কিন্তু তাঁর বস্তুবাদের যান্ত্রিক চরিত্রে, সমাজকে যান্ত্রিক গতির নিয়মাধীন দেহসত্তার সমষ্টি মনে করায় সহজ হয়েছে রাষ্ট্রের সর্বশক্তিমান মডেল গড়ায়, যা প্রজাদের চালায় জটিল একটা যন্ত্রব্যবস্থার অংশ হিশেবে।

সাম্প্রতিক বুর্জোয়া রাজনীতিবিদ্যায় হবসের মতবাদ ব্যবহৃত হচ্ছে 'শ্রেণী-ঊর্ধ্ব' রাষ্ট্রকে যুক্তিসিদ্ধ করার উদ্দেশ্যে। হবস তাঁর মতবাদে প্রতিফলিত করেছেন যে বুর্জোয়ারা তাদের প্রভুত্বের গোড়াতেই চেষ্টা করেছে রাজনৈতিক ঘটনাবলির বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের প্রয়াসকে গণতন্ত্রবিরোধী উদ্দেশ্যে কাজে লাগাতে। বর্তমানেও বুর্জোয়া রাষ্ট্রপাটের বিকাশের অগণতান্ত্রিক প্রবণতাকে সঙ্গত বলে প্রমাণিত ও সুসিদ্ধ করার লক্ষ্যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ব্যবহারের ঝোঁক বজায় আছে। এই উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে কাজে লাগানো হচ্ছে নানা ধরনের প্রযুক্তিপ্রাধান্য ও বিজ্ঞানতন্ত্রের ধারণা। ১৯৩৮ সালেই পশ্চিম জার্মানির ব্যবহারশাস্ত্রী ও রাজনীতিবিদ ক. শ্মিট হবসের 'লেভিয়াথান'কে রাষ্ট্রের 'টেকনিক্যাল নিরপেক্ষীকরণের' আদর্শ, আজ্ঞা দেওয়া ও পালনের নিরাবেগ যন্ত্রব্যবস্থা বলে ব্যাখ্যা করেছেন। অথচ হবসের ক্ষেত্রে সমস্ত সমাজের ওপর রাষ্ট্রের প্রভুত্ব খোলাখুলিই বুর্জোয়া লক্ষ্য সাধনে নিয়োজিত।

বুর্জোয়া ভাবাদর্শীদের সামনে সর্বদাই থাকে লেভিয়াথান। সেটা প্রতিফলিত হয় ভবিষ্যতের বুর্জোয়া সর্বগ্রাসিতার ভয়াবহ চিত্রাঙ্কনে রত ফ্যাসনচল একগুচ্ছ ইউটোপিয়া-বিরোধিতাতেই নয়, ঐতিহ্যগত উদারনৈতিক রাজনৈতিক তত্ত্বকে রাজনৈতিক বিযুক্তির বৃদ্ধি, রাষ্ট্রিক ক্ষমতার পীড়নাত্মক

চরিত্রের পুষ্টি প্রভৃতি বাস্তব প্রক্রিয়াগুলির সঙ্গে মিলিয়ে দেবার প্রয়াসেও। দেখা দিচ্ছে ইতালির সমাজবিদ ও রাজনীতিবিদ মিকেল্সের 'গণতান্ত্রিক গোষ্ঠীতন্ত্রের' মতো ধারণা। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রক্ষমতার বশ্যতা স্বীকারের ভিত্তি হল ভীতি, হবসের ধারণাকে কাজে লাগানো হয়েছে, মানুষের তদনুরূপ প্রকৃতি ইত্যাদির উল্লেখ করা হয়েছে। মার্কিন প্রফেসর গ. লেভিস 'মানুষের মধ্যে পশুর ওপর নির্ভরশীল মোহভঙ্গের' যুগকে ধিক্কার দিয়ে স্বীকার করেছেন, 'লক ও জেফারসনের চেয়ে হবস ও লারোশফুকোর বক্তব্য আজ যে বেশি বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়', সেটা খামোকা নয়।* বুর্জোয়া ভাবাদর্শে রাজনৈতিক ক্ষমতার পরমীকরণের যে ধারার সূচনা করেছিলেন হবস, তাকে মিলিয়ে নেয়াটা এইভাবে ঐতিহ্যগত বুর্জোয়া রাজনৈতিক তত্ত্বকে সংস্কার করে কর্তৃত্বশীল শাসনে পরিণত করার প্রয়াসে পর্যবসিত হচ্ছে।



§ ৭। জন লক

আধুনিক যুগের উৎসমুখে চিরায়ত রাজনৈতিক চিন্তানায়কদের মধ্যে জন লক (১৬৩২-১৭০৪) একটা শ্রদ্ধেয় স্থানের অধিকারী। তাঁর জীবন কেটেছে ইংলণ্ডের বুর্জোয়া বিপ্লবের যুগে, আধুনিক ব্রিটিশ রাজনৈতিক ব্যবস্থার ভিতপত্তন হয়েছিল যেসব ঘটনাবলিতে, তিনি ছিলেন তার অংশী। সে সময়কার তীব্র সামাজিক বিরোধ থেকে দেখা দেয় রাজনৈতিক চিন্তার প্রস্ফুরণ, ঘোরতর ভাবাদর্শীয় সংগ্রাম। সতেরো শতকীয় ইংলণ্ডের রাজনৈতিক ভাবনায় মূর্ত হয়ে ওঠে তার গোটা সমাজ — সামন্ততান্ত্রিক সর্বশক্তিমান ব্যবস্থার পক্ষভুক্ত থেকে গণতন্ত্র ও সম্পত্তির সমতার (লেভেলার) মতাবলম্বী নিম্নতন শ্রেণীগুলির স্বার্থপ্রবক্তা, এমনকি ব্যক্তিগত

মালিকানার একেবারে বিলোপে উৎসাহীরা (ডিগার) পর্যন্ত। ভাবধারার এই ঘূর্ণ্যাবর্তে উদিত হল রাজনৈতিক কর্মসূচির গভীর দার্শনিক যুক্তিজালই শুধু নয় (এদিক থেকে সবচেয়ে প্রোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হলেন হবস), নিজের যুগ থেকে অনেকটা অগ্রবর্তী, পরবর্তী কালের রাজনৈতিক আন্দোলনের কর্মসূচির পূর্বানুমিত নানা দুঃসাহসী ভাবনাও। যেমন, লেভেলারদের কর্মসূচিতে এমন গণতান্ত্রিক দাবি কম ছিল না, চার্টিস্টরা [৭] যার পুনরুক্তি করে প্রায় দুই শতাব্দী পরে।

জন লকের শক্তি সমস্যার গভীর দার্শনিক বিচারে, কোনো নতুন ভাবনার উদ্ভাবন বা দূর ভবিষ্যতের পূর্বানুমানে নয়। তাঁর শক্তি এই যে তিনি দৃঢ়পদে দাঁড়িয়েছিলেন সমকালের জমিতে, সেইসব সামাজিক স্তরের সঙ্গে তিনি ছিলেন জড়িত, যারা দীর্ঘ সংগ্রামের পর নিজেদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করতে পারে। ইংলণ্ডীয় বিপ্লবের ভাবাদর্শীয় অন্বেষার খতিয়ান লক টেনেছেন নতুন শাসক শ্রেণীর অবস্থান থেকে। তাঁর রাজনৈতিক মতবাদে বর্জিত হয়েছে 'ঈশ্বর-প্রদত্ত' রাজতন্ত্রের সীমাহীন ক্ষমতার সামন্ততান্ত্রিক ধারণাই শুধু নয়, ইংলণ্ডীয় বিপ্লবের বামপন্থী অংশের গণতান্ত্রিক ও সমবাদী ভাবনাও।

লক তাঁর কালের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলেছেন। অব্যবহিত ভবিষ্যৎ, ইংলণ্ডের পক্ষে তখন যা ছিল নিয়মতান্ত্রিক বুর্জোয়া রাজতন্ত্র, তাঁর আদর্শ তার বাইরে এগোয় নি। ১৬৮৮ সালের 'গৌরবোজ্জ্বল বিপ্লবে' প্রতিষ্ঠিত সেরূপ ব্যবস্থার একটা ধারণা লক আগেই করতে পেরেছিলেন। ইতিহাসে ইংলণ্ডীয় বুর্জোয়া বিপ্লবের সমাপ্তি পর্বের সঙ্গে তাঁর নাম অবিচ্ছেদ্য। লকের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির শ্রেণীগত মর্মের উদ্‌ঘাটক এই সম্পর্কটা এঙ্গেলস লক্ষ্য করেছিলেন: 'যেমন ধর্মে, তেমনি রাজনীতিতে লক ছিলেন ১৬৮৮ সালের শ্রেণীগত আপোসের সন্তান'*।

কিন্তু সতেরো শতকের শেষে ইংলণ্ডে যে রাজনৈতিক ব্যবস্থা দেখা দেয়, তার বৃহৎ একটা ভবিষ্যৎ ছিল শুধু সে দেশেই নয়, সারা বিশ্বেই। যে সামাজিক-রাজনৈতিক ব্যবস্থা নীতিগতভাবে ব্রিটিশ নিদর্শনের অনুরূপ, অর্থাৎ বুর্জোয়া রাষ্ট্রপাট, ইউরোপে তা প্রতিষ্ঠালাভের পক্ষে দু'শ বছর তখনও সামনে। লকের যে ধ্যানধারণা সতেরো শতকী ইংলণ্ডের বিপ্লবের পরিধি ছাড়িয়ে বহুদূর এগিয়েছিল, তার ঐতিহাসিক গুরুত্বের কারণ এইটে।

তিনি ছিলেন বুর্জোয়া রাষ্ট্রপাটের লালনাগারে, তার ব্যবহারিক সংগঠন ও ভাবাদর্শীয় যৌক্তিকতার এমন অনেক নীতি তিনি রচনা করেছেন যা স্থান পেয়েছে বুর্জোয়া রাষ্ট্রতত্ত্বের স্বর্ণভাণ্ডারে। বুর্জোয়া উদারনৈতিক ব্যবস্থার তাত্ত্বিক ভিত্তি দেন তিনি, দুই শতক ধরে তা ছিল অগ্রণী ইউরোপীয় দেশগুলির আকার ধারণের পেছনে, আজো তা বুর্জোয়া রাজনৈতিক চেতনার একটা অচ্ছেদ্য অংশ।

স্টুয়ার্ট রাজবংশের নিরংকুশ ক্ষমতার প্রতি বিরূপ ভাবাপন্ন এক মধ্যবিত্ত পরিবারে ১৬৩২ সালে জন লকের জন্ম। পিতা ছিলেন কাউণ্টির দেওয়ানি-ফৌজদারি আদালতের কেরানি, গৃহযুদ্ধে ঘোড়সওয়ার বাহিনীর ক্যাপটেন হিশেবে তিনি পার্লামেণ্টের পক্ষে যোগ দেন। লক শিক্ষা শুরু করেন ওয়েস্টমিনিস্টার মঠের বিদ্যালয়ে। স্কুল শেষ করে ১৬৫২ সালে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। তাঁর মনে প্রীতিকর ছাপ ফেলে নি যেমন স্কুলের শিক্ষা, তেমনি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাও, তাঁর মতে, সেখানে বাড়াবাড়ি রকমের মন দেয়া হয় প্রাচীন দর্শনের পণ্ডিতী আবৃত্তিতে। তবে অক্সফোর্ডেই তিনি পরিচিত হন দেকার্তের রচনার সঙ্গে, যা তাঁর মধ্যে অধিবিদ্যায় আগ্রহ জাগিয়ে তোলে, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, বিশেষ করে চিকিৎসাবিদ্যায় আকৃষ্ট হন তিনি।

অক্সফোর্ডের সঙ্গে জড়িত লকের জীবনের ৩২ বছর — ১৬৫২ সাল ছাত্রাবস্থা থেকে ১৬৮৪ সাল পর্যন্ত, যখন তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করতে হয়, কেননা তাঁকে মনে করা হয়েছিল রাজনৈতিক দিক থেকে অনির্ভরযোগ্য। এই সময়টায় অতি গুরুত্বপূর্ণ সব ঘটনা ঘটছিল দেশে। ১৬৫৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হল ক্রমওয়েলের প্রটেক্টরেট, সরাসরি সামরিক একনায়কত্বের পদ্ধতি গ্রহণ ছিল তার বৈশিষ্ট্য। বিপ্লবের সামরিক শক্তির পরিচালক থেকে ক্রমওয়েল একনায়ক হয়ে ওঠায় বোঝা যায় যে বিপ্লবের তুঙ্গবিন্দু ততক্ষণে পেরিয়ে গেছে। রাষ্ট্রক্ষমতা অধিকার করে ফৌজের ওপরমহল দমন করছিল শুধু রাজতান্ত্রিক প্রতিক্রিয়া নয়, লেভেলার গণ আন্দোলনও। ফৌজের ওপর নির্ভর করে অভিজাত ও বণিক সম্প্রদায় দেশে নিজেদের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিল। পাকাপোক্ত ক্ষমতা লাভ ও রাজবংশের সঙ্গে আপোসের যে ঝোঁক তাদের ছিল, তার পরিণামে ১৬৬০ সালে ক্রমওয়েলের

মৃত্যুর পরে পরেই দ্বিতীয় চার্লসকে সিংহাসনে আমন্ত্রণ মারফত স্টুয়ার্ট রাজবংশের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়। ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের এই কীর্তিটিতে উৎসাহিত স্টুয়ার্টরা চেষ্টা করে নিজেদের অবস্থা সংহত করতে, শাসক শ্রেণীর বিভিন্ন গ্রুপের মধ্যে বিরোধকে কাজে লাগিয়ে যতটা সম্ভব নিরঙ্কুশ শাসন পদ্ধতিতে ফিরে যেতে।

ব্রিটিশ সমাজে পুনঃপ্রতিষ্ঠার পর্বে শ্রেণী শক্তিগুলির পুনর্বিন্যাস ঘটে। রাজক্ষমতার প্রতি মনোভাবের প্রশ্নে তা একটা সুদৃঢ় রাজনৈতিক প্রভেদের রূপ নেয়। দেখা দেয় ব্রিটিশ দ্বি-পার্টি ব্যবস্থার (হুইগ [৮] ও টোরি [৯]) ভ্রূণ, যা পুরোপুরি দানা বাঁধে আঠারো শতকে।

১৬৭২ সাল থেকে হুইগদের স্বীকৃত নেতা লর্ড অ্যাণ্টনি অ্যাশলি, কাউণ্ট শেফট্‌স্‌বেরির সঙ্গে ব্যক্তিগত যোগাযোগের কল্যাণে লক অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে যোগ দেন রাজনীতিতে।

১৬৬৭ সালে অ্যাশলি লককে তাঁদের গৃহচিকিৎসক হবার প্রস্তাব দেন। তাঁদের মধ্যে বন্ধুত্ব, দৃষ্টিভঙ্গির নৈকট্য দেখা দেয় এবং অচিরেই লক শুধু গৃহচিকিৎসক নন, অ্যাশলির পুত্রের শিক্ষক এবং বিশিষ্ট এই রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তার মন্ত্রণাদাতাও হয়ে ওঠেন। শেফট্‌স্‌বেরি যখন লর্ড চ্যান্সেলার এবং পরে লর্ড-প্রিভি কাউন্সিলার সভাপতি হন, তখন গুরুত্বপূর্ণ সব প্রশাসনিক পদ লাভ করেন লক। শেফট্‌স্‌বেরির সঙ্গে তিনি শুধু সম্মানের নয়, বিরাগেরও ভাগ পান। হুইগ নেতা ছিলেন পুনঃপ্রতিষ্ঠার বিরোধী, পার্লামেণ্টের নিয়ন্ত্রণ না মেনে শাসন চালাবার যে চেষ্টা করেন দ্বিতীয় চার্লস, তার বিরোধিতা করেন তিনি এবং সেজন্য পীড়নের কবলে পড়েন। ১৬৮২ সালে শেফট্‌স্‌বেরি আম্‌স্টার্ডামে পালিয়ে যেতে বাধ্য হন। পরের বছর লকও অনুসরণ করেন তাঁকে। রাজক্ষমতা বিদেশেও লককে শাস্তি দিতে ছাড়ে না। ১৬৮৪ সালে তিনি বরখাস্ত হন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আর ১৬৮৫ সালে ব্রিটেনের নতুন রাজা দ্বিতীয় জেকভের সরকার অন্যান্য ‘ষড়যন্ত্রকারীদের’ মধ্যে লককেও প্রত্যর্পণের দাবি জানায় হল্যাণ্ড কর্তৃপক্ষের কাছে।

দুটি ‘রাজ্যশাসন বিষয়ক গ্রন্থ’এ লক তাঁর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থিত করেছেন। তা সংরচিত হয় ঘোরতর রাজনৈতিক ও ভাবাদর্শীয় সংগ্রামের গতিপথে। তার বড়ো একটা অংশ লেখা হয় ১৬৭৯-১৬৮১ সালে, যখন সিংহাসনের উত্তরাধিকার নিয়ে রাজা আর শেফট্‌স্‌বেরির নেতৃত্বে হুইগদের মধ্যে সম্পর্ক সংকটজনক হয়ে উঠেছিল। ১৬৭৯ সাল

নাগাদ দ্বিতীয় চার্লসের শাসনের প্রতি ব্যাপক অসন্তোষ সুপ্রকট হয়ে ওঠে। দ্বিতীয় চার্লসকে হত্যা করে তাঁর ভ্রাতা ইয়র্কের ডিউক, ক্যাথলিক জেকভকে সিংহাসনে স্থাপনের জন্য ক্যাথলিকদের এক কল্পিত ষড়যন্ত্র 'ফাঁস' উপলক্ষে সংকট ঘনিয়ে ওঠে। রাজক্ষমতা সংকোচনের জন্য হুইগরা এই সুযোগটা কাজে লাগাতে চায়, জেকভকে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করার প্রস্তাব আনে পার্লামেণ্টে। সংগ্রামটা চলে ১৬৮১ সাল অবধি, শেষ পর্যন্ত চার্লসের চালবাজি আর নিজস্ব কাতারে ভাঙনের ফলে তারা পরাজিত হয়। এই পরাজয়ের পরিণাম হল শেফট্‌সবেরি আর লকের বিরুদ্ধে দমননীতি। কিন্তু শুধু রাজনৈতিক নয়, ভাবাদর্শীয় চরিত্রের এই তীব্র সংগ্রাম হুইগদের নীতিগত কর্মসূচি রচনায় খুবই ফলপ্রসূ হয়েছিল। এটা ছিল নির্বাচকদের মনোজয়ের সংগ্রাম; শহরবাসীদের রাজনৈতিক সক্রিয়তায় হুইগদের ভরসা থাকলেও জমি-মালিকদের মধ্যে তখনো প্রবল ছিল রাজতন্ত্রীদের দ্বারা প্ররোচিত রাজক্ষমতার অটুটতার ধারণা, যদিও ১৬৪৯ সালে তা বেশ টলে উঠেছিল। ঠিক ১৬৭৯-১৬৮০ সালেই রাজতন্ত্রীদের মনে পড়ে গেল স্বৈরতন্ত্রের সমর্থক রবার্ট ফিলমারের কথা (মৃত্যু ১৬৫৩ সালে) এবং প্রকাশ করল তাঁর প্রধান গ্রন্থ 'গোষ্ঠীপতি নাকি রাজার স্বাভাবিক ক্ষমতা' ও অন্যান্য রচনা। লকের প্রথম গ্রন্থের পাতায় পাতায় ছিল সামন্তব্যবস্থার এই ওকালতির খণ্ডন। তাঁর দুই গ্রন্থের ছিল দুই উদ্দেশ্য: রাজার ক্ষমতার সর্বশক্তিমত্তা বিষয়ে চিরাচরিত ব্রিটিশ রাজনৈতিক তত্ত্বের বনিয়াদ একেবারে ধূলিসাৎ করা এবং রাজমুকুটের বিরুদ্ধে জনগণকে প্রতিরোধে উদ্বুদ্ধ করা।

হল্যাণ্ডে দ্বিতীয় জেকভের জামাতা অরেঞ্জের উইলিয়ম এবং তাঁর সহচরদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয় লকের। ১৬৮৮ সালে ঘটল 'গৌরবোজ্জ্বল বিপ্লব': দ্বিতীয় জেকভের নিরঙ্কুশ ক্ষমতার দাবি যে বরদাস্ত করা চলে না, এ বিষয়ে ব্রিটিশ শাসক শ্রেণীরা একমত হয়ে সিংহাসনে ডাকল অরেঞ্জের উইলিয়মকে। তাঁর শাসনক্ষমতা নির্ধারিত হয় ১৬৮৯ সালে গৃহীত বিখ্যাত 'অধিকার বিল' দ্বারা, যাতে ইংলণ্ডে পার্লামেণ্টের অধিকার গ্যারাণ্টিকৃত ও নিয়মতান্ত্রিক বুর্জোয়া রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করা হয়। 'গৌরবোজ্জ্বল বিপ্লবের' চরিত্র একান্তই আভিজাতিক, এটা ছিল বুর্জোয়া হয়ে-ওঠা অভিজাত সম্প্রদায়ের সঙ্গে বৃহৎ বুর্জোয়ার আপোস। সেটা এই শ্রেণীগুলির স্বার্থ রক্ষা করেছিল, রাজার স্বেচ্ছাচার থেকে মুক্ত করেছিল তাদের, রাজনৈতিক ক্ষমতা দিয়েছিল তাদের হাতে, সেই সঙ্গে অধিবাসীদের

প্রিবিয়ান স্তরের রাজনৈতিক ও সামাজিক আদর্শ সম্পূর্ণ ভুলে গিয়েছিল।

অরেঞ্জের উইলিয়মের সিংহাসনারোহণের অল্প কিছু পরেই লক ইংলণ্ডে ফেরেন এবং বাকি জীবনটা প্রধানত সাহিত্যকর্মে আত্মনিয়োগ করেন, অনেক আগেই যেসব রচনা তৈরি করে রেখেছিলেন, প্রকাশ করতে থাকেন সেগুলি।

রাষ্ট্র শাসন নিয়ে লকের দুটি গ্রন্থ এবং 'মানবিক সুবুদ্ধির অভিজ্ঞতা' নামে বৃহৎ একটি দার্শনিক রচনা প্রকাশিত হল ১৬৯০ সালে। এগুলিকে ধরা হয়েছিল 'গৌরবোজ্জ্বল বিপ্লবে' প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক ব্যবস্থার বৈজ্ঞানিক ভাষ্য বলে, যদিও মূলত তা লেখা হয়েছিল কয়েক বছর আগেই। প্রচুর স্বীকৃতি ও সম্মান লাভ করে লক মারা যান ১৭০৪ সালে।

ইংলণ্ডের বুর্জোয়া বিপ্লব যুগের রাজনৈতিক ভাবনাচিন্তা রাজনৈতিক সংগ্রামের সঙ্গে তত্ত্বের যোগাযোগের এক প্রোজ্জ্বল নিদর্শন। শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক ব্যবস্থা নিয়ে চিন্তার বাস্তব ভিত্তি ছিল রাজার সঙ্গে পার্লামেন্টের সংগ্রাম। কিন্তু বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মসূচির ভাবাদর্শীয় যাথার্থ্য প্রতিপাদনের আবশ্যিকতায় সে সময়কার লেখকেরা রাষ্ট্রপাটের উৎস, তার উদ্ভবের কারণ সম্পর্কে ভাবতে বাধ্য হন। তা থেকেই সমস্ত ধারার প্রতিনিধিরা হাজির করেন রাজনৈতিক ব্যবস্থার নানা আদর্শ। অতীতের বিশ্লেষণগুলির চরিত্র ছিল সাধারণত মেকি-ঐতিহাসিক এবং ভূমিকা গৌণ।

রাজনৈতিক গ্রন্থদুটির প্রথমটিতে লক তাঁর রাজনৈতিক বিরোধীদের দৃষ্টিভঙ্গি খণ্ডন করেছেন, এটি তাঁর দ্বিতীয় খণ্ডে নিবদ্ধ ইতিবাচক কর্মসূচির ভূমিকাস্বরূপ। সমালোচনা কেন্দ্রীভূত প্রধানত র. ফিলমারের রচনার বিরুদ্ধে, কিন্তু সীমাহীন ক্ষমতার সমস্ত পক্ষপাতীদের, বিশেষ করে রাষ্ট্রের সর্বশক্তিমত্তার প্রবক্তা হবসকেও তিনি ছাড়েন নি, যদিও তাঁর নাম করেন নি স্পষ্টতই কৌশল বিবেচনায়।

সামাজিক চুক্তি তত্ত্বের নিজস্ব ব্যাখ্যা অনুসারে হবস সরকারের সীমাহীন ক্ষমতার কথা তুলেছিলেন। তাঁর থেকে ফিলমারের পার্থক্য হল তিনি পুরোপুরি দাঁড়িয়েছিলেন মধ্যযুগীয় ধর্মীয় অবস্থানে। পুনঃপ্রতিষ্ঠা যুগে ইংরেজ সমাজের রক্ষণশীল অংশের মনোভাবের তা পরিচায়ক। ফিলমারের গ্রন্থ যেসময় প্রকাশিত হয়, ততদিনে হবসের 'লেভিয়াথান' পুরোপুরি অশ্রদ্ধেয় হয়ে পড়েছে। তাকে ধরা হত ক্রমওয়েল শাসনের নিরীশ্বরবাদী পক্ষসমর্থন। যে ক্ষমতা দখল করবে, তার অধিকারই

সার্বভৌম, এ কথাটা রাজতন্ত্রের পক্ষপাতীদের মনঃপূত ছিল না। সেই জন্য ফিলমারের মধ্যে রাজার বংশানুক্রমিক উত্তরাধিকারের স্বীকৃতির সঙ্গে ক্ষমতার সীমাহীনতা যেভাবে মিলেছিল, সেটা ছিল তৎকালোপযোগী।

পবিত্র শাস্ত্র থেকে অসংখ্য উদ্ধৃতি দিয়ে ফিলমার প্রমাণ করতে চান যে প্রাকৃতিক ও ঈশ্বরতাত্ত্বিক কারণে মানুষ জন্ম থেকেই দৈহিক ও ব্যবহারশাস্ত্রীয় দিক থেকে অসহায়, তার গোটা জীবন সার্বভৌম ক্ষমতার অধীনস্থ, মূলত সে এই ক্ষমতার সম্পত্তি, সে ক্ষমতা তাকে শোষণ, তার অঙ্গহানি, এমনকি প্রাণনাশও করতে পারে যদি সার্বভৌম তা চায়। রাজনৈতিক ক্ষমতার সীমাহীনতা ফিলমার নিষ্কাশিত করেছেন সন্তানের ওপর পিতার প্রভুত্ব থেকে। তাঁর মতে, স্বয়ং ঈশ্বরই সন্তানের জীবনের উপর পরিপূর্ণ কর্তৃত্বের অধিকার দেন প্রথম পিতা, সুতরাং প্রথম রাজা আদমকে, এবং পরবর্তী সমস্ত পিতা এরূপ ক্ষমতা খাটিয়েছে নিজের সন্তানদের আর সমস্ত রাজা তাঁদের প্রজাদের উপর। ফিলমারের তত্ত্বানুসারে, রাজতান্ত্রিক ক্ষমতার একমাত্র সংকোচন হল ঐশ্বরিক প্রতিশোধ ও শাস্তি। এ ব্যবস্থায় নিষ্ক্রিয়ভাবে রাজার ইচ্ছা মেনে নেয়া ছাড়া প্রজার করার কিছু নেই। উদ্যোগ গ্রহণ ও প্রতিবাদ প্রকাশের সুযোগ থেকে সে ছিল পুরোপুরি বঞ্চিত। এই অবস্থান থেকে ফিলমার রাষ্ট্র উদ্ভবের চুক্তি তত্ত্বকে নাকচ করেন। জন্মমুহূর্তেই মানুষ দৈহিকভাবে অসহায় এবং পারিবারিক কর্তৃত্বাধীনে নিপতিত, এই প্রাথমিক ঘটনাটার বিরোধী বলে সেটা তাঁর কাছে শুধু উদ্ভট ঠেকেছিল তাই নয়, সর্বনাশা ও ঈশ্বরনিন্দা বলেও মনে হয়েছিল, কেননা ঈশ্বর কর্তৃক আদমকে ক্ষমতা দান এবং মানবজাতির প্রাচীন ইতিহাসের উৎস হিশেবে বাইবেলের 'সৃষ্টিতত্ত্ব' গ্রন্থের প্রামাণিকতাও নাকি নাকচ হচ্ছে।

যেমন ফিলমারের যুক্তির ধর্মাশ্রয়িতা, তেমনি চুক্তি তত্ত্বের হবসীয় নিরীশ্বরবাদী প্রকারভেদ লককে বাধ্য করে ইংরেজ জেনট্রির চোখে সামাজিক চুক্তির ধারণাটা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য তাঁর টিপিক্যাল যুক্তিবাদী প্রণালীর সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরতাত্ত্বিক প্রতিপাদনেরও আশ্রয় নিতে, যদিও তাঁর যুক্তিবাদী পদ্ধতিই তাতে প্রভাবিত এ কথা সত্যি। তবে লকের ঈশ্বরতাত্ত্বিক পরিব্রাজনে ধর্মীয় চেতনার লক্ষণও ছিল, যা তিনি পুরো কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। যদিও, গবেষকদের মতে, লক থেকেই ইংলণ্ডের ১৮ শতকের মুক্ত চিন্তার সূত্রপাত, তাহলেও তাঁর বিশ্ববীক্ষায় সুসঙ্গত

ধর্মবিরোধিতা নেই। অবশ্য সে বিশ্ববীক্ষা নিঃসন্দেহেই ধর্মীয়তার পতন তুলে ধরে, যুক্তিবাদ দিয়ে কোণঠাসা করে তাকে, দেইজমের জমি তৈরি করে দেয়, বসসুইয়ে যাকে বলেছেন 'প্রচ্ছন্ন নিরীশ্বরবাদ'।

ঐতিহাসিক সাক্ষ্য, বাইবেলের বয়ান ব্যবহার করে, যুক্তি ও কাণ্ডজ্ঞানের কাছে আবেদন জানিয়ে লক প্রমাণ করেন যে 'পিতৃত্বের স্বাভাবিক বিধি অথবা ঈশ্বরের কাছ থেকে পাওয়া একটা দান, কোনো কিছুর কল্যাণেই আদমের ছিল না' নিজের সন্ততি ও বিশ্বের ওপর সীমাহীন ক্ষমতা, তাঁর যদি সেরকম ক্ষমতা থেকেও থাকত, তাহলেও সেটা পরবর্তী শাসকদের নিরঙ্কুশ ক্ষমতার দাবি সঙ্গত প্রতিপন্ন করে না, কেননা আদমের উত্তরাধিকারীদের কোন শাখাটা জ্যেষ্ঠ, তার সাক্ষ্যপ্রমাণ বহুদিন আগেই লুপ্ত।*

দেশ জয়কেও লক রাষ্ট্র উদ্ভবের ভিত্তি বলে মানেন না, কেননা আক্রমণ কোনো অধিকারের জন্ম দেয় না এবং পরাভূত অধিবাসীরা বিজয়ীকে কেবল ততদিন পর্যন্ত সহ্য করে, যতদিন না সবলে তাদের উৎখাত করতে পারছে: 'পৃথিবীতে বিদ্যমান সমস্ত সরকার কেবল বলপ্রয়োগ আর জোর জবরদস্তির ফল, লোকে একত্রে বাস করে জন্তুদের মতো একই নিয়মে, যেখানে সবই পায় বলিষ্ঠরাই, যাতে সৃষ্টি হয় চিরকালের বিশৃঙ্খলা আর গণ্ডোগোল, বিক্ষোভ, বিদ্রোহ আর অভ্যুত্থান, একথা যে কিছু পরিমাণে মানতে চাইবে না... তেমন প্রত্যেককেই রাষ্ট্র উদ্ভবের অন্য কারণ, রাজনৈতিক ক্ষমতার ভিন্ন উৎস, এবং ক্ষমতাধরদের স্থির করা ও চেনার অন্য পথ অবশ্যই খুঁজে পেতে হবে'**। এই উৎসটা লক দেখেছিলেন সামাজিক চুক্তিতে: 'সমস্ত রাষ্ট্রের শান্তিপূর্ণ গঠনের ভিত্তিতে ছিল জনগণের সম্মতি'***।

এক্ষেত্রে সামাজিক চুক্তি বলতে কি বোঝায় একটা ঐতিহাসিক ঘটনা, নাকি নির্দিষ্ট কতকগুলি রাজনৈতিক দাবির তাত্ত্বিক যৌক্তিকতা প্রতিপাদনের একটা উপায়? জ. কেটলিন লিখেছেন: 'সামাজিক চুক্তির তত্ত্বকাররা কতটা পরিমাণে বিশ্বাস করতেন যে সত্যিই কোনো একটা

ঐতিহাসিক যুগে সে চুক্তি ঘটেছিল, তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক। এই সব লেখকদের অনুধাবন করলে স্পষ্টতই এই সিদ্ধান্তে আসতে হয় যে তেমন অতিসারল্যে তাঁরা কখনোই দোষী নন, যদিও আদম কী করেছিলেন তা নিয়ে গির্জার আলোচনা এবং স্বর্ণযুগ সম্পর্কে ক্ল্যাসিক মতামতের একটা প্রভাব ছিল তাঁদের ওপর'*।

লকের গোটা রাজনৈতিক ব্যবস্থা যেসব গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতিগত বিচারের ওপর প্রতিষ্ঠিত, সামাজিক চুক্তির তত্ত্ব তার ভিত্তি।

সর্বাগ্রে তাতে মানবসমাজের অন্যান্য ক্ষমতা থেকে রাজনৈতিক ক্ষমতাকে আলাদা করে তার একটা সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞায় পেঁছতে পারেন লক। এই হল ফিলমারের মতো পরম ক্ষমতার পক্ষপাতীদের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য, যাঁর কাছে রাজনৈতিক ক্ষমতা পিতার ক্ষমতা এবং ব্যক্তিগত মালিকানা থেকে যেসব অধিকার বর্তায় তা থেকে অভিন্ন। লক তাঁর ইতিবাচক কর্মসূচি পেশ করেছেন এই ঘোষণায়: 'প্রজাদের ওপর কর্তৃপক্ষীয় ব্যক্তির ক্ষমতাকে তফাৎ করা উচিত নিজ সন্তানদের ওপর পিতার ক্ষমতা, চাকর-বাকরদের ওপর থেকে'**। ক্ষমতার এই ভেদাভেদে নিহিত রয়েছে সমাজ ও রাষ্ট্রের স্বাধীন অস্তিত্বের স্বীকৃতি এবং তাদের মধ্যে সম্পর্ক কী সে প্রশ্নের উত্থাপন। লক লিখেছেন: 'আমি মনে করি রাজনৈতিক ক্ষমতা হল সম্পত্তির নিয়ামন ও রক্ষণের জন্য আইনপ্রণয়ন, যাতে মৃত্যুদণ্ড ও যথানুরূপ কম কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা থাকবে, এবং এইসব আইনের প্রয়োগ ও বাইরে থেকে শাস্তির বিরুদ্ধে রাষ্ট্রকে রক্ষার জন্য সমষ্টিগত শক্তি নিয়োগের অধিকার -- এবং এ সবই সামাজিক কল্যাণের স্বার্থে'***। সমাজের সঙ্গে, নাগরিকের সঙ্গে রাজনৈতিক ক্ষমতার, অর্থাৎ রাষ্ট্রের সম্পর্কই হল লকের আলোচনার মূল বিষয়বস্তু, মধ্যযুগীয় ঈশ্বরতাত্ত্বিকেরা যেক্ষেত্রে এ প্রশ্ন তোলেই নি। তাদের কাছে সমাজ থেকে, পরিবার থেকে রাষ্ট্র অবিচ্ছিন্ন, নানা ধরনের সামাজিক সম্পর্ক ও বাধ্যবাধকতা থেকে রাজনৈতিক সম্পর্ক ও বাধ্যবাধকতার তফাৎ নেই।

অপিচ, চুক্তি তত্ত্বে রাষ্ট্রের চিরন্তনতা অস্বীকৃত। রাজনৈতিক ক্ষমতা

আর সমাজের অভিন্নতা না মেনে চুক্তি তত্ত্ব এই কথা থেকে এগোয় যে রাষ্ট্র ও সমাজ যুগপৎ নয়, যা বলেছিলেন ফিলমার প্রভৃতিরা। এ তত্ত্বে রাষ্ট্রহীন সমাজের সম্ভাবনা মানা হয়েছে। এটা যেমন রাষ্ট্রের সত্যকার মর্মার্থ অনুমানের দিক থেকে, তেমনি তার ঐতিহাসিক উদ্ভবের প্রশ্ন বিচারের বৈজ্ঞানিক সন্নিকটতার দিক থেকে একটা গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। রাষ্ট্রহীন সমাজের সম্ভাবনা লক মেনেছেন কেবল চুক্তি তত্ত্বের যুক্তিসম্মত ছক অনুসরণেই নয়, তাঁর জানা ঐতিহাসিক তথ্যের ওপর নির্ভর করেও। যেমন, তিনি দক্ষিণ আমেরিকার রেড-ইন্ডিয়ানদের জীবনযাত্রা নিয়ে ১৫৯০ সালে প্রকাশিত স্পেনীয় জেসুয়িট হোজে দে আকোস্তার গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন, যাতে বলা হয়েছিল যে আমেরিকার বহুলাংশে আদৌ কোনো রাজনৈতিক ক্ষমতা ছিল না*।

লকের মতে, রাষ্ট্রের আগে ছিল স্বাভাবিক অবস্থা। এ অবস্থা তিনি বাস্তব বলে মনে করতেন কি না, তা নিয়ে তর্ক উঠেছে। মার্কিন দার্শনিক স. প. ল্যাম্পরেখট, ইংরেজ দার্শনিক র কক্স প্রভৃতি একদল গবেষক মনে করেন যে লকের কাছে স্বাভাবিক অবস্থাটা হল 'কালের দিক থেকে... নাগরিক সমাজের পূর্ববর্তী... একটা বাস্তব ঐতিহাসিক পর্ব'। কেউ কেউ এটাকে ভাবেন একটা যৌক্তিক উদ্ভাবন। কোনো কোনো লেখক (ক. ম্যাকফার্সন, শ. উওলিন, জ. শশেট প্রভৃতি) মনে করেন, বিভিন্ন যেসব প্রসঙ্গ লক আলোচনা করেছেন সেই অনুসারে স্বাভাবিক অবস্থা বলতে কখনো তিনি বুঝিয়েছেন সত্যকার ঐতিহাসিক ঘটনাকে, কখনো রাষ্ট্রক্ষমতার মর্মার্থ ও রূপের নির্দিষ্ট একটা বোধ প্রতিপাদনের জন্য তাঁর কাছে প্রয়োজনীয় যৌক্তিক নীতিকে।

স্বাভাবিক অবস্থা বলতে লক যা বোঝেন সেটা টমাস হবসের ধারণার একেবারে বিপরীত। হবসের কাছে এ অবস্থাটা হল সবার সঙ্গে সবার যুদ্ধ, বলপ্রয়োগ ও স্বেচ্ছাচারের রাজত্ব, বিকট ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের হুল্লোড়, ব্যক্তির অধিকার নাশ। লকের মতে, স্বাভাবিক অবস্থার চরিত্র হল সামাজিক এবং অপেক্ষাকৃত সুশৃঙ্খল, স্বাভাবিক বিধির নিরিখে তা নিয়ন্ত্রিত। লক স্বাভাবিক বিধিকে বোঝেন জারি করা আইনের পূর্বাবস্থা বলে।

স্বাভাবিক বিধি হল এমন সব নিয়ম যাতে সর্বকালে নির্দিষ্ট হচ্ছে মানুষের আচরণ এবং তা দেখা দিয়েছে সুবুদ্ধি থেকে। এটাকে তিনি

কখনো বলেছেন ঈশ্বরের বিধান কখনো সুবুদ্ধির আইন, কখনো প্রকৃতির নিয়ম। আসলে স্বাভাবিক বিধি বলতে এক্ষেত্রে বোঝা হচ্ছে সমুচিত আইন, এমন ন্যায়বোধ যা মানুষের প্রকৃতিগত এবং নিজের চাহিদা ও দাবিকে অলঙ্ঘনীয় অধিকার বলে জ্ঞান করতে তাকে প্রবুদ্ধ করে।

লকের মতে, আইনের নিজের ধারণা অনুসরণ করায় সমাজের পক্ষে বিপর্যয়কর কোনো পরিণাম ঘটবে না। মানুষ প্রকৃতিগতভাবেই স্বার্থপর বা মারমুখী, এমন নয়। সুবুদ্ধি নিজের স্বার্থকে অন্যান্য লোকের স্বার্থের সঙ্গে মেলাবার দাবি করে তার কাছে। 'কর্মের এবং নিজের সম্পত্তি ও নিজের ওপর হুকুমদারির পূর্ণ স্বাধীনতার অবস্থা', 'সমতার অবস্থা যেখানে সমস্ত ক্ষমতা ও সমস্ত আইন পারস্পরিক, কেউ অন্যের চেয়ে বেশি পাচ্ছে না' — এই বলে স্বাভাবিক অবস্থার বর্ণনা দিয়ে লক এই কথাটা তুলে ধরেছেন যে এটা 'স্বেচ্ছাচারিতার অবস্থা' নয়*। প্রকৃতির নিয়ম, বা সুবুদ্ধি অন্যের জীবন, স্বাস্থ্য, স্বাধীনতা বা সম্পত্তির ক্ষতি না করার শিক্ষা দেয় লোককে। তিনি লিখেছেন: 'প্রকৃতির নিয়ম সমস্ত মানবজাতির জন্য দাবি করে শান্তি ও নিরাপত্তা'**। এইভাবে, আদর্শ ক্ষেত্রে স্বাভাবিক অবস্থাকে যেমন নিশ্চিত করতে হবে 'স্বাভাবিক নিয়মের সমস্ত অধিকার ও সুবিধার অবাধ উপভোগ ও পূর্ণ স্বাধীনতা', তেমনি মানবজাতির জন্য শান্তি ও নিরাপত্তাও। কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থায় এরূপ মিল নিশ্চিত করার মতো যন্ত্রব্যবস্থা এখনো মোটেই সুসম্পূর্ণ নয়, ফলে তার থেকে নাগরিক, অথবা রাজনৈতিক সমাজে বা রাষ্ট্রে (লক তিনটে কথাই ব্যবহার করেছেন একই অর্থে) উত্তরণ আবশ্যক হয়ে পড়ে।

লক বোঝেন যে 'এ দুনিয়ায় মানুষ সম্পর্কিত সমস্ত আইনের মতো প্রকৃতির নিয়মও নিষ্ফল যদি এই স্বাভাবিক অবস্থায় সে নিয়ম পালন করিয়ে নেবার ক্ষমতা কারো না থাকে এবং তাতে করে নির্দোষকে রক্ষা ও লঙ্ঘনকারীকে দমন না করা হয়'***। স্বাভাবিক অবস্থায়, যেখানে কোনো রকম রাজনৈতিক সংগঠন নেই, সেখানে প্রকৃতির নিয়মের পালন বাধ্যতামূলক করার ভার দেয়া যেতে পারে প্রত্যেক ব্যক্তিকেই, 'যার ফলে প্রত্যেক ব্যক্তিরই এ নিয়মের লঙ্ঘনকারীকে শাস্তি দেবার ততটা পরিমাণ অধিকার থাকে যাতে

এ লঙ্ঘন বাধাপ্রাপ্ত হতে পারে'*। বিচার-বিবেচনা ও বিবেকের দাবি দ্বারা অপরাধীকে শাস্তিদানের অধিকার সীমিত রেখেছেন লক, নির্দেশ দিয়েছেন যে শাস্তি হওয়া উচিত প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘনের সমানুপাতিক, তার একটাই উদ্দেশ্য — প্রতিশোধ ও হুঁশিয়ারি। কিন্তু তিনি মানেন যে এরূপ ব্যবস্থায় প্রকৃতির নিয়মের সর্বজনীন পালন, শান্তি ও স্বস্তি নিশ্চিত হয় না, যেমন নিশ্চিত হয় না লঙ্ঘনকারীদের অমোঘ ও ন্যায্য শাস্তি। যেমন নিয়ম লঙ্ঘন, তেমনি শাস্তির ক্ষেত্রে অনাচারের বিরুদ্ধে পূর্ণ গ্যারান্টি না থাকায়, লকের মতে, লোকে নিজ জীবনের শৃঙ্খলা বিধান, স্বাধীনতা ও সম্পত্তি রক্ষার উদ্দেশ্যে সামাজিক চুক্তির আবশ্যকতা মেনে নেয়।

'লোকেদের রাষ্ট্রে ঐক্যবদ্ধ হওয়া ও নিজেদেরকে সরকারের ক্ষমতাধীন করার এই বৃহৎ ও প্রধান লক্ষ্য' প্রসঙ্গে লক সম্পত্তি রক্ষার কথা বলেছেন**। কিন্তু এতে করে তিনি যে রাষ্ট্রের সত্যকার মর্মার্থ উদ্ঘাটনের, যে-শ্রেণী সংঘাত থেকে রাষ্ট্রের উদ্ভব ব্যক্তিমালিকানাকে তার মূল বলে বোঝার কাছাকাছি গিয়েছিলেন, এমন ধারণা অসঙ্গত। রাজনৈতিক সমাজের প্রকৃতি যে শ্রেণীভিত্তিক এ বোধ লকের ছিল না, সেটা আমরা পরে দেখব। ব্যক্তিগত মালিকানার রক্ষণ ও অলঙ্ঘনীয়তার যে ধ্বনিটা ছিল সতেরো শতকের ইংরেজ বুর্জোয়াদের কাছে অতি জরুরি, রাজা এবং পার্লামেন্টের মধ্যে অবিরাম সংঘাতের মূল কারণ, সেটাকে লক স্রেফ তুলে ধরেছেন তাত্ত্বিক পটে।

লক বলেছেন, স্বাভাবিক অবস্থায় সম্পত্তির নির্ভরযোগ্য রক্ষণের মতো সুনির্দিষ্ট, প্রতিষ্ঠিত আইন, জারি করা আইন অনুসারে সমস্ত ঝঞ্ঝাটের মীমাংসা করার ক্ষমতাসম্পন্ন বিজ্ঞ ও নিরপেক্ষ বিচারক এবং সর্বক্ষেত্রে ন্যায্য রায়কে প্রতিপালিত করাবার মতো শক্তির অভাব থাকে***।

নাগরিক সমাজকে যদিও প্রত্যেক ব্যক্তি কর্তৃক বিশৃঙ্খল ও অনির্ভরযোগ্য ক্ষমতা প্রয়োগ জনিত অসুবিধার পরিণাম বলে ঘোষণা করা হয়েছে, তাহলেও, হবসের বিপরীতে, এটা হল সুকঠিন আবশ্যিকতার বদলে বরং সুবুদ্ধিরই বিজয়।

লকের কাছে চুক্তির যে মর্মার্থ সেটারও হবসের ধারণা থেকে নীতিগত পার্থক্য আছে। চুক্তি বলতে লক হবসের মতো ক্ষমতা ত্যাগ করে পুরোপুরি

তা এক বা কতিপয় ব্যক্তির হাতে তুলে দেয়া বোঝান নি, তাঁর কাছে এটা হল শান্তিময় আর নিরাপদ জীবনের জন্য অন্যান্যদের সঙ্গে সহবসতিতে এক ব্যক্তির ঐক্যবদ্ধ হবার সম্মতি। এরূপ সম্মতিতে যেকোনো সংখ্যক লোক আসতে পারে, কেননা তার বাইরে যারা থেকে গেল তাদের কোনো ক্ষতি হচ্ছে না তাতে*। আগে যারা আলাদা আলাদা বাস করত তাদের একটা রাজনৈতিক দেহে পরিণতকরণের এরূপ চুক্তিতে লোকে প্রকৃতির নিয়ম পালন স্বাধীনভাবে নিশ্চিত করার যে অধিকার আগে ভোগ করত সেটা সহবসতি বা রাষ্ট্রের কাছে ছেড়ে দিচ্ছে, কিন্তু স্বাভাবিক যে অধিকার সেটা ত্যাগ করছে না। সম্মতির চরিত্রটা তাই সীমাবদ্ধ এবং কঠোরভাবে সুনির্দিষ্ট, সবচেয়ে ভালোভাবে লোকেদের স্বাধীনতা ও সম্পত্তি রক্ষার সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য আছে তার, সুতরাং রাষ্ট্রের সর্বশক্তিমত্তা এবং প্রজাদের পূর্ণ অধিকারহীনতা তাতে বর্তায় না।

সামাজিক চুক্তিতে উদ্ভব হচ্ছে রাষ্ট্রের, যাকে লক নাগরিক সমাজ ও রাজনৈতিক সমাজ বলেও উল্লেখ করেছেন। পারিভাষিক এই অস্পষ্টতার অর্থ এমন নয় যে নাগরিক সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে পার্থক্য লক আদৌ মানতেন না। এরূপ পার্থক্য স্বতই প্রতীয়মান হয় ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক, রাষ্ট্রক্ষমতার সীমা টানা ইত্যাদি ব্যাপারে তাঁর ধারণা থেকে।

সতেরো শতকে সামাজিক চুক্তিকে বোঝা হত দু'দিক দিয়ে: একদিকে তা actum unionis, অর্থাৎ এমন একটা জোট যার মাধ্যমে লোকে মিলিত হচ্ছে সমাজে, সহনাগরিক হয়ে উঠছে, অন্যদিকে তা actum subjectionis, অর্থাৎ এমন একটা জোট যার মাধ্যমে নাগরিকরা নির্দিষ্ট একটা শাসনব্যবস্থা স্থাপনে রাজি হচ্ছে। Actum subjectionis-কে ধরা যেতে পারে গৌণ চুক্তি বলে, যা উদ্ভূত হচ্ছে নাগরিক সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক চুক্তি থেকে। এই রকমের মত ছিল লকের সমসাময়িক জার্মান পুফেনডর্ফের। সামাজিক চুক্তির যে বর্ণনা লক দিয়েছেন সেটা টিপিক্যাল actum unionis, কয়েক জায়গায় তাকে তিনি 'প্রাথমিক চুক্তি' বলেই উল্লেখ করেছেন** অথচ কোথাও দ্বিতীয় চুক্তির কথা বলেন নি।

প্রাতিষ্ঠানিকতা এবং উদ্দেশ্যমূলকতা — দু'দিক থেকেই রাষ্ট্রের সংজ্ঞা দিয়েছেন লক। সমাজে ক্ষমতার অন্য সমস্ত রূপ থেকে রাজনৈতিক ক্ষমতার

যে পার্থক্য লক করেছেন, আগে যার কথা বলা হয়েছে, তা থেকে আসে যে রাষ্ট্র একটা নির্দিষ্ট রাজনৈতিক ব্যবস্থা। তার তিনটে লক্ষণের উল্লেখ করেছেন তিনি: সাধারণভাবে প্রতিষ্ঠিত আইন, বিচারালয়, লোকে যার শরণাপন্ন হতে পারে এবং যাতে কলহের মীমাংসা ও শাস্তিদানের ক্ষমতা ন্যস্ত আর শক্তি, যা ন্যায্য রায়ের পোষকতা করে তার প্রতিপালন নিশ্চিত করতে পারে*।

লকের মতে, রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য হল লোকেদের মঙ্গল ও নিরাপত্তা, সাধারণ কল্যাণ। সম্পত্তি রক্ষাকে রাষ্ট্রের বিশেষ ও প্রাথমিক কাজ বলে লক উল্লেখ করেছেন বহুবার।

রাষ্ট্রের উদ্ভব ও মর্মার্থের যে ছক দিয়েছেন লক তা নিতান্ত বাহ্যিক ও যুক্তিপন্থী। রাষ্ট্র, তার উদ্দেশ্য, যন্ত্রব্যবস্থা, ক্রিয়াকলাপের রূপ ও নীতিগুলিকে লক সুবুদ্ধির নির্দেশ বলে অভিহিত করেছেন। রাষ্ট্রের উদ্ভব ও মর্মার্থ বিষয়ে লকের যা যুক্তি, তাতে সামাজিক চিন্তা একেবারে অনুপস্থিত। রাষ্ট্রের প্রশ্নাদিতে বাহ্যিক-নিয়মতান্ত্রিক, বুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গির বনিয়াদ দিয়ে গেছেন তিনি, তাতে রাজনৈতিক অধিকার ও বাধ্যবাধকতার বিমূর্ত বাহকদেরই কেবল প্রাধান্য, নেই ইতিহাসের মূর্ত-নির্দিষ্ট একটা যুগের সামাজিক-রাজনৈতিক সংগ্রামের বাস্তব অংশীরা। তাঁর আগে রাজনৈতিক চিন্তার ইতিহাসে রাষ্ট্রের সামাজিক প্রকৃতি বিষয়ে প্রচুর তথ্যসমৃদ্ধ যেসব অনুমান দেখা দিয়েছিল, ঐতিহাসিক নয়, নিছক যুক্তির দিক দিয়ে রাষ্ট্রকে বিচার করতে গিয়ে লক তা সবই একেবারে অগ্রাহ্য করেছেন। যুক্তির অনুসরণে তিনি রাষ্ট্রকে দেখেছেন নাগরিকদের স্বার্থ রক্ষার যন্ত্র হিশেবে, তার যে একটা স্বাধীন তাৎপর্য আছে, তার যথার্থ মূল্যায়ন করেন নি, পরবর্তী কালে যা করেছেন রুসো এবং হেগেল। রাষ্ট্র সম্পর্কে এরূপ দৃষ্টিভঙ্গি থাকায় লক উদারনৈতিক-গণতান্ত্রিক এবং তাঁর কালের পক্ষে প্রগতিশীল কতকগুলি প্রস্তাবে উপনীত হয়েছেন বটে, তবে সেগুলি তাঁর দার্শনিক ও ঐতিহাসিক সীমাবদ্ধতারও সাক্ষ্য।

স্বাভাবিক অবস্থা থেকে রাষ্ট্রে উত্তরণ লকের কাছে তেমন একটা আমূল বিপ্লব বলে ঠেকে নি, যা মনে করেছিলেন হবস। তাঁর কাছে এর আসল কথা হল নিজস্ব সম্পত্তি, জীবন ও স্বাধীনতা রক্ষার যে স্বাভাবিক ক্ষমতা লোকেদের ছিল, সেটা তারা ত্যাগ করছে নবসৃষ্ট সহবসতির অনুকূলে।

পশ্চিমি রাজনীতিবিদ র. পালিনের মতে, স্বাভাবিক অবস্থায় লোকে যে নৈতিক সম্পর্ক ও বাধ্যবাধকতায় আবদ্ধ থাকে, আইনের ভিত্তিতে গঠিত রাষ্ট্রে তার স্থান নেয় রাজনৈতিক সম্পর্ক ও রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা*। এই পরিবর্তনটা লকের কাছে কেন্দ্রীয় একটা প্রশ্ন তোলে — যে স্বাধীনতা ও সমতা স্বাভাবিক অবস্থার বৈশিষ্ট্যসূচক, রাজনৈতিক সমাজে তার ভাগ্য কী হবে।

লক এই দৃঢ়োক্তি করেন যে রাজনৈতিক সমাজে স্বাধীনতা বজায় থাকে, এমনকি আইনাদি দ্বারা তা গ্যারাণ্টিকৃতই, কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থায় তা সর্বক্ষেত্রে নিশ্চিত বলে ধরা চলে না। লকের এই ভাবনাটা কিছু পরিমাণে রুসোর অগ্রগামী, যদিও স্বাধীনতাকে দুই মনীষী বুঝেছেন বিভিন্নভাবে। আইনাদির ভিত্তিতে চলে শাসক লোককে সত্য করেই স্বাধীন করে তুলতে পারে, রুসোর এই সিদ্ধান্ত ছিল লকের পক্ষে একেবারেই বিজাতীয়। অন্যদিকে, আবার তাঁর অবস্থান পুরোপুরি নাকচ করেছে হবসের তত্ত্বকে, যাঁর কাছে স্বাভাবিক অবস্থায় মানুষ যে সন্তোষ ও নিরাপত্তা থেকে বঞ্চিত ছিল, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বিসর্জনে তার মূল্য পরিশোধ হয়। হবস থেকে লকের পার্থক্য এই যে ব্যক্তি স্বাধীনতা তাঁর কাছে সামাজিক কল্যাণের অতি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, এক দিক থেকে এমনকি তার ভিত্তিই। লকের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে স্বাধীনতা হারালে লোকের জীবন ও সম্পত্তি বিপন্ন হবে, কেননা এগুলি রক্ষার অন্য কোনো উপায় তার নেই। নাগরিকদের স্বাধীনতা লুপ্ত হলে স্বৈরশাসন প্রয়োজন বোধ করলে তাদের শ্রীবৃদ্ধির ওপরেও হামলা করতে পারে। 'পরম, স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতা থেকে স্বাধীনতা মনুষ্য রক্ষার জন্য এত বেশি আবশ্যক এবং তার সঙ্গে এত বেশি জড়িত যে মানুষ নিজের নিরাপত্তা ও জীবন বিপন্ন না করে সে স্বাধীনতা থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারে না,'** লিখেছেন লক। কেবল স্বাধীনতাতেই নিশ্চিত হয় শান্তি ও কল্যাণ, তা হারালে মানুষ অন্য যেসব অধিকার নিয়ে জন্মায়, তা সবই খোয়া যায়।

স্বাধীনতার একটা বাস্তব ভাষ্য লকের বৈশিষ্ট্য, তাতে যেমন ব্যক্তিগত চাহিদা ও প্রবণতা, তেমনি সমাজে লোকেদের সঙ্গে একত্রে থাকার

প্রয়োজনীয়তার কথাও ধরা হয়েছে। এ ব্যাখ্যা ফিলমার ও হবসের দৃষ্টিভঙ্গির বিরোধী। নীতিগতভাবে তাঁরা স্বাধীনতাকে নস্যাৎ করেছেন এই ভেবে যে প্রকৃতিগতভাবেই তা কোনো কিছুতে সীমিত থাকতে পারে না, সুতরাং তার পরিণাম বিপর্যয়কর, তা থেকে উদ্ধারের একটাই উপায় — সীমাহীন রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রতিষ্ঠা। লক লিখেছেন স্বাধীনতা 'তা নয় যা আমাদের বলেন রবার্ট ফিলমার, যথা: 'যার যা ইচ্ছা সেরকম আচরণ, যার যা খুশি সেভাবে দিনযাপন, কোনো আইনে আবদ্ধ না থাকাই হল স্বাধীনতা।' সরকারের অধীনস্থ লোকেদের স্বাধীনতা হল জীবনের জন্য সুস্থির নিয়ম পাওয়া, যা এ সমাজের প্রত্যেকের পক্ষে একই এবং যা জারি করেছে সে সমাজে গঠিত আইনপ্রণয়নী ক্ষমতা; এটা হল আইন নিষিদ্ধ না করলে সর্বক্ষেত্রে আমার নিজস্ব ইচ্ছা পালনের স্বাধীনতা, অন্য ব্যক্তির অস্থির, অনির্দিষ্ট, অজ্ঞাত স্বৈরাচারী ইচ্ছার অধীনস্থ না হওয়া। অন্যদিকে স্বাভাবিক স্বাধীনতা হল প্রকৃতির নিয়ম ছাড়া আর কিছুতেই আবদ্ধ না থাকা'*।

এইভাবে লকের কাছে স্বাধীনতা মানে অরাজকতা নয়, ব্যক্তির স্বেচ্ছাচারের অধিকার নয়, অপরের স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে গ্যারাণ্টি। ব্যক্তিকে অনুসরণ করতে হবে প্রাকৃতিক নিয়মের নির্দেশ, যা রূপ নিয়েছিল রাজনৈতিক সমাজের পরিস্থিতিতে উপযুক্ত রূপে গৃহীত রাষ্ট্রের আইনে। আইন পালনকে দেখা হচ্ছে সত্যকার স্বাধীনতার সংকোচন নয়, তার শর্ত বলে। লকের মতে, স্বাধীনতা আইন থেকে অবিচ্ছেদ্য। তিনি লিখেছেন: 'যতরকম অপব্যাখ্যা সত্ত্বেও নিয়মের লক্ষ্য হল স্বাধীনতার উচ্ছেদ নয়, সংকোচন নয়, তার সংরক্ষণ ও প্রসার। কেননা আইনকানুন পেতে সক্ষম এমন জীবিত প্রাণীর সমস্ত অবস্থাতেই, যেখানে আইন নেই, সেখানে স্বাধীনতাও নেই'**।

লক মানেন যে রাজনৈতিক সমাজ স্থাপন করলে তার সমস্ত শরিকদের ওপর নির্দিষ্ট কিছু দায়িত্ব বর্তায়, যার কাজ হল সে সমাজের স্বাভাবিক, অর্থাৎ সম্মতিভিত্তিক পরিচালনীয় বিকাশকে নিশ্চিত করা। অধিকাংশের অভিপ্রায় এরূপ একটা দায়িত্ব বলে লক মনে করেন। লকের চিরাচরিত ভাষ্যে স্বাধীনতা এবং ব্যক্তির জন্মগত অধিকারকে মেলানো হয় অধিকাংশের

অধীনতা মানার সঙ্গে, এই ব্যাখ্যা দিয়ে যে ওটা মোটামুটি আইনকানুন মানাকে তারা যেভাবে বোঝে সেইভাবে, অর্থাৎ একই সমাজের কাঠামোর মধ্যে লোকেদের অস্তিত্বের ক্ষেত্রে অপ্রযোজ্য একটা শর্ত বলে, যা মোটেই নাগরিকদের মূল অধিকারের অলঙ্ঘনীয়তার বিরুদ্ধে যাচ্ছে না। লক অধিকাংশের ক্ষমতাকে কিভাবে দেখেছেন সে সমস্যা নিয়ে মার্কিন গবেষক উই. কেণ্ড্যাল একটা বিশেষ মনোগ্রাফ লিখেছেন, তাতে তিনি একটা চলতি মত খণ্ডন করার চেষ্টা করেছেন এই প্রশ্ন তুলে -- লকের কাছে কোনটা বড়ো — অধিকাংশের শাসন নাকি ব্যক্তির অধিকার।

কেণ্ড্যাল মন্তব্য করেছেন, লক যে অধিকাংশের শাসনকে অগ্রাধিকার দেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। 'ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রিন্স' বলে লকের যে মূল্যায়ন প্রচলিত, তাকে তিনি ভুল মনে করেন এবং ঘোষণা করেছেন ব্যক্তির 'অচ্ছেদ্য' অধিকারের রক্ষকের খ্যাতি লক কেমন করে অর্জন করলেন বোঝা কঠিন, সেইসঙ্গে জোর দিয়ে বলেন যে, খোদ 'অচ্ছেদ্য অধিকার' শব্দটাই সম্ভবত লকের নয়*। তিনি মনে করেন যে আইন পালন নাগরিকদের কর্তব্য, লকের এই ঘোষণাটাই তাঁর দর্শনতন্ত্রের ওরূপ বোধের বিরোধী।

কেণ্ড্যাল মনে করেন, একসারি গবেষক যে ভাবেন যে লক রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব মানেন নি, ব্যক্তির অধিকার, প্রকৃতির নিয়ম দিয়ে তাকে সীমাবদ্ধ করেছেন, সেটা বাস্তবানুসারী নয়। যেমন, স. ল্যাম্পরেখট লিখেছেন: 'নাগরিক শাসন সম্পর্কে লকের আলোচনায় বেশি গুরুত্বপূর্ণ সেটা নয়, যা তাতে বলা হয়েছে, সেইটে যা বলা লেখক এড়িয়ে গেছেন। লকের অতি উল্লেখযোগ্য একটা দিক হল এই যে রাষ্ট্র বিষয়ে তিনি পুরো একটা গ্রন্থ রচনা করতে পারলেন সার্বভৌমত্ব কথাটা একবারও উল্লেখ এবং তার অর্থটার অবতারণা না করে'**। চিরাচরিত এই যে দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে সমগ্র জনগণের, অধিকাংশ জনগণের সীমাহীন সার্বভৌমত্ব লক অনুমোদন করতে পারেন না, তা কেণ্ড্যাল খণ্ডন করেছেন। তিনি জোর দিয়ে বলেছেন, যে নীতিগুলোকে সাধারণত রুসোর বলে ভাবা হয়, তা প্রথম প্রস্তাব করেন

লক। বিশেষ করে তিনি বলেছেন লকের জন-সার্বভৌমত্ব তত্ত্বের কথা। 'ব্যক্তি — রাষ্ট্র' সমস্যায় প্রযোজ্য এই নীতিগুলিতে সূচিত হয়েছে অধিকাংশের অভিপ্রায়ের নিকট পরম ও অবিরাম বাধ্যতা এবং অধিকাংশের পক্ষ থেকে ব্যক্তির ওপর তাদের সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেবার শর্তহীন অধিকার। 'এমন কথা লক কখনো বলেন নি যা রুসো বলেছেন যথা, লোকে যদি নিজের অনিষ্ট করতে চায়, তাহলে তা থেকে তাকে বাধা দেবার অধিকার কারো নেই,' — লিখেছেন কেণ্ড্যাল। 'কিন্তু তিনি যে তা বিশ্বাস করতেন, তাঁর রাজনৈতিক ব্যবস্থা তার পরিচায়ক'*। রুসোর ধাঁচে লকের ভাষ্য লকের আধুনিক ব্যাখ্যানে রাষ্ট্রের অনুকূলে ব্যক্তি — রাষ্ট্র সংঘর্ষের অকুণ্ঠ মীমাংসার একমাত্র রূপভেদ নয়। ম. সেলিগার লিখেছেন: 'লকের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ সাগ্রহে যৌথকে ওপরতলার অধিকার ছেড়ে দেয়'**। এটা বড়ো একটা ঠিক নয়। লক নিঃসন্দেহে ভাবতেন যে রাষ্ট্রের কাঠামোর অভ্যন্তরে সামাজিক ও ব্যক্তিগত স্বার্থের মিল থাকা আবশ্যক, কিন্তু তিনি মনে করতেন এ দুটি মেলানো সম্ভব ও আবশ্যক, তাই সংঘাতমূলক পরিস্থিতির সমাধান দেবার লক্ষ্য তিনি গ্রহণ করেন নি, তত্ত্বে যৌক্তিক স্পষ্টতা আনার চেষ্টায় কেণ্ড্যাল যা উত্থাপন করেছেন, যদিও তাঁর নিজেরই স্বীকৃতি অনুসারে সে তত্ত্ব কিছু কিছু স্ববিরোধ থেকে মুক্ত নয়।

স্বাভাবিক বিধির আদর্শে লক মানুষের স্বাধীনতা সংকোচন স্বীকার করেন, কিন্তু সে সংকোচনই তিনি প্রসারিত করেছেন সমাজ বা রাষ্ট্রের ওপরেও। ব্যক্তি ও সমাজ উভয়কেই চালিত হতে হবে প্রকৃতির নিয়ম দিয়ে। শেষোক্তটাই তাদের স্বাধীনতা ও অস্বাধীনতা, অধিকার ও কর্তব্যের মানদণ্ড। কিন্তু এই নিয়মের কাজ নিরাপত্তার পরিস্থিতিতে লোকেদের নিজস্ব অধিকার ভোগের সুযোগ করে দেয়া। লকের মতে, মানুষ রাজনৈতিক সমাজ সচেতনভাবে গড়ে তোলে এই উদ্দেশ্যেই, সামাজিক কল্যাণে নিজেরই স্বার্থের গ্যারাণ্টি দেখতে পাওয়ায় মানুষের উচিত তাতে সহায়তা করা।

তবে সাধারণ কল্যাণকে মোটেই একটা ভক্তিবস্তু করে তোলেন নি লক। এ কল্যাণ যদি ব্যক্তির কল্যাণের সঙ্গে খাপ না খায়, তাহলে তাঁর কাছে সেটা হয়ে দাঁড়ায় উদ্ভট। সাধারণ কল্যাণের সেবা করতে নাগরিক বাধ্য ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ তার মূল স্বার্থই এতে বিপন্ন না হচ্ছে। তিনি লিখেছেন:

'আমাদের প্রত্যেকের কর্তব্য যেহেতু নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা এবং ইচ্ছে করে নিজের পদ ত্যাগ না করা, ওই একই কারণেই, তার জীবন যখন বিপন্ন নয়, তখন মানবজাতির বাকি অংশকে যতটা পারে বাঁচিয়ে রাখাও তার কর্তব্য'*। এখানে নিঃসন্দেহেই মানুষকে দেখা হচ্ছে সমাজের কেন্দ্র ও লক্ষ্য রূপে; যৌথের ওপর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের অগ্রাধিকারে সংশয়ের অবকাশ নেই। লকের সমগ্র রাজনৈতিক ব্যবস্থাটা মানুষের মৌল অধিকার রক্ষার স্বার্থে নিষিক্ত। সে ব্যবস্থাটা এমনভাবে কল্পিত যাতে ব্যক্তিগত ও সামাজিক স্বার্থকে মিলিয়ে সমাজের পক্ষ থেকে প্রকৃতির নিয়মবিরোধী অসিদ্ধ হামলা থেকে ব্যক্তিকে রক্ষা করা যায়। এ লক্ষ্য সাধনের জন্য লক একরাশি উপায় বাতলেছেন। এমন অধিকার প্রতিষ্ঠা যা রাষ্ট্র লঙ্ঘন করতে পারবে না এবং তদ্দ্বারা তার ক্রিয়াকলাপ সংকোচন; রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপের ভিত্তি হিশেবে নাগরিকদের সম্মতির নীতি প্রবর্তন এবং স্বৈরশাসন প্রতিরোধের বৈধ উপায় হিশেবে জনগণের অভ্যুত্থানের স্বীকৃতি; এবং শেষত শাসনক্ষমতা পৃথক করা ও আইনসঙ্গতির মতো রাজনৈতিক ব্যবস্থার নীতি প্রবর্তন।

লক সরাসরি সেইসব 'সীমার' কথা বলেছেন 'যা সমাজ প্রদত্ত ক্ষমতা এবং ঈশ্বর ও প্রকৃতির নিয়ম সমস্ত ধরনের শাসনে সর্বপ্রকার রাষ্ট্রের আইনপ্রণয়নী (অর্থাৎ সর্বোচ্চ—**লেখক**) ক্ষমতার জন্য স্থির করে দিয়েছে'**। তিনি মনে করেন যে সর্বোচ্চ ক্ষমতা 'জনগণের জীবন ও সম্পত্তির ব্যাপারে চরম স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠতে পারে না', 'স্বেচ্ছাচারী স্বৈরতান্ত্রিক হুকুমনামা মারফত শাসনের অধিকার স্বহস্তে নিতে পারে না, বরং তা ঘোষিত ও স্থায়ী আইনকানুন এবং খ্যাতনামা ক্ষমতাপ্রাপ্ত বিচারকদের মারফত ন্যায় বিচার ও প্রজাদের অধিকার ধার্য করে দিতে বাধ্য', 'কোনো লোকের সম্মতি ব্যতীত তাকে তার সম্পত্তির অংশ থেকে বঞ্চিত করতে পারে না' এবং 'অন্য কোনো হস্তে আইনপ্রণয়নের অধিকার সম্প্রদান করতে পারে না'***।

ক্ষমতার ওপর এই নিষেধের যুক্তির প্রকৃতি একই ধাঁচের। লোকে স্বাভাবিক অবস্থায় যেসব অধিকার ও স্বাধীনতা ভোগ করত তা রক্ষার জন্য, অথবা আরো সঠিকভাবে বললে সেইসব অধিকার ও স্বাধীনতা দ্বারাই

ক্ষমতা সংকুচিত করা হচ্ছে। তিনি লিখেছেন: 'প্রকৃতির নিয়ম সমস্ত লোকের ক্ষেত্রে, যেমন অন্য লোকেদের ক্ষেত্রে, তেমনি সমপরিমাণে আইনপ্রণেতাদের ক্ষেত্রেও একটা শাশ্বত পরিচালন নীতি। যেসব আইন তারা অন্য লোকেদের ক্রিয়াকর্ম পরিচালনার জন্য রচনা করে, সেগুলি, তথা তাদের নিজেদের ক্রিয়াকর্ম, যেমন অন্য লোকেদের ক্রিয়াকর্ম হওয়া উচিত প্রকৃতির নিয়ম, অর্থাৎ সেটায় যার অভিব্যক্তি সেই ঐশ্বরিক অভিপ্রায় অনুযায়ী'*।

মানুষের স্বাভাবিক অধিকারগুলির সর্বপ্রথমটা, যেটার ওপর রাজক্ষমতা হানা দিতে পারে না, লকের মতে, সেটা হল সম্পত্তির অধিকার। এটা আপাতিক নয় যে তিনি বিশেষ করে এবং বহুবার এই কথায় জোর দিয়েছেন যে, মানুষের সম্মতি বিনা তাকে তার সম্পত্তির অংশ থেকে বঞ্চিত করা, অথবা তার সম্পত্তির কর বাড়িয়ে দেয়া চলতে পারে না, বহুবার এও বলেছেন যে নাগরিক সমাজ গড়া হয় সম্পত্তি রক্ষার জন্য**।

সম্পত্তির ব্যাপারে লকের ধারণার বুর্জোয়া চরিত্র অসাধারণ প্রকট। আরিস্টটলের ঐতিহ্য অনুবর্তন করে লক সম্পত্তির মধ্যে কেবল লোকের মুক্তি ও স্বাধীনতার ভিত্তি দেখেন না, প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে সমাজ সংগঠনের ভিত্তিও দেখেন। মাঝে মাঝে তিনি অন্য সমস্ত স্বাভাবিক অধিকারকেও সম্পত্তি কথাটার অন্তর্গত করে নেন। তিনি লিখেছেন, মানুষ প্রকৃতিগতভাবেই 'নিজের সম্পত্তি, অর্থাৎ নিজের জীবন, স্বাধীনতা ও জিনিসপত্র' রক্ষার অধিকারী***। ব্যক্তিগত মালিকানাকে একটা চিরন্তন প্রথা বলে গণ্য করেছিলেন লক, সম্পত্তি উদ্ভবের একটা শ্রম তত্ত্বও তিনি পেশ করেন: 'প্রকৃতির দ্বারা সৃষ্ট ও প্রদত্ত সামগ্রী থেকে মানুষ যা আহরণ করে তাকে সে নিজের পরিশ্রমের সঙ্গে, এমন একটা কিছুর সঙ্গে সংযুক্ত করে যা তার নিজস্ব এবং এতে করে এটাকে সে তার সম্পত্তি করে****।

সম্পত্তির উদ্ভব হয় ব্যক্তিগত শ্রমের ফলে। সাধারণ মালিকানার বিষয় হতে পারে কেবল শ্রম নিয়োগ করার আগে পর্যন্ত প্রাকৃতিক দ্রব্য। মানবজাতির ইতিহাসের যৌথ পর্যায়টা অগ্রাহ্য করা, ব্যক্তিগত মালিকানার

প্রথাকে চিরন্তন ও একটা ভক্তিবস্তু করে তোলা এরকম দৃষ্টির অবৈজ্ঞানিকতা রুশ ঐতিহাসিক ও ব্যবহারশাস্ত্রী ম. ম. কভালেভস্কিরও চোখে পড়েছিল, যিনি আদিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে যৌথ ধরনের শ্রম ও সামাজিক মালিকানার বহুল প্রচলনের উল্লেখ করেছেন।

স্বাভাবিক অবস্থায় মালিকানার কথা বলতে গিয়ে লক তাকে একটা পরিধির মধ্যে সীমিত করেছেন। এই পরিধির ভেতর পড়ে ব্যক্তিগত শ্রম, যাতে কল্যাণ হবে, অর্থাৎ যা ভোগ করা যাবে, তা আত্মসাৎকরণ এবং এই আত্মসাতে অন্য কারো ক্ষতি হবে কি না, তা নিয়ে ভাবনা তোমার নৈতিক দায়িত্ব। এই ভিত্তিতে কেন্ড্যাল চেষ্টা করেছেন লক ব্যক্তিগত মালিকানার সমর্থক বলে প্রচলিত ধারণাটা খণ্ডন করতে। তিনি লিখছেন: 'মালিকানার অধিকারকে তিনি দেখেছেন স্রেফ মানবজাতির সাধারণ উত্তরাধিকারকে সমৃদ্ধ করার যে কর্তব্য আছে মানুষের, তদনুভূত বলে। স্বাভাবিক অবস্থায় মালিকানার অধিকারের যে ব্যাখ্যা লক দিয়েছেন, সেটা পুরোপুরি যৌথ ধারণাগুলির ওপর সমূহ প্রতিষ্ঠিত এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের আধুনিক সমালোচকেরা মালিকানা সম্পর্কে যে ফাংকশানাল দৃষ্টি গ্রহণ করেছেন কার্যত তার অনেক কাছাকাছি'*।

লক ব্যক্তিগত মালিকানার বিচক্ষণতা ও উপকারিতা দেখাবার চেষ্টা করেছেন শুধু ব্যক্তিগত নয়, সাধারণ কল্যাণের দৃষ্টিকোণ থেকেও। এই উদ্দেশ্যে তিনি যেসব যুক্তির আশ্রয় নিয়েছেন তাতে তিনি ব্যক্তিগত মালিকানার এমন সমস্ত সমর্থকেরই কাছাকাছি আছেন, যাঁরা অনিবার্যই এই থিসিস দেন যে ব্যক্তিগত মালিকানা হল অতি বিভিন্ন প্রকারভেদে সামাজিক স্বার্থ পুষ্টির একটা রূপ — তার মধ্যে পড়ে দরিদ্রদের জন্য বদান্যতা ও যত্নের খ্রিস্টীয় ভাবনা থেকে শুরু করে ব্যক্তিগত মালিকানার 'সামাজিক ক্রিয়া' সম্পর্কে আধুনিক বুর্জোয়া তত্ত্ব পর্যন্ত সবই। সম্পত্তি উদ্ভবের যে 'শ্রম তত্ত্ব' তিনি দেন, সেটা থাকে এইরকম ঘোষণায়: 'আমার ভৃত্য যে চাপড়া কেটেছে ... কোনোরকম হুকুমনামা বা কারো সম্মতি ছাড়াই তা হয়ে যায় আমার সম্পত্তি। যে শ্রম ছিল আমার এবং সাধারণ অধিকারের অবস্থা থেকে একটা জিনিস আহরণ করার জন্য যা ব্যয় করা হল, তাতে সম্পত্তির অধিকার প্রতিষ্ঠিত করল সেই শ্রম।'**

বুর্জোয়া বিজ্ঞান সমগ্রভাবেই লককে গণ্য করে ব্যক্তিগত নিজস্ব মালিকানা এবং প্রাক্‌একচেটিয়া পুঁজিবাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সমর্থক বলে। যেমন, রাজনৈতিক মতবাদের ইতিহাস বিষয়ে গবেষক জ. সাবিন লিখেছেন যে স্বাভাবিক বিধিতে সমাজের সাধারণ কল্যাণ নির্দিষ্ট হয় এই পুরনো তত্ত্বের স্থলে লক নিয়ে এসেছেন 'জন্মগত অবিচ্ছেদ্য ব্যক্তিগত যে-অধিকার সমাজের ক্ষমতাকে সংকুচিত করে এবং ব্যক্তি মানুষের স্বাধীনতা ও সম্পত্তির ওপর হামলার প্রতিবন্ধক হয়ে থাকে, তাদের সমষ্টিকে'*। বুর্জোয়া গবেষকরা উল্লেখ করেছেন যে লক যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী তত্ত্ব দিয়েছেন, তা তেমনি একটা কিছু যা কোক ও ব্ল্যাকস্টোনের মতো ইংরেজ ব্যবহারশাস্ত্রীদের প্রবুদ্ধ করেছে মালিকানাকে অন্যান্য সমস্ত অধিকারের ঊর্ধ্বে 'স্বাভাবিক বিধি' হিশেবে দেখতে।

রাষ্ট্রীয় ক্রিয়াকলাপের সুনির্দিষ্ট আত্মিক সীমাও ধার্য করেন লক, চেষ্টা করেন মানুষের অন্তর্জগতে তার হস্তক্ষেপে বাধা দিতে। আর মতামতের কথা ধরলে, তিনি বলেছেন, প্রত্যেকেই হল সর্বোচ্চ ও পরম কর্তৃত্ব। এই নীতিতে গ্রথিত তাঁর 'ধর্মে সহনশীলতা বিষয়ে পত্র', যাতে গির্জা ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক এবং অন্যধর্মাবলম্বীদের ওপর গির্জার প্রভাবপাতের রূপ আলোচিত হয়েছে।

ধর্মীয় শাসনতন্ত্র এবং ধর্মের ব্যাপারে রাষ্ট্রের সর্ববিধ হস্তক্ষেপের বিরোধী ছিলেন লক। তিনি মনে করেন যে রাষ্ট্রের একমাত্র প্রযত্ন হওয়া উচিত সামাজিক শান্তি রক্ষা, মানুষের আত্মার সঙ্গে তার সম্পর্ক নেই। প্রাধান্যকারী গির্জাকে এক ধরনের রাষ্ট্রসংগঠনে পরিণতির বিরুদ্ধে ছিলেন লক, গির্জার পক্ষ থেকে চাপ দেবার ঐহিক পদ্ধতির, অর্থাৎ বলপ্রয়োগের তিনি বিরুদ্ধে। গির্জাকে তিনি দেখেন এক ধরনের স্বেচ্ছাভিত্তিক সম্প্রদায় বলে, যার নিয়মকানুন প্রযোজ্য কেবল তার সদস্যদের ওপর, তার সর্বোচ্চ শাস্তি হতে পারে কেবল ধর্মবিশ্বাসীদের সম্প্রদায় থেকে বহিষ্কার। ধর্মের ব্যাপারে সহনশীলতার প্রচার করেন লক এবং মনে করেন যে ধর্মের প্রশ্নে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে শাস্তিদান সম্ভব কেবল যদি এমন মত প্রচারিত হতে থাকে যা রাষ্ট্রের বা সামাজিক শান্তির পক্ষে বিপজ্জনক। লকের মতে, আত্মিক ব্যাপারে স্বাধীনতাও অন্তহীন নয়। নৈতিকতা ও শৃঙ্খলার বিবেচনা দ্বারা তা সীমিত। এই ভিত্তিতে লক 'ইউরোপীয় সমাজব্যবস্থার

সঙ্গে সঙ্গতিহীন' মহম্মদীয় ধর্ম, ক্যাথলিক ধর্ম যা ধর্মে সহনশীলতার নীতিই লঙ্ঘন করে এবং নিরীশ্বরবাদ, লকের মতে, আইন ও শৃঙ্খলার সন্তোষজনক গ্যারান্টি যাতে নেই, এ ছাড়া তিনি ধর্মের প্রশ্নে যেকোনো ধরনের মতামত ইংলন্ডে থাকতে দেবার পক্ষপাতী। ক্যাথলিক ধর্মের বিরোধিতা এসেছে সেসময়কার রাজনৈতিক বিবেচনা, পোপ ও ফ্রান্সের সঙ্গে রাজক্ষমতার ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের আশংকা থেকে।

এইভাবে, লকের মতে, নাগরিকদের স্বাভাবিক অধিকার এবং তাদের মধ্যে সবচেয়ে যা গুরুত্বপূর্ণ সেই মালিকানা হল রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপে প্রথম সীমারোপ। হবসের সঙ্গে তাঁর তফাৎ এই যে এ অধিকারের উদ্ভব নাগরিক সমাজে নয়, স্বাভাবিক অবস্থা থেকে তা চলে এসেছে, তাই তাদের ঊর্ধ্বতনতা বজায় রেখেছে রাষ্ট্রের ওপরে, যা গড়া হয়েছে সেগুলির সেরা নিশ্চিতির জন্য।

রাষ্ট্র কর্তৃক পরম ক্ষমতা জবরদখলের বিরুদ্ধে গ্যারান্টির আরেকটা রূপ হল, লকের মতে, 'সম্মতির' ধ্যানধারণা। পিতৃপুরুষেরা সামাজিক চুক্তি করেছে বলে ধরে নেয়া হয়, তাহলে তারা এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যা উত্তরপুরুষদের কাছে বাধ্যতামূলক হয়ে দাঁড়াচ্ছে, সুতরাং শেষোক্তদের পক্ষে তা অগণতান্ত্রিক, সামাজিক চুক্তিবিষয়ক তত্ত্বের বিরুদ্ধে এই যে তিরস্কার করেছিলেন বিশেষ করে ফিলমার, তা থেকে রক্ষা পাবার একটা গুরুত্বপূর্ণ পরিপূরক তত্ত্ব হল 'সম্মতি'।

লক বলেছেন: 'শিশু কোনো দেশের বা সরকারের প্রজা হয়ে জন্মায় না। সে থাকে নিজ পিতার অভিভাবকত্বে ও ক্ষমতাধীনে যতদিন না সাবালক হচ্ছে আর তখন স্বাধীন মানুষ হিশেবে সে বেছে নিতে পারে কোন সরকারের ক্ষমতাধীনে সে থাকতে চায়, কোন রাষ্ট্রিক সংগঠনের সদস্য হতে সে ইচ্ছুক।... কোনো একটা সরকারের ক্ষমতাধীনে জাত স্বাধীন লোকেদের সম্মতিই কেবল তাদের এ রাষ্ট্রের সদস্য করে, আর এ সম্মতি পাওয়া যায় আলাদা অলাদা ভাবে, পালা করে, যে যেমন সাবালকত্ব লাভ করছে সেই অনুসারে, বহু লোক একসঙ্গে নয়, তাই লোকে এটা লক্ষ করে না, ভাবে যে ওটা মোটেই ঘটছে না, অথবা তা বাধ্যতামূলক নয়, এবং সিদ্ধান্ত করে যে প্রকৃতিগতভাবেই তারা যেমন মানুষ, তেমনি প্রজা।'*

প্রজা হবার অভিব্যক্ত এবং নীরব সম্মতির মধ্যে পার্থক্য টেনেছেন

লক এবং মনে করেন যে কেবল অভিব্যক্ত সম্মতিই মানুষকে সমাজের সত্যকার সদস্য, তার সরকারের প্রজা করে তোলে। পরিষ্কার ইচ্ছাপ্রকাশ মারফত যে কোনো একটা রাষ্ট্রের সদস্য হবার সম্মতি জানিয়েছে, তাকে 'চিরকাল এবং অপরিবর্তনে সেই রাষ্ট্রের প্রজা থাকতে হবে, ফের কখনো সে স্বাভাবিক অবস্থার স্বাধীনতা ভোগ করতে পারবে না'*। যারা জমি অথবা বাসস্থানের মালিকানা ত্যাগে নীরব সম্মতি দিয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা অন্যরকম। সেক্ষেত্রে মালিকানা ত্যাগে প্রজারূপে আনুগত্য পরিবর্তন সম্ভব হয়।

লকের সম্মতি তত্ত্বের আরো একটা দিক আছে, সেটা সরকারের ক্রিয়াকলাপের ওপর নাগরিকদের নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে, চুক্তি অনুসারে সরকারের ওপর যে কর্তব্য বর্তেছে তা কতটা সে স্বেচ্ছায় পালন করছে তার অবিরাম তদারকির সঙ্গে জড়িত। সম্মতি নীতির এই দিকটা লককে পেঁছে দিয়েছে জনগণের সার্বভৌমত্বের ধারণায়, যদিও সেটা তিনি রুসোর মতো পুরো বিকশিত করেন নি। আইনপ্রণয়নকে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতা বলে মনে করলেও লক সেই সঙ্গে এই কথায় জোর দিয়েছেন যে ও ক্ষমতাটা হল 'কেবল দায়িত্বপ্রাপ্ত ক্ষমতা, যাকে কাজ করতে হবে নির্দিষ্ট কতকগুলি লক্ষ্যে, সুতরাং জনগণ যখন দেখে যে আইনপ্রণয়নী ক্ষমতা তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব অগ্রাহ্য করে কাজ করছে, তখনই আইনপ্রণয়নী সংস্থাকে উচ্ছেদ অথবা পরিবর্তনের সর্বোচ্চ ক্ষমতা জনগণের হাতেই থেকে যাচ্ছে...।'** এ থেকে তিনি এই সিদ্ধান্ত করেছেন যে সরকার কর্তৃক দলিত স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের জন্য অভ্যুত্থানের অধিকার আছে জনগণের। অভ্যুত্থান হল সম্মতি না থাকার ফল, তবে সেটা ব্যক্তির অসম্মতি নয়, যৌথ, গণ অসম্মতি।

অভ্যুত্থানের অধিকারটা '১৬৮৮ সালের শ্রেণী আপোসের সন্তানের' সাধারণ নরমপন্থী, উদারনৈতিক রাজনৈতিক কর্মসূচির সঙ্গে খানিকটা মেলে না। এটা এসেছিল তাঁর সামাজিক-রাজনৈতিক সহানুভূতি থেকে নয়, রাজক্ষমতা কর্তৃক ব্রিটিশ বিপ্লবের সুকৃতি হরণের বাস্তব বিপদাশঙ্কা থেকে।

লক অনুসারে, সামাজিক চুক্তি হল দ্বিপাক্ষিক দায়-দায়িত্ব। রাষ্ট্রক্ষমতা যদি তার শর্ত লঙ্ঘন করে, জনগণের সম্মতির ওপর নয়, রূঢ় শক্তির ওপর

নির্ভর করে শাসন চালায়, জনগণও তাহলে আর চুক্তিবদ্ধ থাকে না। তারা তখন যেন ফিরে আসে স্বাভাবিক অবস্থায়, যেখানে প্রত্যেকে নিজেই নিজের অধিকার নিশ্চিত করে এবং সে উদ্দেশ্যে বলের আশ্রয় নিতে পারে। লক লিখেছেন: 'সমস্ত অবস্থা ও পরিস্থিতিতে স্বেচ্ছাচারের শক্তির বিরুদ্ধে সেরা উপায় হল শক্তি দিয়েই তার প্রতিরোধ। ক্ষমতাধিকার না থাকলে যে শক্তি প্রয়োগ করে, সে আগ্রাসক গিয়ে দাঁড়ায় যুদ্ধের অবস্থায় এবং তদনুসারী উপায়ে তার সঙ্গে আচরণের অধিকার মেলে।'* শক্তির আশ্রয় গ্রহণকে লক সঙ্গত মনে করেন যখন আইনপ্রণয়নী সংস্থা অথবা শাসক তার ওপর প্রদত্ত দায়িত্ব অগ্রাহ্য করে কাজ চালায় এবং জনগণের সম্পত্তি হরণ অথবা ধ্বংসের কিংবা তাদের স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতার দাসত্বে নিপতিত করার চেষ্টা করে। এতে ক'রে তারা নিজেদের স্থাপন করে জনগণের সঙ্গে যুদ্ধের পরিস্থিতিতে।'** অভ্যুত্থানের বৈধতা বিচার প্রসঙ্গে লক প্রশ্নটা রেখেছেন অনেক সাধারণ আকারে। 'ক্ষমতার সর্ববিধ বেআইনী আত্মপ্রকাশ প্রতিরোধের বৈধতা বিষয়ক মতবাদের'*** কথা বলছেন তিনি, যদিও এ মতবাদ রয়ে গেছে অসংরচিত।

লকের মতে, অভ্যুত্থান বা বিপ্লব সংখ্যাল্পের ক্রিয়া হওয়া উচিত নয়। এটা নাগরিক সমাজের আইন লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে গ্যারাণ্টির কাজ করবে, কেননা জনগণ সমগ্রভাবে বাজে ব্যাপার নিয়ে অস্ত্রধারণে উন্মত্ত নয়, এ ব্যবস্থার আশ্রয় তারা কেবল তখনই নেয়, যখন তারা নিজেদের মৌলিক অধিকারগুলিকে সত্যিই বিপন্ন হতে দেখে। এইভাবে লক মনে করেন না যে অভ্যুত্থানের অধিকার স্বীকৃতি অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলায় পৌঁছয়, কেননা তিনি সার্বভৌম জনগণের কাণ্ডজ্ঞানে বিশ্বাস করেন। যে দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল, সত্যিই ক্ষমতা তদনুসারে কাজ করছে কি না, এ প্রশ্নের বিচারক জনগণ বলে ঘোষণা করেছেন লক: 'সে ছাড়া আর কে হতে পারে, তার কাছ থেকে দায়িত্ব ও কর্তৃত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিটি সঠিকভাবে চলছে কি না, তার বিচারক ও নির্ধারক... সে ছাড়া কে যে সেই ব্যক্তিকে ক্ষমতা দিয়েছে

ও তাকে সে ক্ষমতা দিয়েছিল বলেই আস্থার যোগ্য হতে না পারলে তাকে প্রত্যাহার করার ক্ষমতা আগের মতো তার অধিকারে (থাকা উচিত)?'*

অভ্যুত্থানের অধিকারকে আজো পর্যন্ত সমালোচনা করে আসছেন বুর্জোয়া গবেষকরা, তাঁরা মনে করেন এ অধিকার লকের সমগ্র সাংবিধানিক কর্মসূচির বিরোধী। লকের এই থিসিসে কেন্ড্যাল দেখেছেন নৈরাজ্যবাদী প্রবণতা, যা নাকি তাঁর তত্ত্বের অন্যান্য দিকের সঙ্গে মেলানো যায় না। তিনি মনে করেন সংখ্যাল্পরা সংখ্যাধিকদের সঙ্গে একমত না হলে এতে করে সংখ্যাল্পদের তুচ্ছতাচ্ছিল্য করার অধিকার পাচ্ছে সংখ্যাবহুলেরা। এরূপ অবস্থা স্বাভাবিক স্বাধীনতার ধারণাবিরোধী বলে ধরে নিয়ে তিনি বলতে চান যে অধিকাংশের ক্ষমতা সম্পর্কে লকের তত্ত্বের যুক্তিযুক্ত অনুসিদ্ধান্ত হওয়া উচিত ছিল অভ্যুত্থানের অধিকার নয়, এমন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের কল্পনা যাতে জনগণ কিছুকাল পর পর ভোট মারফত ভবিষ্যৎ রাজনীতি ও সরকারের সংবিন্যাস সম্পর্কে নিজেদের পছন্দ-অপছন্দ জ্ঞাপন করতে পারে।** পশ্চিমী রাজনীতিবিদ দে বিয়ার লিখছেন যে অভ্যুত্থানের অধিকারকে 'এমন একটা প্রথা যা স্বাধীনতাকে সীমিত করে তাকে ব্যবহারযোগ্য ও বাঞ্ছনীয় করে তোলে তার ভিত্তিপ্রস্তর হিশেবে দেখার চেয়ে পরম স্বাধীনতার ন্যায্যতা প্রতিপাদন বলে দেখাই বরং সহজ'***।

লকের কাছে কিন্তু জনগণের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের সর্বোচ্চ ও সর্বশেষ গ্যারাণ্টি হিশেবে অভ্যুত্থানের অধিকার একটা ব্যতিক্রমী ব্যাপার। এটা হল জনগণের শেষ আশ্রয়, রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপের ওপর নিয়ন্ত্রণের স্বাভাবিক সাংবিধানিক রূপগুলিকে যা নাকচ করছে না। ক্ষমতা ও বৈধতার মধ্যে ভাগাভাগির নীতিকে লক সেইভাবেই অভিহিত করেছেন।

ক্ষমতার ভাগাভাগি লক সুপারিশ করেছেন কর্তৃত্বশীল লোকেদের পক্ষ থেকে সমস্ত ক্ষমতা স্বহস্তে কেন্দ্রীভূত করে, যেমন আইনপ্রণয়ন, তেমনি তার কার্যকরীকরণকে নিজেদের লাভার্থে চালিত করার প্রলোভন প্রতিহত করার জন্য। সেটা যাতে না ঘটে, তার জন্য লক আইনপ্রণয়নী ও কর্মনির্বাহী ক্ষমতাকে এক না করার প্রস্তাব দিয়েছেন, এবং আইনপ্রণেতাদের প্রদত্ত যে আইনকে কর্মনির্বাহী ক্ষমতা কার্যকরী করবে, তাতে আইনপ্রণেতাদের অধীনস্থ

করতে বলেছেন। লকের মতবাদে এটা একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ নীতি, পরবর্তী রাজনৈতিক চিন্তা ও ক্রিয়াকলাপকে তা খুবই প্রভাবিত করেছে, হয়ে দাঁড়িয়েছে বুর্জোয়া রাষ্ট্রপাটের একটা প্রধান নীতি।

রাষ্ট্রক্ষমতাকে লক তিনভাগে ভাগ করেছেন, আইনপ্রণয়নী ও কর্মনির্বাহী ছাড়াও প্রাকৃতিক, বা ফেডারেটিভ ক্ষমতা, যা রাষ্ট্রের বহির্দেশীয় ক্রিয়াকলাপ চালনা করে। কিন্তু ক্ষমতার বিভাজন তত্ত্বের সঙ্গে ফেডারেটিভ ক্ষমতার কোনো সরাসরি সম্পর্ক নেই, কেননা লক এই কথায় জোর দিয়েছেন যে কর্মনির্বাহী ও ফেডারেটিভ ক্ষমতা সাধারণত একই লোকেদের হাতে থাকে, এবং অন্যভাবে এ প্রশ্নের সমাধান করা অনুচিত, কেননা এই দুই ক্ষমতাই তাদের অস্তিত্বের জন্য সমাজের শক্তির নিকট দায়ী, যাকে খণ্ডিত করা অসমীচীন*। লকের মতে, এই দুই ধরনের ক্ষমতার বৈশিষ্ট্য নির্ধারিত হচ্ছে শুধু তাদের প্রয়োগক্ষেত্র (অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক) অনুসারেই নয়, এই প্রভেদপ্রসূত বিভিন্ন ধর্ম অনুসারেও। কর্মনির্বাহী ক্ষমতার চেয়ে ফেডারেটিভ ক্ষমতা পূর্বনির্ধারিত স্থায়ী আইনের দ্বারা পরিচালিত হতে পারে কম। সুতরাং যাদের হাতে তা ন্যস্ত, প্রয়োজন হলে তাদের বিচক্ষণতা ও প্রজ্ঞাকে হতে হবে সে ক্ষমতার অবলম্বন। প্রজাদের পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ক যে আইন দ্বারা তাদের কাজকর্ম চালিত, তা তো তাদের আগেই বিদ্যমান থাকতে পারে। কিন্তু বিদেশীদের ক্ষেত্রে যা করা দরকার তা বহুলাংশে নির্ভর করে তাদের আচরণ এবং বিভিন্ন অভিসন্ধি ও স্বার্থের ওপর, তাই সে ক্ষমতাটা যাদের হাতে ন্যস্ত, তা বহুপরিমাণে তাদের বিচক্ষণতার ওপর ছেড়ে দেয়া উচিত**। তাই প্রভেদটা দাঁড়াচ্ছে এই যে অভ্যন্তরীণ কর্মনির্বাহী ক্ষমতা সামাজিক চুক্তিবদ্ধ লোকেদের ওপর বিস্তৃত, যারা একটা সমগ্র, সুতরাং আইন দ্বারা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণীয়। ফেডারেটিভ ক্ষমতা, যাকে বৈদেশিক কর্মনির্বাহী ক্ষমতা বলাই বোধ হয় ঠিক হত, সেটা তাদের নিয়ে যারা রয়ে গেছে সমাজের গণ্ডির বাইরে। তাদের ক্ষেত্রে, ব্যক্তিবর্গ ও রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে, লকের মতে, সমাজ রয়ে গেছে স্বাভাবিক অবস্থায়***। এইভাবে কর্মনির্বাহী ও ফেডারেটিভ ক্ষমতার মধ্যে পার্থক্য

জড়িত অন্তঃরাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের প্রভেদের সঙ্গে, ক্ষমতা বিভাগের তত্ত্বের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই।

রাজনৈতিক ব্যবস্থা বিষয়ে লকের আলোচনায় অনেকটা জায়গা দেয়া হয়েছে বৈধতার প্রশ্নে। বৈধতার নীতিটা হল এই যে বিনা ব্যতিক্রমে রাজনৈতিক সমাজের সমস্ত সদস্যের ক্ষেত্রে আইন সমানভাবে বাধ্যতামূলক: 'নাগরিক সমাজের অন্তর্ভুক্ত মাত্র একজন ব্যক্তির ক্ষেত্রেও সে সমাজের আইন থেকে ব্যতিক্রম করা চলতে পারে না'*। এ দাবি বিশেষ করে উচ্চারিত হয়েছে ক্ষমতাধরদের উদ্দেশে। লোকে যখন দেখে যে কোনো এক ব্যক্তি নাগরিক সমাজের সীমানার বাইরে, তখন তারা ভাবতে শুরু করে যে তারা ঐ ব্যক্তির ক্ষেত্রে স্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে থাকছে, — আইনের ক্ষমতা থেকে কাউকে মুক্তিদানের এই সামাজিক পরিণামের কথা বলেছেন লক**। বিশেষ করে তিনি এই কথায় জোর দিয়েছেন যে আইনদাতারা যৌথভাবে আইনদাতা হওয়ায় যে আইন তাঁরা প্রণয়ন করেছেন, পৃথক পৃথক ব্যক্তির মতো তাঁরাও সে আইনের ক্রিয়াধীন***।

বৈধতার নীতিতে রাষ্ট্রীয় ক্রিয়াকলাপের সুনির্দিষ্ট আইনী নিয়ন্ত্রণ ঘোষিত হয়েছে। র. পলিন সাধারণ কল্যাণের জন্য রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপ সম্ভব করার উদ্দেশ্যে লক প্রস্তাবিত টেকনিকাল-ব্যবহারশাস্ত্রীয় উপায়াদিকে সূত্রবদ্ধ করেছেন এই কথায়: 'সমাজ গঠনকালে সরকারের ওপর জনগণের আস্থা অভিব্যক্ত হওয়া উচিত সংবিধান, মূল আইন রূপে, যা সামাজিক কল্যাণের মর্মার্থ এবং যে উপায়াদি দ্বারা তা সাধনীয় তা স্থির করে দেবে'****। লকের মতে, জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত ও নিযুক্ত আইনপ্রণয়নী সংস্থার মঞ্জরিপ্রাপ্ত বিধানই আইনের শক্তি ধরে; চালিত হওয়া উচিত জনগণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত আইনের মাধ্যমে, তাৎক্ষণিক কোনো একটা হুকুম দিয়ে নয়। সেইসঙ্গে লক কোথাও আনুষ্ঠানিক দিক দিয়ে বৈধতার ব্যাখ্যা করেন নি, যাতে শুধু সঠিক প্রণালী মতে গৃহীত আইনের পালন বোঝায়। যে বৈধতা বলবৎ আইনের ঊর্ধ্বে এবং নৈতিক বোধ থেকে সঞ্জাত তার নীতিতে তিনি

আইনদাতাদের হাত বেঁধে দিয়েছেন, যারা প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘন না করতে বাধ্য।

সর্বোচ্চ, অর্থাৎ আইনপ্রণয়ণী ক্ষমতা কাদের হাতে, সেই অনুসারে লক রাষ্ট্রের রূপ নির্দিষ্ট করেছেন*। রাষ্ট্ররূপের শ্রেণীভেদে তিনি মেনে নিয়েছেন আরিস্টটলের ত্রিধারা। রাষ্ট্রকে তিনি ভাগ করেছেন গণতন্ত্র, গোষ্ঠীতন্ত্র আর রাজতন্ত্রে (শেষেরটা হতে পারে নির্বাচনমূলক অথবা উত্তরাধিকারভিত্তিক) এবং স্বীকার করেছেন যে মাঝামাঝি রূপও সম্ভব।

লকের দৃষ্টিভঙ্গির বৈশিষ্ট্য হল, এই তিন ধরনের রাষ্ট্রকেই তিনি স্থাপন করেছেন 'সম্মতি', সামাজিক চুক্তির ভিত্তিতে এবং এই মত পোষণ করেছেন যে রাজনৈতিক ক্ষমতার উদ্ভব হয় সমাজের আস্থা থেকে যা নিজের সার্বভৌমত্ব বজায় রাখে। 'নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র, কেউ কেউ যাকে মনে করেন দুনিয়ায় শাসনের একমাত্র রূপ, তা আসলে নাগরিক সমাজের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়, সুতরাং কোনক্রমেই নাগরিক শাসনের রূপ তা হতে পারে না'**। সমাজের ইচ্ছাক্রমে শাসনের রূপ যে বদলাতে পারে তা স্বীকার করা হয়েছে। কোন রাষ্ট্ররূপটা শ্রেষ্ঠ বলে তিনি মনে করেন সে সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কিছু তিনি বলেন নি। তাঁর রচনার দ্বিতীয় খণ্ডে তিনি সুসম্পূর্ণ বলেছেন গণতন্ত্রকে***। তবে ক্ষমতা সীমাবদ্ধ ও স্বাভাবিক বিধির সঙ্গে তার সঙ্গতি থাকলে বংশগত রাজক্ষমতাতেও তাঁর আপত্তি নেই। কিন্তু একটা ব্যাপারে তিনি অটল। রাজা সম্পর্কে তিনি লিখেছেন: 'তাকে গণ্য করা উচিত তার আইনে ঘোষিত সামাজিক ইচ্ছায় চালিত রাষ্ট্রের রূপক, মায়ামূর্তি বা প্রতিনিধি বলে; সুতরাং আইনবলে যা প্রদত্ত তা ছাড়া তার কোনো মর্জি, কোনো ক্ষমতা নেই, কিন্তু যখন সে এই প্রতিনিধিত্ব, এই সামাজিক অভিপ্রায় হারায় এবং নিজের খুশিমতো কাজ করে, তখন সে নিজেকে অপদস্থ করে এবং তখন সে ক্ষমতাহীন, অভিপ্রায়হীন একজন ব্যক্তি মাত্র, যার নিকট সমাজসদস্যদের বাধ্যতার অধিকার সে আর রাখে না, সমাজসদস্যরা কেবল সমাজের অভিপ্রায় মানতে বাধ্য'****। ১৬৮৮ সালের

ওলটপালটে ইংলণ্ডে যে ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়, রাজক্ষমতার এই বর্ণনা তার অনুরূপ।

গবেষকরা লকের রচনার বেশির ভাগ নীতি মৌলিক নয়, সেগুলি তাঁর পূর্বসূরী ও সমকালীনদের কাছ থেকে ধার করা, এমন মন্তব্যে আশ্চর্য মতৈক্য প্রকাশ করলেও একথা সমান সর্বজনস্বীকৃত যে তাঁর পূর্বে কথিত মতামতকে লক যুক্তির দিক দিয়ে সুগঠিত একটা রাজনৈতিক তত্ত্বে সম্মিলিত করতে পেরেছিলেন যা সামাজিক চিন্তার ইতিহাসে প্রমুখ একটা ভূমিকা নিয়েছিল।

১৬৮৮ সালের 'গৌরবোজ্জ্বল বিপ্লবের' তাত্ত্বিক হলেন লক। সমাপ্তি পর্যায়ের সমস্ত আপোসপ্রবণতা সত্ত্বেও তিনি সামন্ততান্ত্রিক সমাজ থেকে বুর্জোয়া সমাজে উল্লম্ফনকে জ্বলজ্বলে ও সঙ্গতিশীল রূপে মূর্ত করে তুলেছেন। লক থেকেই শুরু হয়েছে কথাটার পূর্ণ অর্থেই আধুনিক বুর্জোয়া রাজনৈতিক চিন্তা। শতবর্ষব্যাপী ইংলণ্ডীয় রাজনৈতিক চিন্তা বিকাশের খতিয়ান টেনে লক যেসকল রাজনৈতিক নীতি ঘোষণা করেন তা হয়ে দাঁড়ায় শুধু ইংলণ্ডের নয়, গোটা পশ্চিমী বুর্জোয়া জগতের রাষ্ট্রপাটের ভিত্তি: ব্যক্তির অলঙ্ঘনীয় অধিকার, ব্যক্তিগত মালিকানার পবিত্রতা, বৈধতা, ক্ষমতার বিভাজন, সার্বভৌমত্ব, পার্লামেণ্টী শাসন। রাজনৈতিক তত্ত্বে লকের মৌলিক অবদান বলে ধরা হয় তাঁর 'সম্মতি' এবং অধিকাংশের কর্তৃত্ব বিষয়ক ধারণা। লকের ভাবাদর্শীয় প্রতিপক্ষদের, বিশেষ করে হবসের ক্ষেত্রে প্রধান ভাবনা ছিল রাষ্ট্রের সীমাহীন ক্ষমতা নিয়ে, লকের কাছে কিন্তু রাজনৈতিক তত্ত্বের ভারকেন্দ্র হয়ে দাঁড়াল রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপের পরিসীমা, তাকে সুনির্দিষ্ট কাঠামোর মধ্যে ধরে রাখা, তার ওপর নিয়ন্ত্রণ, অভ্যুত্থানের অধিকার সংক্রান্ত প্রশ্ন। লককে ধরা যেতে পারে উদারনৈতিকতার গোত্রপিতা, যা প্রায় দুই শতক ধরে ছিল বুর্জোয়াদের প্রধান রাজনৈতিক মতবাদ। তাঁর সাধারণ কল্যাণের নীতিতে উপযোগিতাবাদের ভ্রূণও লক্ষণীয়।

আঠারো শতকে লকের বিপুল প্রভাব ছিল শুধু স্বদেশেই নয়, ফ্রান্স, হল্যান্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও। আমেরিকান বিপ্লবের ভাবধারা লকের তত্ত্বের এত কাছাকাছি যে অনেক গবেষকের মনে হয়েছে, শিক্ষিত আমেরিকানদের অধিকাংশ তাঁদের রাজনৈতিক ধারণা পেয়েছেন সরাসরি রাষ্ট্র শাসন বিষয়ে লকের ভাষ্য থেকে। এরূপ মূল্যায়নের অতিরঞ্জন স্বতঃস্পষ্ট। একালের আমেরিকান গবেষক জন ডান ভুলতে মানা করেছেন যে মার্কিন

সংবিধানের স্রষ্টাদের দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠেছিল সর্বাগ্রে স্বাধীনতা সংগ্রামের পরিস্থিতিতে, কিন্তু তিনি স্বীকার করেন যে জেফারসন, মেডিসন, ফ্র্যাংকলিন, অ্যাডামস প্রভৃতিরা সবাই তাঁদের স্বাধীনভাবে গড়ে ওঠা প্রত্যয়ের সিদ্ধি ও সমর্থনের জন্য লকের দ্বারস্থ হয়েছেন, ইংরেজ মনীষীর সযত্নে রচিত ব্যবস্থা থেকে তাঁরা অনেককিছু পেয়ে থাকতে পারেন*। তবে এটা তো সত্য ঘটনাই যে আমেরিকান সংবিধানের একগুচ্ছ নীতি, ক্ষমতার বিভাগ এবং অভ্যুত্থানের অধিকার তার অন্তর্গত, প্রথম বিস্তারিত তাত্ত্বিক প্রতিপাদন লাভ করেছিল লকের রচনায়।

প্রাগ্‌বিপ্লব ফ্রান্সের রাজনৈতিক চিন্তার মহৎ প্রতিনিধি মঁতেস্ক্য ও রুসোর ওপর লকের প্রভাব বিপুল। সবারই এটা জানা যে মঁতেস্ক্যর 'আইনের মর্মার্থ' গ্রন্থের সদর্থক দিকটা মুখ্যত লেখা হয়েছিল ব্রিটিশ রাজনৈতিক ব্যবস্থা নিয়ে চিন্তাভাবনায় আর ক্ষমতার বিভাগ নিয়ে তাঁর যে প্রখ্যাত তত্ত্ব বিশ্ব বুর্জোয়া রাষ্ট্রবিদ্যায় স্থান পেয়েছে, তা লকের ধারণারই গভীরতাবর্ধন।

লক থেকে অনেককিছু নিয়েছেন বৈপ্লবিক র‍্যাডিকেলপন্থার ভাবাদর্শী রুসো। জনগণের সার্বভৌমত্বের মতবাদকে তিনি একটা সসম্পূর্ণ রূপ দেন, আর লক যা করেন নি, এ সার্বভৌমত্বকে তিনি ঘোষণা করেছেন একেবারে অসীম। অতি বলিষ্ঠতায় তিনি স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে জনগণের প্রতিরোধের অলঙ্ঘনীয় অধিকারে জোর দিয়েছেন। রুসোর মতবাদে আপোস আর অর্ধগামিতার চিহ্ন মাত্র নেই যা লকের (এবং মঁতেস্ক্যর) বৈশিষ্ট্য। তা সত্ত্বেও তত্ত্বের অনেক প্রশ্নে তিনি মেনে নিয়েছেন লকের অগ্রাধিকার।

১৬৮৮-র পর তিন-চতুর্থাংশ শতক ধরে লক ছিলেন ব্রিটিশ শাসক মহলের স্বীকৃত ভাবগুরু। ডান লিখেছেন, তাঁর তত্ত্ব ছিল 'এতটাই রক্ষণশীল যে ইংরেজ অভিজাত ও বুদ্ধিজীবীদের অধিকাংশই নিশ্চিন্ত ঔদাস্যে তাকে আঠারো শতকের ইংলন্ডের আত্মবদ্ধ গোষ্ঠীবিভক্ত সমাজের পক্ষে সন্তোষজনক ভাবাদর্শ বলে গ্রহণ করে'**। যেমন, 'গৌরবোজ্জ্বল বিপ্লবের' পরেকার স্থিতিশীলতার পরিস্থিতিতে অভ্যুত্থানের অধিকারকে মনে করা হত নেহাৎ একটা নিরীহ স্মৃতি মাত্র। ধরা হত ওটা পুরোপুরি অতীতের জন্য। কিন্তু স্বাধীনতার জন্য উত্তর

আমেরিকার সংগ্রাম, ফ্রান্সে ঘনায়মান বিপ্লব, লকের দৃষ্টিভঙ্গিকে এমনকি শ্রমিক আন্দোলনের স্বার্থে ব্যবহার করার প্রয়াসে রক্ষণশীলদের চোখে লক পরিণত হয় এক র‍্যাডিকেলে। বৈপ্লবিক উদ্দেশ্যে লকের ভাবধারার শরণাপন্ন হবার দৃষ্টান্ত আছে আঠারো শতকের ইংলণ্ড ও আয়র্ল্যাণ্ডে, তবে তাঁর উত্তরাধিকারের এমন ব্যাখ্যার জন্য লক দায়ী নন। তাঁর ধ্যানধারণা ছিল নরমপন্থী, আপোসপ্রবণ, শোষিতদের রাজনৈতিক চেতনা যে সামাজিক ভাঙচুরের উদ্ভব ঘটাতে পারত তা থেকে বহুদূরে। বুর্জোয়া রাজনৈতিক নীতিজ্ঞানের একটা ক্ল্যাসিক ধারণার গোড়াপত্তন করে যান লক — স্বাধীনতা, সমতা, মানুষের স্বাভাবিক অধিকার, গণতন্ত্রের আনুষ্ঠানিক বোধ, সামাজিক অর্থ থেকে রাজনৈতিক প্রথা-প্রতিষ্ঠানের বিমূর্তায়ন। ক্ল্যাসিকাল বুর্জোয়া ধ্যানধারণার রক্ষকেরা আজো পর্যন্ত এরূপ মতামত পোষণ করে আসছেন, যদিও বুর্জোয়া রাজনৈতিক ব্যবস্থার সংকট, বিশ্ব সমাজতন্ত্র ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের সাফল্যে তা প্রচণ্ড ঘা খেয়েছে। অর্থনৈতিক ও সামাজিক সারার্থ যোগ করে রাজনৈতিক ধারণাকে (বিশেষ করে গণতন্ত্রের ধারণাকে) 'কুয়াশাচ্ছন্ন' করার অভিযোগ তুলেছেন লকের গবেষক কেণ্ড্যাল। এরূপ 'কুয়াশাচ্ছন্নতা' থেকে লক সত্যি করেই একেবারে মুক্ত। তাঁর স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, আইন ইত্যাদির বিশুদ্ধ আনুষ্ঠানিক-ব্যবহারশাস্ত্রীয় ভাষ্যের ক্ষেত্রে, যেমন তাঁর রাজনৈতিক চিন্তার অনেক দিকেই, সম্পত্তি বিষয়ে লকের দৃষ্টিভঙ্গির যে মূল্যায়ন করেছিলেন মার্কস, তা প্রযোজ্য: 'বুর্জোয়া সমাজের আইনী ধারণার ক্ল্যাসিকাল অভিব্যক্তা তিনি'*।

লকের ভাবনার ঐতিহাসিক তাৎপর্য বোঝার পক্ষে মূলকথাটা নিহিত আছে এই চরিত্রায়ণে। বুর্জোয়া শ্রেণীর রূপলাভের পর্বে তার অন্তর্বিরোধের ভাগীদার লক: যেমন তার ঐতিহাসিক প্রগতিশীলতা, তেমনি তার অনিবার্য সীমাবদ্ধতার। লক হলেন অবাধ প্রতিযোগিতা যুগের বড়ো দরের এক বুর্জোয়া রাজনৈতিক মনীষী। পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদের পর্যায়ে পেঁছিলে নতুন পরিস্থিতির পক্ষে লকের কতকগুলি অপ্রতুলতা স্বতঃই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপ সীমিত রাখার যে তত্ত্ব লক দিয়েছিলেন, সাম্রাজ্যবাদের যুগে রাষ্ট্রের প্রসারিত কাজের সঙ্গে তা খাপ খায় নি। তত্ত্বের দিক থেকে এই পরিবর্তনটা রূপ নিয়েছে নাগরিকদের চেয়ে রাষ্ট্রের স্বাধীনতার,

উচ্চতম রাষ্ট্রীয় স্বার্থের অস্তিত্বের বর্ধমান স্বীকৃতিতে এবং এই থেকে এসেছে আগে যেগুলিকে মনে করা হত ব্যক্তিগত স্বার্থের রাজ্য, সেখানে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা অনুমোদন।

জ্ঞানতত্ত্বের দিক থেকেও লক ঐতিহাসিক সীমাবদ্ধতায় সমানভাবে চিহ্নিত। ক্ষমতার প্রশ্নে বহু মধ্যযুগীয় কুসংস্কার তিনি ঝেঁটিয়ে সাফ করতে পেরেছিলেন, এটা তাঁর কীর্তি। কিন্তু আলোকপ্রাপ্তির যে যুগের তিনি ছিলেন অব্যবহিত উৎসস্থল, তার অন্তর্নিহিত অনেক দুর্বলতাও তিনি প্রকাশ করেছেন অসাধারণ সঙ্গতিশীলতায়। রাষ্ট্রের বিচারে লক দাঁড়িয়েছিলেন পুরোপুরি যুক্তিভিত্তিক বিমূর্তায়নের ওপর, ঐতিহাসিক, সমাজতাত্ত্বিক, মনস্তাত্ত্বিক, শ্রেণীগত দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর কাছে ছিল একেবারে বিজাতীয়। এই শেষোক্ত প্রণালীগুলির বিকাশে রাষ্ট্রের উদ্ভব বিষয়ে লকের মত একেবারে খণ্ডিত হয়ে যায়, এবং তা যেহেতু ছিল তাঁর তত্ত্বের বনিয়াদ, তাই লকের রাজনৈতিক ব্যবস্থার নীতিগুলির সিদ্ধতাও টলে ওঠে। কিন্তু লকের যুক্তিবাদী ছক যে উদ্দেশ্যে রচিত হয়েছিল, তা ইতিহাসের দিক দিয়ে সঠিকভাবে অনুমিত হয়েছিল বলেই, তার ন্যায্যতা প্রতিপাদনের জন্য লক যেসব সিদ্ধান্ত প্রস্তাব করেছিলেন, তাদের তাত্ত্বিক বনিয়াদ চুরমার হয়ে যাবার বহু পরেও তাদের প্রভাব বলবৎ ছিল। ক্ষমতার অবৈধ প্রকাশ প্রতিরোধের যে মতবাদ লক প্রচার করেছিলেন, অভ্যুত্থানের অধিকারের পক্ষে তাঁর অদ্ব্যর্থক ঘোষণা তাঁর উত্তরাধিকারকে প্রগতিশীল, বৈপ্লবিক উদ্দেশ্যে ব্যবহারের পথ খুলে দিয়েছিল, যা লকের মূর্ত-নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক তাগিদ থেকে বহু দূর।

রাষ্ট্র ও আইন সম্পর্কে লকের বাহ্যিক-ব্যবহারশাস্ত্রীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ছেঁকে নিলে, সমাজজীবনের বাস্তবতা ও অন্তর্বিরোধের যে বিমূর্তায়ন তিনি করেছেন তা বাদ দিলে জনগণের সার্বভৌমত্ব, 'সম্মতি', ব্যক্তির অলঙ্ঘনীয় অধিকার ইত্যাদি বিষয়ে লকের ধারণার প্রগতিশীল উপযোগ আজো সম্ভবপর। তাতে করে লকের নজির কেউ আজ বড়ো একটা দিতে যাবে না: তাঁর কাল থেকে জল অনেক গড়িয়ে গেছে, রাজনৈতিক চিন্তা অনেক সমৃদ্ধ ও প্রসারিত করেছে এইসব ধারণাকে। কিন্তু ইতিহাসের দিক থেকে লকের বৃহৎ অবদান কেবল বুর্জোয়ার রাজনৈতিক চেতনা গঠনেই সীমিত নয়, এমন কতকগুলি বর্গ ও নীতিরও তিনি সংরচক যা বুর্জোয়ার শ্রেণীগত উপযোগিতার সীমানা ছাড়িয়ে গেছে।



§ ৮। শার্ল লুই মঁতেস্ক্য

ভলটেয়ারের সঙ্গে ফ্রান্সের জ্ঞানালোক যুগের সূচনা করেন শার্ল লুই মঁতেস্ক্য (১৬৮৯-১৭৭৫)।

বুর্জোয়া রাজনৈতিক ও দার্শনিক সাহিত্যে 'জ্ঞানালোক' কথাটাকে বোঝা হয় খুবই ঢালাও ভাবে। যেমন, কাণ্টের মতে, 'কুসংস্কার থেকে মুক্তিকে বলা হয় জ্ঞানালোক'*। কোনো একটা ঐতিহাসিক যুগের সঙ্গে জ্ঞানালোককে কাণ্ট মোটেই সংশ্লিষ্ট করেন না। একই চিন্তা আরো স্পষ্ট করে প্রকাশ করেছেন রুশ অতীন্দ্রিয়বাদী দার্শনিক ন. আ. বের্দিয়ায়েভ। তিনি লিখেছেন: 'আমরা যখন 'জ্ঞানালোক' যুগের কথা বলি, তখন

কথাটা কেবল আঠারো শতকের জ্ঞানালোক, আধুনিক ইতিহাসের ক্ল্যাসিকাল 'জ্ঞানালোক' পর্ব নিয়ে নয়। আমি মনে করি, 'জ্ঞানালোক' পর্ব দিয়ে যাচ্ছে সমস্ত কাল ও জাতির সংস্কৃতি'*। জ্ঞানালোকের কঠোর নেতিবাচক মূল্যায়ন করে তিনি লিখেছেন: ''জ্ঞানালোকের' যুগ হল প্রতি জাতির জীবনে এমন যুগ, যখন সীমাবদ্ধ স্বয়ম্ভর মানবিক বিচারবুদ্ধি নিজেকে স্থাপন করে সত্তার রহস্য, জীবনের রহস্য, জীবনের সেই সমস্ত ঐশ্বরিক রহস্যের ওপরে, যা থেকে নিজে উৎসমূল হিশেবে উৎসারিত সমগ্র মানবিক সংস্কৃতি, পৃথিবীর সমস্ত জাতির জীবন। 'জ্ঞানালোকের' যুগে শুরু হয় জীবনের এই সমস্ত অব্যবহিত রহস্যের বাইরে এবং তার ওপরে মানবিক বিচারবুদ্ধির স্থাপনা। এ যুগের বৈশিষ্ট্য হল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের রহস্য, মানবিক ইতিহাসের রহস্যের ওপর ক্ষুদ্র মানবিক বিচারবুদ্ধিকে বিচারক করার প্রয়াস।'**

নীতিগতভাবে জ্ঞানালোকের একেবারেই ভিন্ন একটা বোধ আছে মার্কসবাদে। মার্কসবাদী পণ্ডিতদের কাছে জ্ঞানালোক হল সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার সংকট ও বুর্জোয়া সম্পর্ক দানা বাঁধার যুগের সামন্ততন্ত্রবিরোধী প্রগতিশীল ভাবাদর্শ। আঠারো শতকের ফরাসি জ্ঞানপ্রচারকদের সম্পর্কে এঙ্গেলস লিখেছেন যে তাঁরা 'সন্নিকট বিপ্লবের জন্য মস্তিষ্ক আলোকিত করেন'***।

ফরাসি জ্ঞানালোক আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ মঁতেস্ক্য সর্বদা পুরোপুরি ও সঙ্গতিশীলতার সঙ্গে পরিণত জ্ঞানালোক কর্মসূচি সমর্থন করেন নি, যা সুসম্পূর্ণ রূপ নিয়েছে দিদেরো, হলবাক ও হেলভেশিয়াসের রচনায়। তাঁর রচনা স্ববিরোধে পূর্ণ, আপোসের ছাপ মারা। তাহলেও মঁতেস্ক্য তীব্র সমালোচনা করেছেন সামন্ততান্ত্রিক সামাজিক সম্পর্কের, গির্জার জবরদস্তির বিরোধিতা করেছেন, ধ্বনি তুলেছেন রাজনৈতিক স্বাধীনতার। তাঁর লেখায় প্রতিফলিত হয়েছে উদীয়মান ফরাসি বুর্জোয়ার দাবি, যারা তখনো নিরংকুশ ক্ষমতা দখলের স্পর্ধা করছে না, কিন্তু সামাজিক সংস্কার ও স্বৈরাধিপত্য সংকোচনের জন্য প্রাণপণে চেষ্টিত। বহু দিক থেকে মঁতেস্ক্য বুর্জোয়ার রাজনৈতিক আদর্শ প্রণয়নে সহায়তা করেছেন, তাঁর

* বের্দিয়ায়েভ ন.। ইতিহাসের অর্থ। মানবিক ভাগ্য দর্শনের অভিজ্ঞতা। ২য় সংস্করণ।

কালে যেটা ফ্রান্সে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় পর্যবসিত।

মঁতেস্ক্যুর রাজনৈতিক মতামত এসেছে তাঁর সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। তাঁর 'রোমের মহিমা ও পতনের কারণ বিষয়ে ভাবনা' এবং বিশেষ করে তাঁর প্রধান গ্রন্থ 'আইনের মর্মার্থ'তে তিনি সামাজিক ঘটনাবলির অবজেকটিভ নিয়মবদ্ধতার ধারণা প্রতিষ্ঠিত করেছেন: 'আমি লোকেদের অনুধাবন করতে শুরু করি এবং দেখলাম যে তাদের আইন ও রীতিনীতির অশেষ বৈচিত্র্য একমাত্র তাদের কল্পনার ফলপ্রসূত নয়। সাধারণ নীতি স্থির করে আমি দেখলাম যে পৃথক ঘটনাগুলি আপনা থেকেই যেন তাদের অধীনস্থ হচ্ছে, প্রতিটি জনগোষ্ঠীর ইতিহাস তাদের মধ্য থেকে নির্গত হয় একটা পরিণাম হিশেবে, এবং প্রতিটি খণ্ডাকার নিয়ম অন্যান্য নিয়মাদির সঙ্গে জড়িত অথবা অনেক সাধারণ একটা নিয়মের অধীন।... আমার নীতি আমি নির্ধারণ করেছি নিজের কুসংস্কার থেকে নয়, ব্যাপারাদির প্রকৃতি থেকেই।'*

সেই সঙ্গে মনে রাখা উচিত যে মঁতেস্ক্যুর রচনায় সমাজতাত্ত্বিক ও ব্যবহারশাস্ত্রীয় নিয়মের মধ্যে কোনো সুস্পষ্ট সীমারেখা নেই। 'নিয়মকে কথাটার ব্যাপকতম অর্থে', 'ব্যাপারাদির প্রকৃতি থেকে উদ্‌গত আবশ্যিক সম্পর্ক'** বলে ধরে নিয়ে তিনি বুঝিয়েছেন যেমন প্রকৃতি ও সমাজের ক্ষেত্রে অবজেকটিভভাবে বিদ্যমান নিয়মকে, তেমনি মনুষ্য রচিত আইনকেও। অবশ্য লোকেদের রচিত সমস্ত আচরণবিধিকে তিনি আইন বলে মোটেই মনে করেন না, শুধু সেইগুলি তাঁর কাছে আইন যার ভিত্তি বিচারবুদ্ধি ও ন্যায়***। তবে ব্যবহারশাস্ত্রীয় আইনের বিচারবুদ্ধি ও ন্যায় বলতে তিনি আগে থেকে মেনে নেওয়া কোনো মানদণ্ড বোঝেন না। জ্ঞানপ্রচারক এই কথায় জোর দিয়েছেন যে 'এক জনগোষ্ঠীব আইন অন্য জনগোষ্ঠীর উপযোগী হতে পারে কেবল অসাধারণ বিরল ক্ষেত্রেই'****।

কোন কোন ক্ষেত্রে বিচারবুদ্ধি ও ন্যায়সম্মত আইন প্রযোজ্য তার একটা বিশদ তালিকা দিয়েছেন তিনি। 'সেগুলির হওয়া উচিত দেশের দৈহিক অবস্থা, তার জলবায়ু — শীতপ্রধান, গ্রীষ্মপ্রধান অথবা নাতিশীতোষ্ণ, —

মৃত্তিকার গুণ, তার অবস্থান, আয়তন, তার জনগণের জীবনযাত্রা — কৃষিজীবী, শিকারী, পশুপালক, — রাষ্ট্রব্যবস্থায় অনুমোদিত স্বাধীনতার মান, অধিবাসীদের ধর্ম, তাদের প্রবণতা, ধনসম্পদ, জনসংখ্যা, বাণিজ্য, রীতিনীতি অনুযায়ী; শেষত, তারা পরস্পর সংশ্লিষ্ট এবং নিজের উদ্ভবের পরিস্থিতি, আইনদাতাদের লক্ষ্য এবং যে ব্যাপারাদির ওপর তা প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, তার ধরন-ধারন দ্বারা নির্ধারিত।'* আইনের বিকাশ যে বহুসংখ্যক ঘটনার দ্বারা নির্ণীত, এখানে এই তত্ত্ব সূত্রবদ্ধ করেছেন মঁতেস্ক্য। প্রধান স্থান তিনি দিয়েছেন ভৌগোলিক ব্যাপারকে। এক্ষেত্রে তিনি প্রাচীন ঐতিহ্যই অনুসরণ করেছেন, যা পৌরাণিক যুগ থেকে চলে এসেছে। ভৌগোলিক করণিকার উল্লেখ করেছেন হেরোডোটাস; আরিস্টটল তাঁর 'রাজনীতি' গ্রন্থে জলবায়ু ও রাজনৈতিক স্বাধীনতার মধ্যে সম্পর্কের প্রতিপাদ্য উপস্থিত করেছেন; এই প্রসঙ্গে ফরাসি লেখকদের মধ্যে জাঁ বদেনের নামও উল্লেখযোগ্য।

ভৌগোলিক ব্যাপারেই সীমিত না থেকে মঁতেস্ক্য জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার ধরনের দিকেও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। অধিবাসীদের মূল জীবিকা — কৃষি, শিকার, পশুপালন (চারণ) অনুসারে তিনি আইনপ্রণয়নের বৈশিষ্ট্য খোঁজার চেষ্টা করেছেন। এক্ষেত্রেও ফরাসি জ্ঞানপ্রচারকের পূর্বসূরীরা লক্ষণীয়। যেমন, আরিস্টটল কয়েক ধরনের জীবনযাত্রাকে (যাযাবর জীবন, কৃষিনির্ভর জীবন, সামুদ্রিক লুণ্ঠন, মৎস্যজীবিতা, মৃগয়া) ভাগ করেছিলেন, যার প্রত্যেকটি থেকে দেখা দিয়েছে রাজনৈতিক জীবনের এক-একটা বৈশিষ্ট্য**। বিধানপ্রণয়নের ওপর জীবনযাত্রার প্রভাব সম্পর্কে লিখেছেন রোমক গ্রন্থকারেরাও — সিসেরো, সালির্উস্টিয়াস, লুক্রেটিয়াস।

মঁতেস্ক্যর 'জনগণের জীবনযাত্রার ধরনের' সঙ্গে সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মার্কসীয় মতবাদের কোনো সম্পর্ক নেই। উৎপাদন প্রক্রিয়া থেকে উদ্ভূত সামাজিক সম্পর্ক তিনি অনুধাবন করেন নি, তাঁর আগ্রহ ছিল উৎপাদনের ফলাফলে। যেমন, কোনো একটা জনগোষ্ঠী পশুপালক বলে অভিহিত হবে কিনা, মঁতেস্ক্যর কাছে তার প্রধান নিরিখ ছিল সে জনগোষ্ঠীর মোট উৎপাদনে পশুপালনঘটিত দ্রব্যের প্রাধান্য। এই নিরিখ সমান প্রযোজ্য হয় যেমন আদিম সমাজব্যবস্থাভুক্ত যাযাবর জনগণের ক্ষেত্রে,

তেমনি যাদের মধ্যে সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, তাদের ক্ষেত্রেও।

তাহলেও সামাজিক বিকাশের বহুবিধ করণিকার যে তত্ত্ব মঁতেস্ক্য দিয়েছিলেন, আজো পর্যন্ত বুর্জোয়া সমাজবিদ্যায় যার প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ, আত্মমুখী সমাজবিদ্যার বিরুদ্ধে চালিত হওয়ায় আঠারো শতকে তার একটা সদর্থক তাৎপর্য ছিল। কিন্তু মার্কসবাদ যখন বৈষয়িক সম্পর্কের নির্ধারক ভূমিকা তুলে ধরল, তখন থেকে তার তাৎপর্য হয়ে দাঁড়াল অন্যবিধ। করণিকা তত্ত্বের আশ্রয়ে বুর্জোয়া তত্ত্বকাররা উল্লিখিত সম্পর্কগুলির বাস্তব ভূমিকাকে ধামাচাপা দেবার চেষ্টা করেন, সংগ্রাম চালান মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বিরুদ্ধে। রুশ তাত্ত্বিক ও মার্কসবাদের প্রচারক গ. ভ. প্লেখানভ লিখেছেন: 'করণিকা তত্ত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে মানবসমাজ হয়ে দাঁড়ায় একটা বিষম বোঝা, যাকে বিভিন্ন 'শক্তি' — নৈতিকতা, আইন, অর্থনীতি, ইত্যাদি ইত্যাদি ঐতিহাসিক পথে নিজের নিজের দিকে টানছে। ইতিহাসের বস্তুবাদী বোধের আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ব্যাপারটা একেবারেই ভিন্ন। ঐতিহাসিক করণিকাগুলি হয়ে দাঁড়ায় নিতান্ত বিমূর্তায়ন, তাদের কুয়াশা অদৃশ্য হলে পরিষ্কার হয়ে ওঠে যে লোকে মোটেই পরস্পর থেকে পৃথক কয়েকটা ইতিহাস — আইন, নৈতিকতা, দর্শন, ইত্যাদির ইতিহাস গড়ে না, গড়ে কেবল নিজেদের সামাজিক সম্পর্কের একটাই ইতিহাস, যা প্রতিটি কালের উৎপাদনী শক্তির অবস্থা দ্বারা নির্ধারিত*।

আইনের সারার্থ রাষ্ট্ররূপ দ্বারা নির্ধারিত, এইটে দেখাবার চেষ্টা করেছেন মঁতেস্ক্য। এই প্রসঙ্গে তিনি রাষ্ট্ররূপগুলির নিজস্ব বিশেষ ভাগবিভাগ করেছেন। তিনি বলেছেন, এক-একটা সমাজের অস্তিত্ব দাবি করে রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা, যা এক সাধারণ শক্তিতে বিভিন্ন শক্তির মিলনে নির্ধারিত। এই সাধারণ শক্তি থাকতে পারে এক বা বহু ব্যক্তির হাতে।

এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে জ্ঞানপ্রচারক তিন ধরনের শাসনব্যবস্থার উল্লেখ করেছেন: প্রজাতান্ত্রিক, রাজতান্ত্রিক ও স্বৈরাচারী। তিনি লিখেছেন: 'আমি তিনটি সংজ্ঞা, কিংবা বলা ভালো তিনটি ঘটনার উল্লেখ করছি: প্রজাতান্ত্রিক শাসন, যাতে সর্বোচ্চ ক্ষমতা থাকে সমগ্র জনগণ কিংবা তার অংশের হাতে; রাজতান্ত্রিক শাসন, যাতে শাসন করে একজন লোক, কিন্তু প্রতিষ্ঠিত

অপরিবর্তনীয় আইনের মাধ্যমে; স্বৈরাচারী শাসনে সবকিছু চলে আইন ও নিয়মের বাইরে, একজন ব্যক্তির মর্জি ও স্বেচ্ছাচার অনুসারে।'*

এই বিভাগে না থেমে তিনি তাকে আরো বিকশিত করেছেন। 'প্রজাতন্ত্রে সর্বোচ্চ ক্ষমতা যদি থাকে সমগ্র জনগণের অধিকারে, তাহলে এটা হল গণতন্ত্র। যদি তা থাকে জনগণের একাংশের হাতে, তাহলে এরূপ শাসনব্যবস্থাকে বলা হয় অভিজাততন্ত্র।'**

মঁতেস্ক্যর মতে, সমস্ত শাসনব্যবস্থার পার্থক্য তাদের প্রকৃতি অনুসারে, তবে শাসনব্যবস্থার প্রকৃতির কোনো স্পষ্ট সংজ্ঞা তিনি দেন নি। শুধু তিনটি শাসনব্যবস্থার সঙ্গে এই কথাটার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের উল্লেখ করেছেন তিনি। যা দেখা যাচ্ছে, এরূপ সংজ্ঞাদানে মঁতেস্ক্যর অনিচ্ছা নেহাৎ দৈবাৎ নয়। শাসনব্যবস্থার ভাগ-বিভাগটাই যুক্তির দিক থেকে বিরোধাকীর্ণ, স্পষ্ট বিভাগের ভিত্তি তাতে অনুপস্থিত। রাজতন্ত্র, স্বৈরতন্ত্র এবং অত্যাচারতন্ত্রের মধ্যে প্রভেদ টানার যে চেষ্টা মঁতেস্ক্য করেছিলেন, তার অসিদ্ধতার উল্লেখ করেছেন মার্কস: '...এ সবই একটা অর্থেরই সূচক, সর্বোত্তম ক্ষেত্রে তাতে একই নীতির মধ্যে রীতিনীতির হেরফেরের উল্লেখ করা হয়ে থাকে।'***

মঁতেস্ক্য মনে করেন, শাসনব্যবস্থার প্রকৃতি থেকে আসে আইনপ্রণয়নের একসারি বৈশিষ্ট্য। তাঁর মতে, গণতন্ত্রে জনগণের খানিকটা নিজেদেরই এবং খানিকটা তাদের ক্ষমতাপ্রাপ্ত অছি, অর্থাৎ রাষ্ট্রের পদাধিকারীদের মারফত শাসন চালানো উচিত। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনগণের প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ নির্বাচনে গঠিত সিনেট থাকাও আবশ্যক। পরিশেষে, মঁতেস্ক্যর মতে, গণতন্ত্রে জনগণের বিভক্ত হওয়া উচিত শ্রেণীতে। এই দিয়েই নির্দিষ্ট হচ্ছে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতে আইনপ্রণয়নের বৈশিষ্ট্য: 'ভোটাধিকারী জনগণকে শ্রেণীবিভক্ত করাই হল প্রজাতন্ত্রের বনিয়াদী আইন। তার আরেকটা বনিয়াদী আইন হল ভোটদানের পদ্ধতি। লটারি মারফত নিয়োগ গণতন্ত্রের প্রকৃতিগত; নির্বাচন মারফত নিয়োগ — অভিজাততন্ত্রের।... ভোট দানের রূপ নির্ণয়ের আইনও গণতন্ত্রের বনিয়াদী আইনের অন্তর্ভুক্ত। এক্ষেত্রে ভোটদান হবে প্রকাশ্য নাকি গোপন, এ প্রশ্ন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ... যখন ভোট দেয় জনগণ, তখন নিঃসন্দেহেই তা হওয়া উচিত প্রকাশ্য, গণতন্ত্রের

একটা মৌল আইন বলে এটাকে দেখা উচিত। দরকার নেতারা যেন সাধারণ জনগণের চৈতন্যোদয় করেন এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিরা যেন নিজেদের মর্জাদা বলে তাদের আয়ত্তে রাখেন... গণতন্ত্রের বনিয়াদী আইনের মধ্যে এটাও থাকবে যার বলে আইনপ্রণয়নের ক্ষমতা থাকবে কেবল জনগণের।'*

গণতন্ত্রের বিরুদ্ধবাদীদের দ্বিধাহীন বিপক্ষতা করেছেন জ্ঞানপ্রচারক: 'নির্বাচনীয় ব্যক্তির যোগ্যতা বিচারে জনগণের স্বাভাবিক সামর্থ্যে কারো যদি সন্দেহ থাকে, তবে তিনি দৃষ্টিপাত করুন এথেন্সবাসী ও রোমকদের একসারি অবিচ্ছিন্ন আশ্চর্য সার্থক নির্বাচনে, যা অবশ্যই আপতিকতার দোহাই দিয়ে উড়িয়ে দেয়া যায় না।'**

অভিজাততন্ত্রের প্রকৃতি সংক্রান্ত আইনের প্রশ্ন মঁতেস্ক্য আলোচনা করেছেন কম বিশদে। তিনি মনে করেন যে অভিজাতবংশীয়দের হতে হবে, যতটা সম্ভব, জনগণের কাছাকাছি: 'অভিজাততন্ত্র যত গণতন্ত্রের কাছাকাছি যাবে তত তা ভালো হবে এবং যত রাজতন্ত্রের দিকে যাবে, তত তা খারাপ হবে। নিকৃষ্ট অভিজাততন্ত্র হল সেইটে, যেখানে জনগণের যে অংশটা আজ্ঞা মানে তারা থাকে আজ্ঞাদাতাদের নাগরিক দাসত্বে, যেমন, পোল্যাণ্ডের অভিজাততন্ত্র, সেখানে কৃষকেরা অভিজাতদের গোলাম।'***

রাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার প্রকৃতি থেকে যেসব আইন আসে, তা নিয়ে মঁতেস্ক্যর আলোচনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। খানিকটা আড়ালে থেকে জ্ঞানপ্রচারক ফরাসি একচ্ছত্র ক্ষমতাকে সমালোচনা করেছেন, আদর্শায়িত করেছেন সম্প্রদায়ভেদী-প্রতিনিধিত্বমূলক রাজতন্ত্রের যুগকে। তাঁর মতে, রাজতান্ত্রিক শাসনে বোঝায় মৌল আইনের মাধ্যমে শাসন। আবার মৌল আইন বলতে 'বোঝানো হয় আবশ্যক মধ্যবর্তী প্রণালীর অস্তিত্ব, যা বেয়ে ক্ষমতা অগ্রসর হবে, কেননা রাষ্ট্রে যদি একজনের পরিবর্তনশীল, খামখেয়ালী ইচ্ছা ছাড়া আর কিছু না থাকে, তাহলে তাতে পাকাপোক্ত কিছু থাকতে পারে না, সুতরাং কোনো মৌল আইনও থাকা সম্ভব নয়।'****

রাষ্ট্রে থাকা উচিত মধ্যবর্তী, অধীনস্থ ক্ষমতা। এদের ভেতর স্বাভাবিক হল অভিজাতদের ক্ষমতা। 'যে রাজতন্ত্রে অভিজাতসম্প্রদায় নেই, সেখানে

রাজা হয়ে দাঁড়ায় স্বৈরশাসক,' — মন্তব্য করেছেন ম'তেস্ক্য।* তবে অভিজাতদের ক্ষমতাই ঐ ধরনের একমাত্র ক্ষমতা নয়। যাজকসম্প্রদায় ও নগরগুলিও এরূপ ক্ষমতা ধরে। 'রাজতন্ত্র থেকে সামন্ত, যাজকসম্প্রদায়, অভিজাতসম্প্রদায় ও নগরগুলির বিশেষাধিকার উচ্ছেদ করলে শীঘ্রই পাওয়া যাবে হয় জনগণের রাষ্ট্র, নয় স্বৈরাচারী রাষ্ট্র,' — লিখেছেন ম'তেস্ক্য**।

বিধিবদ্ধ প্রতিবাদের ক্ষমতাধারী মধ্যযুগীয় পার্লামেণ্টগুলিরও পক্ষ নিয়েছেন জ্ঞানপ্রচারক। তিনি লিখেছেন: 'রাজতন্ত্রে মধ্যবর্তী ক্ষমতা থাকাই যথেষ্ট নয়; এমন সংস্থাও প্রয়োজন যা আইনকে রক্ষা করবে। এরূপ প্রতিষ্ঠান হতে পারে কেবল একটা রাজনৈতিক মণ্ডলী, যা নবরচিত আইন প্রকাশ করবে এবং বিদ্যমান আইন বিস্মৃত হলে তা মনে করিয়ে দেবে। সম্ভ্রান্তদের প্রকৃতিগত অজ্ঞতা, নাগরিক ক্ষমতার প্রতি তাদের অমনোযোগ ও ঘৃণার দরুন এমন একটা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন দেখা দিচ্ছে যা আইনগুলি যে বিস্মৃতিতে সমাধিস্থ হতে পারত, তার তমসা থেকে তাদের ক্রমাগত বার করে আনবে। সার্বভৌমের যে মন্ত্রণা পরিষদ রয়েছে তা এই লক্ষ্যের উপযোগী নয়। প্রকৃতিগতভাবেই এ পরিষদ হল রাজার সেইসব নির্দেশের কার্যনির্বাহক আর ব্যবস্থাপক যাদের চরিত্র সাময়িক, মৌল আইনের রক্ষক তা নয়। তদুপরি, সার্বভৌমের পরিষদ অবিরত বদলায়, সর্বদা তা কাজ চালায় না, বহুজনকে নিয়ে তা হতে পারে না, শেষত, যথেষ্ট উচ্চমাত্রায় জনগণের আস্থাভাজন নয়, তাই জটিল পরিস্থিতিতে জনগণের চৈতন্যোদয়ে বা আদেশ পালনে তাদের বাধ্য করতে অক্ষম।'***

সম্প্রদায়ভেদী-প্রতিনিধিত্বমূলক রাজতন্ত্রের কতকগুলি দিকের এই আদর্শায়নে প্রতিক্রিয়াশীল প্রবণতা দেখতে গেলে ভুল হবে। আমাদের যা মনে হয়, অচল হয়ে পড়া রূপকে ম'তেস্ক্য মোটেই পুরোপুরি আদর্শায়িত করেন না। রাজকীয় ক্ষমতার সংকোচনের ঘটনাটাই কেবল তাঁকে আকৃষ্ট করেছে।

শাসনের প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গে শাসনের নীতিগুলির পার্থক্য টেনেছেন ম'তেস্ক্য। তিনি লিখেছেন: 'শাসনের প্রকৃতির সঙ্গে শাসনের নীতির

তফাৎ হল এই যে শাসনকে যা তদ্রূপ করে সেটা হল তার প্রকৃতি; আর নীতি তাই যা শাসনকে সক্রিয় হতে বাধ্য করে। প্রথমটা হল তার বিশেষ গঠন, আর দ্বিতীয়টা মানবিক চিত্তাবেগ, যা তাকে চালায়।'*

শাসনের প্রকৃতি থেকে যেখানে কোনো একটা রূপের রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠাকারী আইনের জন্ম, সেখানে নীতি থেকে আসে সে ব্যবস্থার পোষণ ও সংরক্ষণের আইন।

গণতন্ত্রে জনগণ যেহেতু একই সঙ্গে ক্ষমতাধর ও প্রজা, তাই একমাত্র সদাচারই কেবল এই ধরনের শাসনকে পোষণ করতে সক্ষম, কেননা জনগণ নিজেই আইন রচনা করে ও তা মেনে চলে। প্রজাতান্ত্রিক শাসনের দ্বিতীয় ধরনটায়, অর্থাৎ অভিজাততন্ত্রেও চালিকা শক্তি হল সদাচার, কিন্তু সেখানে তা ঐ পরিমাণে আবশ্যক নয়; এ ধরনের শাসনের প্রাণ হল সদাচারের ওপর প্রতিষ্ঠিত নরমপন্থা।

মঁতেস্ক্যর মতে, রাজতন্ত্রে সক্রিয় অন্য একটা নীতি — সম্মান। প্রশ্নটার এরূপ উপস্থাপনে ঘোরতর আপত্তি করেছেন মার্ক্স। আ. রুগের নিকট পত্রে তিনি লিখেছেন: 'সাধারণত রাজতন্ত্রের নীতি হল ঘৃণ্য, ঘৃণিত, **মানবত্বহীন মানুষ**; সম্মানকে রাজতন্ত্রের নীতি বলে ঘোষণা করায় মঁতেস্ক্য একেবারে ভুল করেছেন।'** বোঝা যায়, মঁতেস্ক্য নিজেও তাঁর যুক্তির কূটাভাস বুঝেছিলেন,, তাই ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন যে কথাটা সদাচারের ওপর প্রতিষ্ঠিত সম্মান নিয়ে নয়, কুসংস্কারভিত্তিক সম্মান নিয়ে। রাজতন্ত্রে অবশ্যই বোঝায় মর্যাদা, উৎকর্ষের অস্তিত্ব; এই মর্যাদা লাভের আকাঙ্ক্ষাই হল তার চালিকা শক্তি, বা নীতি। পরিশেষে, স্বৈরপ্রভুত্বের একমাত্র নীতি হল ভীতি।

প্রকৃতির চেয়ে নীতির ওপর মঁতেস্ক্য বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন, তাই ক্ষমতা একজনের নাকি বহুজনের হাতে সে অনুসারে শাসনের দ্বিবিধ রূপ তিনি স্বীকার করেন নি। আমরা আগে যা দেখেছি, সব ধরনের শাসনকে তিনি চারটি নীতি অনুসারে চারটি গ্রুপে ভাগ করেছেন। এই কারণে 'আইনের মর্মার্থ' গ্রন্থে শাসনের বিভিন্ন রূপ থেকে উদ্ভূত আইনের চেয়ে বিভিন্ন নীতি থেকে উদ্ভূত আইনকে অনেক বেশি জায়গা দিয়েছেন।

গণতন্ত্র ও অভিজাততন্ত্রের স্বভাবসিদ্ধ আইন প্রসঙ্গে প্রজাতান্ত্রিক

ধরনের শাসনকে যেসব নীতি পুষ্ট করছে তাদের সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে ম'তেস্ক্য নাগরিকদের ব্যাপারে রাষ্ট্রের অবিরাম ও খুবই সক্রিয় হস্তক্ষেপের আবশ্যিকতায় সর্বোপায়ে জোর দিয়েছেন। এই অনুসারে তিনি মনে করেন যে গণতন্ত্র ও অভিজাততন্ত্রকে 'নরমপন্থী শাসনের' কোঠায় ফেলা যায় না। এইভাবে দেখা দিচ্ছে শাসনের রূপকে 'নরমপন্থী' এবং 'নরমপন্থী নয়' এমন দুটি ভাগে নতুন বিভাগ যা ম'তেস্ক্য বিশেষভাবে উল্লেখ না করলেও তাঁর রাজনৈতিক তত্ত্বের পক্ষে তার গুরুত্ব সমধিক। প্রথম ভাগটায় তিনি ফেলেছেন কেবল রাজতন্ত্রকে।

এই বিভাগ থেকে এগিয়ে ম'তেস্ক্য রাজনৈতিক স্বাধীনতার প্রশ্ন বিচার করেছেন, যা, তাঁর মতে, 'থাকে কেবল নরমপন্থী শাসনে'*। তিনি লিখেছেন: ''স্বাধীনতা' কথাটার মতো এমন আর কোনো কথা নেই, যা এত বেশি বিভিন্ন তাৎপর্য লাভ করেছে এবং মানসে এত বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে।'** রাজনৈতিক স্বাধীনতার নিজস্ব একটা সংজ্ঞা দিয়েছেন জ্ঞানপ্রচারক। নাগরিকদের সমতা এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা পরিচালনায় জনগণের অংশগ্রহণের সঙ্গে রাজনৈতিক স্বাধীনতার সম্পর্ক তিনি অস্বীকার করেছেন। তিনি লিখেছেন: 'রাষ্ট্রে, অর্থাৎ যেখানে আইন আছে এমন সমাজে স্বাধীনতা হতে পারে শুধু এইটুকু যে যা বাঞ্ছনীয় হওয়া উচিত তা করার সুযোগ থাকছে এবং যা বাঞ্ছনীয় হওয়া উচিত নয় তা করতে বাধ্য হতে হচ্ছে না।'*** কথাটাকে ব্যাখ্যা করে তিনি মন্তব্য করেছেন, 'আইনে যা অনুমোদিত তেমন সবকিছু করার অধিকার হল স্বাধীনতা।'****

কোনো কোনো লেখক এই শেষ কথাটাকে ব্যাখ্যা বলে না ধরে রাজনৈতিক স্বাধীনতার ফরাসি জ্ঞানপ্রচারক প্রদত্ত সংজ্ঞা বলে ধরতে চান। আমাদের মতে, প্রশ্নটাকে এভাবে দেখলে রাজনৈতিক স্বাধীনতা সম্পর্কে ম'তেস্ক্যর দৃষ্টিভঙ্গির সারার্থের হানি হয়। তাঁর কাছে আইনের বিষয়বস্তু অনেক তাৎপর্যপূর্ণ। 'আইনের মর্মার্থ' গ্রন্থের লেখক এই কথায় জোর দিয়েছেন যে আইনকে হতে হবে ক্ষমতার অপব্যবহারের পথে

প্রতিবন্ধক,* নাগরিকদের নিরাপত্তা তা রক্ষা করবে**। মঁতেস্ক্যর যুক্তির ধারা বুঝতে হলে খুবই গুরুত্বপূর্ণ উক্ত গ্রন্থের উনত্রিংশ খণ্ডের 'আইনদাতার প্রেরণা বিষয়ক' অধ্যায়টির বিষয়বস্তু লক্ষ্য করা দরকার। তিনি লিখেছেন: 'নরমপন্থার প্রেরণা হওয়া উচিত আইনদাতার প্রেরণা এবং আমার ধারণা, আমি এই রচনাটি লিখেছি কেবল এই ভাবনাটা প্রতিপাদনের উদ্দেশ্যে। রাজনৈতিক মঙ্গল, যেমন নৈতিক মঙ্গল সর্বদাই থাকে দুই প্রান্তের মাঝখানে।'*** নিজের চিন্তাকে বিস্তারিত করে তিনি বলছেন: 'স্বাধীনতার জন্য আদালতী আনুষ্ঠানিকতা প্রয়োজন; কিন্তু তার সংখ্যা এত বেড়ে উঠতে পারে যে তাদের ধার্য করেছে যে আইন তার লক্ষ্যেরই প্রতিবন্ধক হয়ে উঠতে পারে তা। মামলা গড়াবে নিরবসানে; সম্পত্তি হয়ে উঠবে টলমলে; বিনা তদন্তে এক পক্ষের সম্পত্তি দেয়া হতে থাকবে অন্য পক্ষকে অথবা অন্তহীন তদন্তে দু'পক্ষকেই ধ্বংস করবে।'**** এই ধরনের আইনের নেতিবাচক পরিণামের মধ্যে মঁতেস্ক্য উল্লেখ করেছেন নাগরিকদের স্বাধীনতা লোপ ও অনিরাপত্তার কথা।

আইনের বিষয়বস্তুর প্রতি মঁতেস্ক্যর মনোযোগ নিয়মসঙ্গতই। আঠারো শতকের প্রথমার্ধের যে ফরাসি বুর্জোয়াদের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি মঁতেস্ক্যর রচনায় প্রতিফলিত, তারা শুধু বৈধতা প্রতিষ্ঠা নিয়ে নয়, মূলগত সামাজিক ও রাজনৈতিক সংস্কারের আইনপ্রণয়নী প্রবর্তন নিয়ে, একসারি অতি অসহনীয় যে সামন্ততান্ত্রিক নিগড় তাদের অবাধ বিকাশকে সংকুচিত করে রাখছিল, তা থেকে মুক্তি নিয়েও উদ্‌গ্রীব ছিল।

'আইনের মর্মার্থ' গ্রন্থের একাদশ ও দ্বাদশ বইয়ে বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে রাজনৈতিক স্বাধীনতার প্রশ্ন। প্রথম বইটি 'রাষ্ট্রব্যবস্থার সঙ্গে সম্পর্কিত রাজনৈতিক স্বাধীনতা প্রবর্তক' আইন নিয়ে। এখানে মঁতেস্ক্য সর্বাগ্রে আলোচনা করেছেন ব্রিটিশ সংবিধানের সাধারণ নীতি নিয়ে এবং বলেছেন যে রাজনৈতিক স্বাধীনতা হল ইংলণ্ডের রাষ্ট্রব্যবস্থার 'অব্যবহিত বিষয়বস্তু'।

ম'তেস্ক্যু উল্লেখ করেছেন যে প্রত্যেক রাষ্ট্রে আছে তিনটি করে ক্ষমতা: 'আইনপ্রণয়নী ক্ষমতা, আন্তর্জাতিক আইনের পরিচালনায় কার্যনির্বাহী ক্ষমতা এবং নাগরিকদের অধিকারের প্রশ্নে কার্যনির্বাহী ক্ষমতা'। পরে তিনি ব্যাখ্যা করেছেন: 'প্রথম ক্ষমতাবলে সার্বভৌম বা প্রতিষ্ঠান সাময়িক বা স্থায়ী আইন জারি করে এবং বিদ্যমান আইন সংশোধন বা খারিজ করে। দ্বিতীয় ক্ষমতাবলে সে যুদ্ধ ঘোষণা বা শান্তি চুক্তি করে, রাষ্ট্রদূত পাঠায় বা গ্রহণ করে, নিরাপত্তা রক্ষা করে, হামলা প্রতিরোধ করে। তৃতীয় ক্ষমতাবলে সে অপরাধ শায়েস্তা করে এবং ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে সংঘাতের মীমাংসা করে। শেষোক্ত ক্ষমতাকে বলা যেতে পারে আদালতী, দ্বিতীয়কে স্রেফ রাষ্ট্রের কার্যনির্বাহী ক্ষমতা।'* মূলত আমরা এখানে পাচ্ছি জন লকের দৃষ্টিভঙ্গির পুনরাবৃত্তি। তবে ম'তেস্ক্যু সঙ্গে সঙ্গেই এতে সংশোধনী এনে লিখেছেন: 'সবই ধ্বংস পাবে যদি একই ব্যক্তির অথবা ওমরাহ, অভিজাত বা সাধারণ লোকেদের দ্বারা গঠিত প্রতিষ্ঠানের হাতে সম্মিলিত হয় তিনটি ক্ষমতাই: আইনদানের ক্ষমতা, সর্ব-রাষ্ট্রীয় চরিত্রের নির্দেশ পালনের ক্ষমতা এবং অপরাধের অথবা ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে মামলা বিচারের ক্ষমতা'**। এই দুই সূত্রায়ণের মধ্যে সুস্পষ্ট বিরোধ আছে, কোনোক্রমে যার নিরসন করেন নি ম'তেস্ক্যু। রাজনৈতিক মতবাদের ইতিহাসে প্রথম সূত্রটি অলক্ষিত থেকে গেছে; ক্ষমতা বিভাগ বিষয়ে ম'তেস্ক্যুর মতবাদের ঐতিহাসিক ভবিষ্যৎ পুরোপুরি দ্বিতীয় সূত্রটির সঙ্গে জড়িত।

ম'তেস্ক্যুর মতবাদে ক্ষমতা বিভাগের যে কথা আছে, সেটা নেহাৎ রাষ্ট্রের বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে কাজ ভাগাভাগির ব্যাপার নয়, এটা হচ্ছে রাজনৈতিক শক্তি বিভাজনের ব্যাপার, যা করা হচ্ছে রাজনৈতিক স্বাধীনতা প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে। ভ. স. নের্সেসিয়ান্‌ৎসের সঙ্গে আমরা পুরোপুরি একমত, যিনি প্রাচীন কালের ধারণাগুলির সঙ্গে তুলনা করে ম'তেস্ক্যু সমেত আধুনিক কালের বিভক্ত ক্ষমতার বৈশিষ্ট্যগুলি দেখিয়েছেন সাফল্যের সঙ্গে। তিনি লিখছেন: 'বিভিন্ন ক্ষেত্র ও কর্মধারায় সামগ্রিক রাষ্ট্রজীবনের বিভিন্নতা প্রাচীন কালেও ছিল এবং পৌরাণিক চিন্তাতেও সে ঘটনা প্রতিফলিত হয়েছে। কিন্তু সেকালে রাজনৈতিক রাষ্ট্রের বিমূর্তায়ন না থাকায় রাজনৈতিক

রাষ্ট্রের ক্ষমতা সম্পর্কেও বিমূর্তায়ন ছিল না, আর আধুনিক কালে কথা হয়েছে মূলত তাই নিয়েই।'*

মঁতেস্ক্যুর মতে, উল্লিখিত ক্ষমতাগুলি একজনের বা একদল লোকের হাতে তুলে দেয়া অনুচিত: 'আইনপ্রণয়নী ও কার্যনির্বাহী ক্ষমতা যদি একজনের বা একটি সংস্থার হাতে তুলে দেয়া হয়, তাহলে স্বাধীনতা থাকবে না, কেননা ঐ রাজা বা সিনেট অত্যাচারীর মতো চালাবার জন্য অত্যাচারীর আইন পাশ করতে শুরু করবে, এমন আশংকা থাকবে। সে ক্ষেত্রেও স্বাধীনতা থাকবে না যদি আদালতী ক্ষমতাকে আইনপ্রণয়নী ও কার্যনির্বাহী ক্ষমতা থেকে পৃথক না করা হয়। তা যদি আইনপ্রণয়নী ক্ষমতার সঙ্গে সংযুক্ত থাকে, তাহলে নাগরিকদের জীবন ও স্বাধীনতা থাকবে স্বেচ্ছাচারের ক্ষমতাধীনে, কেননা বিচারক হবে আইনপ্রণেতাই। আদালতী ক্ষমতা যদি মিলিত হয় কার্যনির্বাহী ক্ষমতার সঙ্গে, তাহলে বিচারক নিপীড়ক হবার সুযোগ পাবে।'** বিভিন্ন ক্ষমতাধারী সংস্থা যখন একই সামাজিক সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত তবে ভিন্ন ভিন্ন লোকের হাতে থাকে তখনো, মঁতেস্ক্যুর মতে, স্বাধীনতা বিপন্ন।

তিনি দেখিয়েছেন 'ক্ষমতার অপব্যবহারের সুযোগ যাতে না থাকে, তার জন্য এমন অবস্থা দরকার যাতে বিভিন্ন ক্ষমতা পরস্পরকে সংযত রাখে।'*** এই প্রসঙ্গে তিনি মনে করেন, আইনপ্রণয়নী সভা যে আইন পাশ করেছে, তা ঠেকিয়ে রাখার অধিকার দেয়া উচিত কার্যনির্বাহী ক্ষমতাকে, এই সভা আহ্বান এবং তার অধিবেশনকালও ঐ ক্ষমতা নির্দিষ্ট করে দেবে। অন্য দিকে আবার আইনপ্রণয়নী ক্ষমতা কার্যনির্বাহী ক্ষমতার ক্রিয়াকলাপের সীমা নির্ধারণ করে দিতে পারবে আইন দ্বারা। এ ক্ষমতার পাশ করা আইন কিভাবে অনুসৃত হচ্ছে তা দেখার অধিকার আছে এ ক্ষমতার এবং সেটা তাকে দেখতে হবে। শেষত, মন্ত্রীদের জবাবদিহি করতে বাধ্য করার অধিকার থাকছে এ ক্ষমতার।

ক্ষমতার সংগঠন ও পারস্পরিক সম্পর্কের সাধারণ নীতি দেবার পর

মঁতেস্ক্য ব্যাখ্যা করেছেন ঠিক কিভাবে এক-একটা ক্ষমতা সংগঠিত হওয়া উচিত।

আদালতী ক্ষমতা কোনো একটা প্রতিষ্ঠানের ওপর ন্যস্ত থাকবে না, জনগণের মধ্যে থেকে আইনে নির্ধারিত উপায়ে এক-একটা ঋতুর জন্য ব্যক্তিবিশেষকে বিচারক করা হবে, তাদের কর্মকাল স্থির হবে আবশ্যকতা অনুসারে। গুরুতর অভিযোগের ক্ষেত্রে বিচারককে সরিয়ে দেবার অধিকার থাকবে আসামীর। মঁতেস্ক্য মন্তব্য করেছেন: 'এভাবে যে আদালতী ক্ষমতাটা লোকের কাছে এত ভীতিপ্রদ তা সুনির্দিষ্ট কোনো প্রতিষ্ঠার সঙ্গে জড়িত থাকবে না, সুনির্দিষ্ট কোনো পেশার সঙ্গেও নয়; তা হয়ে দাঁড়াবে, বলা যেতে পারে, কেমন যেন অদৃশ্য, যেন অনুপস্থিত।'*

মুক্ত রাষ্ট্রে আইনপ্রণয়নী ক্ষমতা থাকতে পারবে কেবল সমগ্র জনগণের হাতে, কেননা স্বাধীন বলে যাকে ধরা হয়েছে, তেমন প্রতিটি ব্যক্তির উচিত নিজেই নিজেকে চালানো। কিন্তু বৃহৎ রাষ্ট্রে যেহেতু তা অসম্ভব এবং ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে তাতে অনেক অসুবিধা থাকে, তাই লোকেরা নিজে নিজে যা করতে পারছে না, তা নিজের প্রতিনিধি মারফত করতে বাধ্য হয়। মঁতেস্ক্য সর্বজনীন ভোটাধিকারের বিরুদ্ধে, 'যাদের অবস্থা এতই নিচু যে তাদের নিজস্ব ইচ্ছা বলে কিছু নেই বলে ধরা হয়', তাদের ভোটাধিকার হরণ করার প্রস্তাব দিয়েছেন তিনি।**

জনগণের প্রতিনিধি সভার সঙ্গে সঙ্গে মঁতেস্ক্য অভিজাতদের নিয়ে দ্বিতীয় একটি কক্ষের পরিকল্পনা করেছেন। এ কক্ষে স্থান পেতে হবে উত্তরাধিকার সূত্রে। অভিজাতদের বিশেষ সভার 'অধিকার থাকবে জনগণের সিদ্ধান্ত বাতিল করে দেবার, যেমন জনগণেরও অধিকার থাকবে সভার সিদ্ধান্ত নাকচ করার'***। দ্বিতীয় কক্ষের অধিকার কিছুটা সংকুচিত করেছেন জ্ঞানপ্রচারক: 'উত্তরাধিকারমূলক ক্ষমতা জনগণের স্বার্থ বিস্মৃত হয়ে যেহেতু নিজেদের পৃথক স্বার্থে লিপ্ত থাকতে পারে, তাই যেসব ক্ষেত্রে এমন আশংকা থাকবে যে ক্ষমতার ব্যভিচার ঘটার মতো গুরুত্বপূর্ণ কারণ আছে, দৃষ্টান্তস্বরূপ, কর সম্পর্কিত আইনের ক্ষেত্রে, তখন প্রয়োজন হয়

যাতে আইনপ্রণয়নে তার সমস্ত অংশগ্রহণ দাঁড়ায় নাকচ করার অধিকার নিয়ে, আইন প্রবর্তন করা নিয়ে নয়।'*

কার্যনির্বাহী ক্ষমতা মঁতেস্ক্য রাজার হাতে তুলে দেবার পক্ষপাতী, 'কেননা শাসনের এই দিকটা প্রায় সর্বদা দ্রুত ক্রিয়াকর্ম দাবি করায় তা বহুজনের চাইতে একজনের দ্বারা ভালো পালিত হবে'**।

মঁতেস্ক্য প্রস্তাবিত সংবিধানের বেশ পার্থক্য আছে ব্রিটিশ সংবিধান থেকে। ফরাসি গবেষক সেইনবো যা বলেছেন, ইংরেজ শাসনকে 'হ্যানোভার রাজবংশের প্রথম দিকের রাজাদের আমলে হুইগ মন্ত্রীরা রূপান্তরিত করে দেয়; কার্যক্ষেত্রে তা ক্ষমতা বিভাগ ব্যবস্থা থেকে খুবই পৃথক। মন্ত্রীরা রাজার অধীনে পরিষদে বসা বন্ধ করে দেয়। তারা হয়ে দাঁড়ায় নিম্ন কক্ষে অধিকাংশের নেতা। মন্ত্রক রাজার বদলে এবং রাজার নামে সমস্ত রাষ্ট্রক্ষমতা করতলগত করে কার্যক্ষেত্রে হয়ে দাঁড়ায় কমন্স সভার অধিকাংশের দ্বারা নিযুক্ত স্থায়ী কমিশন। এইভাবে, মঁতেস্ক্যর ভাষায় বললে, সমস্ত ক্ষমতা ঐক্যবদ্ধ হয় কক্ষে, যা চালিত হয় অধিকাংশের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত ক্যাবিনেট মারফত। সমস্ত সার্বভৌম স্থানীয় কর্ম সাধিত হত তিনটি স্বাধীন ক্ষমতার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় নয়, দুই কক্ষের সঙ্গে মন্ত্রকের অবিরাম সহযোগিতার ফলে। ব্রিটিশ বাস্তবতা আর মঁতেস্ক্যর বর্ণনার মধ্যে তিন সংখ্যাটি ছাড়া আর কোনো মিল নেই।'***

আমাদের মতে, ক্ষমতা বিভাগের তত্ত্ব আর মঁতেস্ক্যর সাংবিধানিক প্রকল্পের মধ্যে পার্থক্য টানা উচিত। ক্ষমতা বিভাগের তত্ত্ব যেক্ষেত্রে তিনটি স্বাধীন সংস্থার মধ্যে কেবল সার্বভৌমত্ব বণ্টনের সাধারণ নীতি, মঁতেস্ক্যর সাংবিধানিক প্রকল্পটি সেক্ষেত্রে ফরাসি বাস্তবতায় এই সাধারণ নীতিগুলির প্রয়োগ। পরারাজতন্ত্রের পরিস্থিতিতে মঁতেস্ক্য তিনটি রাজনৈতিক শক্তিকে ভাগ করেছেন: জনগণ, এবং তা বলতে তিনি সর্বাগ্রে বুঝিয়েছেন বর্ধমান বুর্জোয়া শ্রেণীকে, রাজক্ষমতা এবং অভিজাত সম্প্রদায়। সমগ্রভাবে এরূপ অনুমান বাস্তবের সঙ্গে মেলে। ফ্রান্সে রাজক্ষমতা, অভিজাত সম্প্রদায় ও বুর্জোয়া শ্রেণীর মধ্যে আধিপত্য নিয়ে বিবাদ চলছিল। মঁতেস্ক্য তাঁর

প্রকল্পে সংগ্রামী শক্তিগুলির মধ্যে আপোসের সূত্র খুঁজেছেন। তাঁর এই যুক্তিটি অর্থপূর্ণ: 'যে তিনটি ক্ষমতার কথা আমরা বলেছি, তার মধ্যে আদালতী ক্ষমতা এক অর্থে আদৌ ক্ষমতা নয়। থাকছে কেবল প্রথম দুটি। চূড়ান্তপনা থেকে তাদের সংযত রাখার জন্য প্রয়োজন নিয়ন্ত্রক ক্ষমতা। এই কাজটা খুব ভালোভাবে সম্পাদন করতে পারে আইনপ্রণয়নী দেহের অভিজাত অংশটা।'* মঁতেস্ক্যুর উত্তরাধিকার নিয়ে আধুনিক ফরাসি গবেষক গয়ার্দ-ফবরের সঙ্গে আমরা এ বিষয়ে পুরোপুরি একমত যে এই কথাগুলোতেই রয়েছে মঁতেস্ক্যুর সাংবিধানিক ব্যবস্থা বোঝার চাবিকাঠি। গয়ার্দ-ফবর বলছেন, এ কথা ভাবা ঠিক নয় যে 'মঁতেস্ক্যু বুঝি বিচারকদের দ্বারা চালিত বিচারব্যবস্থা, পার্লামেণ্ট দ্বারা চালিত আইনপ্রণয়নী কাজ আর রাজা কর্তৃক নির্বাহিত আইন পালনের ওপর সমান গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি এই কথায় পরিষ্কার জোর দিয়েছেন যে বিচার সংস্থা যেহেতু সত্যকার ক্ষমতা, অর্থাৎ রাজনৈতিক শক্তি নয়, তাই তা শুধু তার কাজের দিক থেকে নয়, প্রকৃতিগতভাবেই অন্য দুটি সংস্থা থেকে পৃথক। কেবল পার্লামেণ্ট আর রাজাই রাজনৈতিক শক্তি। এবং খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে এই দুই শক্তি বণ্টিত হয় তিনটি ধাপে: দুটি আইনপ্রণয়নী কক্ষ — একটা গণতান্ত্রিক, অন্যটা আভিজাতিক এবং রাজার মধ্যে; ধাপগুলি বিভক্ত, কিন্তু পরস্পর সংশ্লিষ্ট, রাষ্ট্রকর্ম চালনার গতিপথে সহযোগিতা করে একমত হয়ে চলতে তারা বাধ্য।'**

মঁতেস্ক্যু তাঁর সাংবিধানিক প্রকল্পের বেশ কিছু পরিপূরণ করেছেন 'আইনের মর্মার্থ'এর দ্বাদশ খণ্ডে — 'আইন বিষয়ে, যা নাগরিকের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করে' রচনায়।

তিনি লিখেছেন: 'রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রসঙ্গে দেখাই যথেষ্ট নয়, নাগরিকের প্রসঙ্গেও তাকে দেখতে হবে। আমি আগে বলেছি যে প্রথম ক্ষেত্রে তা প্রতিষ্ঠিত হয় তিনটি ক্ষমতার মধ্যে নির্দিষ্ট একটা ভাগাভাগি দ্বারা, কিন্তু দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তাকে দেখতে হবে অন্য একটা দৃষ্টিকোণ থেকে: এখানে রাজনৈতিক স্বাধীনতা নিহিত নাগরিকের নিরাপত্তায়

অথবা নিজ নিরাপত্তা সম্পর্কে নাগরিকের নিশ্চয়তায়।'*

এ গ্রন্থের কেন্দ্রীয় বিষয় হল ফৌজদারি আইন ও মামলার প্রগতিশীল নীতির প্রতিপাদন। জ্ঞানপ্রচারক দাবি করেছেন যে 'নাগরিকের স্বাধীনতা নির্ভর করে প্রধানত ফৌজদারি আইনের উৎকর্ষের ওপর'**। আর ফৌজদারি-মামলার ব্যাপারে তিনি মনে করেন, 'ফৌজদারি মোকদ্দমা চালানো উচিত শ্রেষ্ঠ যেসব নিয়মে, তার অবগতি মানবজাতির পক্ষে অন্য সবকিছুর চাইতে গুরুত্বপূর্ণ'***।

মঁতেস্ক্যর সাংবিধানিক প্রকল্পের বিষয়বস্তুতে প্রতিফলিত হয়েছে সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে আপোস সন্ধানী বুর্জোয়ার চাহিদা। ফরাসি বুর্জোয়ার রাজনৈতিক প্রভাব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উক্ত প্রকল্প তার অর্ধগামিতা ও সঙ্গতিহীনতার দরুন বুর্জোয়া শ্রেণীর সর্বাধিক অগ্রণী প্রতিনিধিদের আর তুষ্ট করতে পারছিল না। তাঁর নীতিগুলির, বিশেষ করে তাদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ — ক্ষমতা ভাগাভাগির নীতির ভাগ্য দাঁড়ায় অন্যরকম।

মঁতেস্ক্য প্রস্তাবিত রাজনৈতিক নীতিগুলিকে সাংবিধানিক আইনের ভাষায় অনুবাদে বিশেষ তাৎপর্য ধরেছিল সুইস দেলোলমের রচনা, যিনি বহু বছর বাস করেছিলেন ইংলণ্ডে। ১৭৭১ সালে তিনি প্রকাশ করেন তাঁর প্রধান রচনা 'ব্রিটিশ সংবিধান'। এতে ক্ষমতা ভাগাভাগির তত্ত্ব থেকে তিনি ইংলণ্ডের রাষ্ট্রব্যবস্থার বিস্তারিত ব্যবহারশাস্ত্রীয় বিশ্লেষণ দিয়েছেন। তাঁর বইখানা বহুল প্রচার লাভ করে।

দেলোলমেরও আগে প্রখ্যাত ইংরেজ ব্যবহারশাস্ত্রী ব্ল্যাকস্টোন তাঁর 'ইংরেজ আইন সম্পর্কে মন্তব্য' গ্রন্থে (১৭৬৫ সাল) ক্ষমতা ভাগাভাগি নিয়ে মঁতেস্ক্যর মতবাদ ব্যবহার করেছিলেন ব্যাপকভাবে।

ব্ল্যাকস্টোন, দেলোলম এবং অন্যান্য বুর্জোয়া ব্যবহারশাস্ত্রীদের রচনায় ক্ষমতা ভাগাভাগি নীতির সূত্রায়ণকে বুর্জোয়া নিয়মতান্ত্রিক আইনপ্রণয়নী চাহিদার কাছাকাছি নিয়ে আসা হয়। এ নীতিটি হল ব্যবহারশাস্ত্রীয় উপায়ে এইগুলি নিশ্চিত করার প্রয়াস: ১) রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গের পরস্পর থেকে, এবং বিশেষত তাদের গঠনের পর্যায়ক্রমে আপেক্ষিক স্বাধীনতা; ২) (ক) প্রতিটি সংস্থার ক্রিয়াক্ষেত্র আলাদা করে দিয়ে এবং (খ) একটা সংস্থার

দৃষ্টিকোণকে অন্য সংস্থার দৃষ্টিকোণের বিপরীতে রাখতে পারার, অন্য সংস্থার সিদ্ধান্ত পালনে বাধা দেবার সুযোগ করে দেয়া, যদিও নিজ সিদ্ধান্তকে তার স্থলাভিষিক্ত না করে ('সংযমন আর সমভার') মারফত প্রতিটি সংস্থার ক্ষমতাকে সীমিত রাখা। ক্ষমতার ভাগাভাগি হল গৃহীত লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে চালিত রাষ্ট্রিক-আইনী প্রতিষ্ঠানাদির একটা ব্যবস্থা। এর মধ্যে পড়ে ভেটো দান, সংস্থা ভেঙে দেয়ার অধিকার, পার্লামেণ্টী আইনপ্রণয়ন, প্রশাসনের একধরনের আজ্ঞার স্বায়ত্তাধিকার আর অন্যগুলির আইনসম্মতি, বিচারকদের 'স্বাধীনতা' ইত্যাদি প্রথা।

রাষ্ট্রীয় আইনে ক্ষমতা বিভাগ নীতির বাস্তব তাৎপর্যের মূল্যায়ন করে এঙ্গেলস লেখেন যে ওটা 'আসলে সরলীকরণ ও নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রীয় যন্ত্রব্যবস্থায় প্রযুক্ত গদ্যজাতীয় কার্যকরী শ্রমবিভাগ ছাড়া আর কিছু নয়। অন্য সমস্ত চিরন্তন, পবিত্র, অলঙ্ঘনীয় নীতির মতো এ নীতিটাও সেই পরিমাণে প্রযুক্ত হয় যে পরিমাণে তা বিদ্যমান সম্পর্কের উপযোগী।'*

যে বুর্জোয়া উদারনীতিকেরা রাষ্ট্রকে 'নৈশ প্রহরীর' ভূমিকা দিতে চেয়েছিল, 'সাংবিধানিক অর্থে' ক্ষমতা বিভাগ নীতি তাদের তত্ত্বের সঙ্গে চমৎকার খাপ খেয়েছিল। ব্যবহারশাস্ত্রীয় 'সংযমন ও সমভার' ব্যবস্থা পুঁজিপতি শ্রেণীর সাধারণ স্বার্থ রক্ষার গ্যারাণ্টি দেয় এবং সে শ্রেণীর এক-একটা স্তরের পক্ষ থেকে কেবল নিজেদের স্বার্থেই রাষ্ট্রযন্ত্রের ব্যবহার ব্যাহত করে।

যে সাংবিধানিক নিরিখে আনুষ্ঠানিকভাবে ক্ষমতার বিভাগ ঘোষণা করা হয়েছিল, বিভিন্ন পর্বে ও বিভিন্ন দেশে তার তাৎপর্য মোটেই একই রকম ছিল না। প্রায়ই এই নিরিখগুলো দেখা গিয়েছিল অলীক। যেমন, প্রাশিয়ার রাষ্ট্রব্যবস্থার বর্ণনা প্রসঙ্গে এঙ্গেলস লেখেন: '...প্রাশিয়ায় কি কার্যক্ষেত্রে ও আইন দ্বারা ক্ষমতার বিভাগ আছে...? ক্ষমতার বিদ্যমান বিভাগ কি অসীমিত আমলাতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের সঙ্গে খাপ-খাওয়ানো একটা সীমাবদ্ধ, কর্তিত ব্যাপার নয়? সুতরাং, ক্ষমতার এই বিভাগ যতক্ষণ না সাংবিধানিক প্রেরণায় পুনর্গঠিত হচ্ছে, ততক্ষণ সাংবিধানিক বোধ তার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায় কিভাবে?'**

ব্রিটিশ আধিপত্য থেকে মুক্তির পর উত্তর আমেরিকার একসারি উপনিবেশের সংবিধানে ক্ষমতার বিভাগ শুরু হয়। ভার্জিনিয়া, উত্তর ক্যারোলিনা, জর্জিয়া, মেরিল্যান্ড, নিউ হেম্পশায়ারের সংবিধান ছিল এইরকম। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ১৭৮৭ সালের সংবিধানে ক্ষমতা বিভাগের নীতিও অনুসৃত হয়েছে।

মহান ফরাসি বিপ্লবের পর্বে ফরাসি বুর্জোয়া শ্রেণী ক্ষমতা বিভাগের তত্ত্ব ব্যাপকভাবে কাজে লাগায়। ১৭৮৯ সালেই 'মানুষ ও নাগরিকের অধিকার ঘোষণা'য় বলা হয়েছিল: 'যে সমাজে... ক্ষমতার বিভাগ প্রবর্তিত হয় নি, তার সংবিধান নেই' (ধারা ১৬)। ১৭৯১ সালের সংবিধানে মঁতেস্ক্যুর চেয়ে সুসঙ্গতভাবে ক্ষমতা বিভাগের নীতি প্রবর্তিত হয়েছিল। সংবিধান অনুসারে, কক্ষগুলির অধিবেশন বসত ও শেষ হত রাজার ইচ্ছা নির্বিশেষে এবং তা আইন পাশ করত রাজার সম্মতির অপেক্ষা না করেই।

১৭৯১ সালের ফরাসি ও ১৭৮৭ সালের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান বহু বুর্জোয়া সংবিধানের আদর্শ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

কিছু বুর্জোয়া সংবিধানের আদর্শে ক্ষমতা বিভাগের যে নীতি নিবদ্ধ হয়েছিল, তাতে প্রশাসন থেকে পার্লামেণ্ট ও আদালত বিভাগের নির্দিষ্ট একটা ভেদরেখা টানা হয়। সাম্রাজ্যবাদী যে যুগের লক্ষণ হল ক্ষমতার কেন্দ্রীভূতির বৃদ্ধি, সর্বাগ্রে পার্লামেণ্টকে হটিয়ে কার্যনির্বাহী ক্ষমতার বাড়, তখন এই আদর্শগুলি বুর্জোয়ার পক্ষে সংকোচন বলে ঠেকে। সেটা ক্ষমতা বিভাগ তত্ত্বের আধুনিক ব্যাখ্যাকে প্রভাবিত না করে পারে নি। সোভিয়েত ব্যবহারশাস্ত্রী ই. দ. লেভিন বলেছেন যে, ক্ষমতা বিভাগ নীতি প্রতিপাদনের পুরনো পদ্ধতি, মঁতেস্ক্য থেকে যার সূত্রপাত, সাধারণভাবে তা বর্জন না করলেও বুর্জোয়া পণ্ডিতেরা তাদের পরিপূরণ করছেন একসারি নতুন প্রতিপাদ্য দিয়ে, তাতে করে চেষ্টা করছেন বলবৎ রাষ্ট্রিক আইনে এবং বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলির কর্মধারায়, বিশেষ করে আইনপ্রণয়নী ও কার্যনির্বাহী ক্ষমতার পারস্পরিক সম্পর্কের ব্যাপারে নতুন দিকের তাত্ত্বিক ভিত্তি যোজনার, যা মূলত ঐ নীতি থেকে প্রস্থান।

যেমন, ক্ষমতার 'নমনীয়' ও 'কঠোর' বিভাগের মধ্যে পার্থক্য টানছেন সাংবিধানিক আইনের ফরাসি তত্ত্বকাররা। এতে 'নমনীয়' বিভাগ যাতে ক্ষমতাগুলির সহযোগিতা, এমনকি এক ক্ষমতা কর্তৃক অন্য ক্ষমতার কর্তব্য

আংশিক সম্পাদনের অবকাশ থাকছে, তাকেই মতবাদটার সর্বাধিক মর্মানুসারী বলে ঘোষণা করা হচ্ছে।

সেইসঙ্গে একসারি লেখক ক্ষমতা বিভাগের মতবাদকে পুরোপুরি অসিদ্ধ বলে মনে করেন। ফরাসি প্রফেসর জ. ব্যুর্দো মন্তব্য করেছেন যে মতবাদটা সংবিধানে প্রতিফলন লাভ করলেও রাজনৈতিক বাস্তবতা কোনোক্রমেই তার অনুসারী নয়।'*



§ ৯। জাঁ জাক রুসো

জন্মসূত্রে সুইস হলেও রুসোর (১৭১২-১৭৭৮) ক্রিয়াকলাপ ঘনিষ্ঠভাবে ফ্রান্সের সঙ্গে জড়িত। রাজনৈতিক মতবাদের ইতিহাসে রুসো পেটি বুর্জোয়ার ভাবাদর্শী ও গণতান্ত্রিক ভাবনার প্রচারক বলে পরিচিত। রুসোর রাজনৈতিক মতবাদ ১৮ শতকের ফরাসি বুর্জোয়া বিপ্লবের প্রাক্কালে ও তৎকালে বিপুল প্রভাব ফেলে ফ্রান্সের গণতান্ত্রিক মহলের সামাজিক চেতনায়।

রুসোর ধ্যানধারণা আগের মতোই রয়ে গেছে রাজনৈতিক সংগ্রামের নাভিবিন্দুতে, যতরকমের ব্যাখ্যা ও অপব্যাখ্যা হচ্ছে তার। যেমন, আঠারো শতক থেকে শুরু করেই রুসোকে নরমপন্থী নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের পক্ষপাতী বলে দেখাবার চেষ্টা হয়ে আসছে। অন্যদিকে, রুসোর

গণতন্ত্রবাদকে নস্যাৎ করে তাঁকে ঘোষণা করা হয়েছে 'সর্বগ্রাসী গণতন্ত্র' তত্ত্বের স্রষ্টা বলে। সেইজন্যই রুসোর মতবাদ যেমন তার উদ্ভবের কালে, তেমনি পরবর্তী যুগে সত্যই কী ভূমিকা নিয়েছে, তা স্থির করায় আগ্রহ নিঃসন্দেহেই গুরুত্বপূর্ণ।

সাহিত্যিক খ্যাতি রুসো লাভ করেছিলেন বেশ বিলম্বেই। ৩৭ বছর বয়সে তিনি দিজোঁ আকাদেমি খোষিত প্রতিযোগিতায় যোগ দেন। আকাদেমি প্রসঙ্গ দিয়েছিল 'বিজ্ঞান ও শিল্পকলার রেনেসাঁসে কি রীতিনীতির পরিস্ফুতিতে সাহায্য হয়েছে?'। এতে রুসোর রচনা 'বিচার' পুরস্কার লাভ ও সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

যে প্রশ্নটি করা হয়েছিল, তার জবাবে রুসো অতীতের সমাজব্যবস্থাকে আদর্শরূপে চিত্রিত করেছেন। তিনি লেখেন: 'রীতিনীতির কথা ভাবতে গেলে আদিম কালের রীতিনীতির সরলতার চিত্রটি সানন্দে স্মরণ না করে পারা যায় না। সে এক অপরূপ উপকূল, কেবল প্রকৃতির হাতেই তা সজ্জিত, সে দিকে অবিরাম নিবদ্ধ হয় আমাদের দৃষ্টি, তা থেকে সরে যাই কতই-না অনিচ্ছায়।'* তিনি ঘোষণা করেছেন, বিজ্ঞান ও শিল্পকলা প্রকৃতিবিরোধী, লোকেদের কদভ্যাস তাদের উদ্ভবের জন্য দায়ী।

রুসোর 'বিচার'এ বিজ্ঞান ও শিল্পকলার প্রগতিশীলতা ও প্রয়োজনীয়তার যে অস্বীকৃতি আছে, কিছু লেখক সেটাকে সন্দেহাতীত প্রতিক্রিয়াশীল বলে গণ্য করেন। প্রখ্যাত রুশ ঐতিহাসিক ন. ই. কারেয়েভ এই প্রসঙ্গে লিখেছেন: 'যেসব লেখক রুসোর ওপর একটা দ্বৈত ভূমিকা অর্পণ করেন — একদিকে, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে চরম বিপ্লবী, অন্যদিকে, সাংস্কৃতিক ব্যাপারে চরম প্রতিক্রিয়াশীল, তাঁদের মতে সায় না দিয়ে... পারা যায় না।'** রুসোর দৃষ্টিভঙ্গির সঠিক উপলব্ধিতে সাহায্য হবে মানবজাতির আদিম ইতিহাস সম্পর্কে তাঁর মনোভাব বিচার করলে।

রুসো আদিম ইতিহাসের দ্বারস্থ হয়েছেন মানুষের সত্যকার প্রকৃতি বোঝার জন্য। এ জন্য তিনি মনে করেন মানুষের ইতিহাস শুরুর আগে সে যে স্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে ছিল তার সুনির্দিষ্ট ধারণা অর্জন প্রয়োজন।

আঠারো শতকে স্বাভাবিক অবস্থা সম্পর্কে ধারণা খুবই চালু ছিল আর 'স্বাভাবিক মানুষকে' ভূষিত করা হয় বুর্জোয়া সমাজসদস্যের গুণাবলি দিয়ে। এই ভুল ধারণার সমালোচনা করে কার্ল মার্কস লিখেছেন: 'আঠারো শতকের পয়গম্বরদের কাছে... মনে হয়েছিল আঠারো শতকের এই যে স্বতন্ত্র ব্যক্তি একদিকে সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার ভাঙন এবং অন্যদিকে ১৬ শতক থেকে সূচিত নতুন উৎপাদনী শক্তির বিকাশের ফল, তা-ই আদর্শ, যার অস্তিত্ব অতীতে; তাকে এরা মনে করত ইতিহাসের ফল নয়, তার যাত্রাবিন্দু'*। তাঁর সমসাময়িক তত্ত্বকারদের এই ভুলের দিকে রুসোও কিছুটা মন দেন এবং মন্তব্য করেন যে 'ওঁরা বন্য মানুষের কথা বলছেন আর তাকে আঁকছেন নাগরিক অবস্থায়'**।

সেইসঙ্গে স্বয়ং রুসোর ধ্যানধারণাও ছিল বাস্তবতা থেকে সমান দূরবর্তী। তবে সেই বাস্তবতাকে জানবার দায় তিনি নেন নি। তাঁর কাছে 'স্বাভাবিক অবস্থার' ধারণাটা ছিল কাণ্ট পরে যার নামকরণ করেছিলেন 'নিয়ামক ভাবনা'। রুসো মানেন যে 'স্বাভাবিক অবস্থা' 'সম্ভবত কখনোই ছিল না'***। তিনি লিখেছেন: 'সমস্ত ঘটনা-তথ্যকে ছুড়ে ফেলে দিয়ে শুরু করা যাক, কেননা নির্দিষ্ট প্রশ্নটির সঙ্গে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই। এই বিষয় নিয়ে যে সন্ধান চালানো যেতে পারে তার ফলাফলকে আমাদের গ্রহণ করা উচিত ঐতিহাসিক সত্য হিশেবে নয়, কেবল অনুমাননির্ভর ও শর্তসাপেক্ষ এমন বিচার হিশেবে, যা তার সত্যকার উদ্ভব প্রতিষ্ঠা করার চেয়ে ব্যাপার-স্যাপারের প্রকৃতিতে আলোকপাত করতে বেশি সক্ষম এবং বিশ্ব সৃষ্টি বিষয়ে আমাদের প্রকৃতিবিজ্ঞানীরা অবিরাম যেসব অনুমান হাজির করছেন তা তার অনুরূপ।'****

রুসোর কাছে 'স্বাভাবিক মানুষ' হল সমাজের বাইরে বসবাসী বিচ্ছিন্ন লোক। তাঁর মতে, এই অবস্থায় একের কাছে অপরের কোনো প্রয়োজন ছিল না লোকেদের। কোনোরকম প্রজ্ঞানের দরকার ছিল না মানুষের। 'একমাত্র

সহজপ্রবৃত্তিতেই থাকত সব যা তার বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজন হত।'*

'স্বাভাবিক অবস্থায়' জীবনের পরিস্থিতি বিশদে আলোচনা করে রুসো এই সিদ্ধান্তে পোঁছেছেন যে অসাম্য, এমনকি স্বাভাবিক হলেও এ অবস্থায় তার কোনো তাৎপর্য ছিল না। এই পর্বে মানুষ কর্তৃক মানুষের নিপীড়ন সম্ভব নয়। তিনি লিখেছেন: 'যে ফল অন্য মানুষ সংগ্রহ করে, যে পশুপাখি সে মারে, যে গুহাটা তার আশ্রয় মানুষ অবশ্যই তা ভোগ করতে পারে, কিন্তু কেমন করে সে অন্যকে নিজের অধীনস্থ করতে পারবে? আর যে লোকেদের কোনো সম্পত্তিই নেই, তাদের মধ্যে অধীনতার কোন বন্ধন সম্ভব?'** প্রবল যে ব্যক্তি দুর্বলকে তার জন্য আহার্য সংগ্রহে বাধ্য করছে, আদিম সমাজের পক্ষে তার অসম্ভাবিতার এক ছবি দিয়েছেন রুসো। প্রবলের পক্ষে এক মুহূর্তের জন্যও দুর্বলকে দৃষ্টিচ্যুত করা চলবে না আর রাতে তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রাখতে হবে যাতে সে না পালায়, অর্থাৎ প্রবল যে মেহনত এড়াতে চায় তার চেয়েও কষ্টকর মেহনত তাকে নিজের কাঁধে নিতে হবে! 'এইসব নিষ্প্রয়োজন খুঁটিনাটিতে না গেলেও' — রুসো তাঁর প্রদত্ত উদাহরণটির ওপর মন্তব্য করেছেন, 'সকলের কাছেই এটা পরিষ্কার হওয়া উচিত যে গোলামির বাঁধন গড়ে ওঠে কেবল লোকেদের পারস্পরিক নির্ভরতা এবং তাদের মিলিত করা একের কাছে অপরের চাহিদা থেকে, সুতরাং অপরকে ছাড়া সে চলতে পারছে না, এমন অবস্থায় আগে কাউকে না ফেললে কোনো ব্যক্তিকে দাস করা সম্ভব নয়; এই পরিস্থিতি নেই স্বাভাবিক অবস্থায়, তাই জোয়াল থেকে সবাই মুক্ত আর বেশি শক্তিশালী মানুষের কোনো আইন সেখানে সক্রিয় নয়।'***

'বিরল যেসব ক্ষেত্রে সাধারণ স্বার্থে তার সদৃশদের সঙ্গে সহযোগিতার ওপর ভরসা করা যায়' — ক্রমে ক্রমে তা ধরতে পারার সামর্থ্য অর্জন করে আদিম মানুষও। এইসব ক্ষেত্রে 'সে মিলিত হল তাদের সঙ্গে একটি পালে, কিংবা, সবচেয়ে বেশি হলে কোনো ধরনের অবাধ সম্মিলনে, যা কারো ওপর কোনো বাধ্যবাধকতা চাপাত না এবং ততদিনই টিকে থাকত যতদিন থাকত সে সম্মিলন ঘটাবার স্বল্পকালীন প্রয়োজন।'**** একত্র

—

জীবনযাপনের উদীয়মান অভ্যাসে দেখা দিল পরিবার। ক্রমে ক্রমে দানা বাঁধল মানুষের সমাজ।

রুসোর সমস্ত সহানুভূতি মনুষ্য সমাজের অস্তিত্বের প্রথম পর্বটায়। তিনি লিখেছেন: 'লোকে যতদিন নিজেদের হতভাগ্য ঝুপড়িতে তুষ্ট থেকেছে, যতদিন তারা গাছের বা মাছের কাঁটা দিয়ে পশুচর্মের পোশাক বানানো, পালক আর ঝিনুকের অলংকারে নিজেদের সজ্জিত করা, নানা রঙে নিজেদের গা রাঙানো, নিজেদের তীর-ধনুক উন্নত বা অলংকৃত করা, ছুঁচলো পাথর দিয়ে কোনোরকম একটা ডিঙি বা স্থূল কোনো বাদ্যযন্ত্র নির্মাণে সীমাবদ্ধ থেকেছে, মোট কথা, যতদিন তারা লিপ্ত থেকেছে এমন শ্রমে যা একজন লোকের সাধ্যায়ত্ত, এবং কেবল এমন বৃত্তিতে যাতে বহু হস্তের প্রয়োজন নেই, ততদিন তারা অবাধে, তেমন স্বাস্থ্যে, সদয়তায়, সুখস্বাচ্ছন্দ্যে থাকতে পেরেছে যতটা প্রকৃতিগতভাবে তাদের পক্ষে সম্ভব এবং নিজেদের মধ্যে সম্পর্কে তারা স্বাধীনতা লঙ্ঘন না করে আদানপ্রদানের আনন্দ উপভোগ করে গেছে।'* রুসো মনে করেন, এই যুগটা মানবজাতির ইতিহাসে সবচেয়ে সুখী ও সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী একটা যুগ।** 'এই অবস্থাটা হল বিশ্বের সত্যকার তারুণ্য, বাকি সমস্ত বিকাশ হল ব্যক্তিসত্তার উৎকর্ষের দিকে বাহ্যত পদক্ষেপ, কিন্তু কার্যত সেটা বংশের স্থবিরতার দিকে,'*** — মন্তব্য করেছেন মনস্বী।

সহানুভূতির সঙ্গে রুসো যে সমাজের বর্ণনা দিয়েছেন তার স্পষ্টতই পরিপার্শ্বের প্রকৃতি সম্পর্কে যথেষ্ট বিকশিত জ্ঞান ও শিল্পকলার সঙ্গে পরিচয় ছিল। মনীষী নিজেই সে দিকটায় জোর দেন, যখন তিনি লেখেন যে 'গান আর নাচ... হয়ে দাঁড়ায় কোনো একটা ভিড়ে মিলিত নারী পুরুষের... প্রমোদ'****। এই জ্ঞান ও শিল্পকলার সূচনাকে রুসো মোটেই অস্বীকার করেন নি। তাঁর কাছে কেবল সেই জ্ঞান ও শিল্পকলা দুষ্ট ও অগ্রহণীয় যা বর্ণিত সমাজব্যবস্থা ধ্বংস করেছে, 'বিপুল সামাজিক বিপ্লব' ঘটিয়েছে, যার ফলে 'অন্তর্ধান করে সমতা, দেখা দেয় সম্পত্তি, শ্রম হয়ে দাঁড়ায় আবশ্যক; বিস্তীর্ণ সব বন হয়ে দাঁড়ায় নয়নাভিরাম ক্ষেত, যাকে সেচ করতে হবে মানুষের

ঘাম দিয়ে, অচিরেই তা রোপিত হয় এবং ফসলের সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে ওঠে দাসত্ব ও দারিদ্র্য।'*

রুসোর যে মতামত তুলে দেয়া হল তা থেকে এই সিদ্ধান্ত করা সম্ভব যে বিজ্ঞান ও শিল্পকলার যে নিন্দা তিনি করেছেন, তা চূড়ান্ত গোছের কিছু নয়। রুসো প্রতিফলিত করেছেন ক্ষুদ্র উৎপাদকের মনোবৃত্তি, যাদের কাছে প্রগতি ও সভ্যতার সে সময়ের পক্ষে নতুন ফলগুলি ছিল অনায়ত্ত এবং টেক্‌নিক ও বৃহৎ যান্ত্রিক উৎপাদনের বিকাশ যাদেরকে ধ্বংসে নিক্ষিপ্ত করছিল।

এক্ষেত্রে বেশ সুস্পষ্ট ভেদরেখা দেখা যায় ভলটেয়ারের মতো বুর্জোয়া আলোকদাতাদের মতাদর্শ আর রুসো যার অন্তর্ভুক্ত সেই বৈপ্লবিক-গণতান্ত্রিক শিবিরের মতাদর্শের মধ্যে। আলোকদাতারা মনে করতেন বিজ্ঞানের বিকাশে শেষ পর্যন্ত আপনা-আপনিই সামাজিক অন্যায়ের উচ্ছেদ ঘটবে। রুসোর কাছে এরূপ অবস্থান অগ্রহণীয়।

রুসোর মতে, স্বাভাবিক অবস্থা থেকে নির্গমন সূচিত হয়েছে এই থেকে যে দৈহিক অথবা স্বাভাবিক অসাম্যের সঙ্গে সঙ্গে লোকেদের মধ্যে দেখা দিল নতুন ধরনের অসাম্য, রুসো যাকে বলেছেন শর্তাধীন, বা রাজনৈতিক অসাম্য।

তাঁর মতে, অসাম্য আবির্ভাবের প্রথম পর্যায় হল সম্পত্তির উদয়। 'প্রথম যে লোকটা এক খণ্ড জমিতে বেড়া তুলে ঘোষণা করার কথা ভাবল: 'এটা আমার,' এবং সেটা বিশ্বাস করার মতো যথেষ্ট সহজ-সরল লোকও পেল, সে-ই হল নাগরিক সমাজের সত্যকার প্রতিষ্ঠাতা। কত অপরাধ, যুদ্ধ, হত্যা, দুর্ভাগ্য আর বীভৎসা থেকে মানববংশকে সে বাঁচাতে পারত যে গোঁড়ো তুলে অথবা কাটা খাল বুজিয়ে নিজের সদৃশদের কাছে চিৎকার করে উঠতে পারত: 'এই প্রবঞ্চকের কথা শোনা থেকে সাবধান; তোমরা মারা পড়বে যদি ভুলে যাও যে মাটির ফল সবার জন্য, আর খাস মাটিটা কারো নয়!' লিখেছেন রুসো।** সম্পত্তির আবির্ভাবে লোকেদের জীবনে গভীর পরিবর্তন ঘটে, বেড়ে ওঠে স্বাভাবিক অসাম্যের গুরুত্ব, দেখা দিল নতুন ধরনের অসাম্য — ধনী দরিদ্রে প্রভেদ। সমাজে শুরু হল ভয়াবহ তোলপাড়, লোকে হয়ে উঠল কৃপণ, অহংকারী, আক্রোশপরায়ণ, চলল

অবিরাম সংঘাত যার পরিণাম লড়াই আর হত্যাকাণ্ডে। এই পরিস্থিতিতে 'ধনীরা শেষ পর্যন্ত প্রয়োজনের চাপে এমন একটা পরিকল্পনা বানাল, যা মানব মস্তিষ্কে কদাচ উদিত সমস্ত পরিকল্পনার মধ্যে অতি সুচিন্তিত: যারা তাদের আক্রমণ করেছে তাদের শক্তিগুলিকে নিজের কাজে লাগানো, নিজের প্রতিপক্ষকে নিজের রক্ষকে পরিণত করা।'* ধনীরা বিচারের নিয়ম-কানুন এবং সালিশী আদালত গঠন, সাধারণ সম্মতি রক্ষা করার মতো ক্ষমতা স্থাপনের প্রস্তাব দিল। রুসো লিখছেন: 'সবাই সাগ্রহে শেকল পরে নিল এই বিশ্বাসে যে নিজেদের মুক্তি নিশ্চিত করছে।' কিন্তু পরিণাম দাঁড়াল অন্যরকম। সমাজ এবং আইনগুলি 'দুর্বলের নতুন শেকল পরায় আর ধনীদের নতুন শক্তি দেয়, চূড়ান্তরকমে উচ্ছেদ করে স্বাভাবিক মুক্তির, চিরকালের মতো প্রতিষ্ঠিত করে মালিকানা ও অসাম্যের আইন, চতুর জবরদখলকে পরিণত করে অলঙ্ঘনীয় অধিকারে এবং সেই থেকে কিছু স্বার্থপরদের লাভের জন্য সমস্ত মানববংশকে নিপতিত করেছে মেহনত, দাসত্ব আর দারিদ্র্যে।'**

বিচারব্যবস্থা এবং আইনের উদ্ভবে তখনো রাষ্ট্রের উদ্ভব সূচিত হয় নি। রুসো এই কথায় জোর দেন যে জায়মান শাসনব্যবস্থার তখনো কোনো স্থায়ী ও নিয়মিত আকার ছিল না। কিন্তু যে বিশৃঙ্খলা বন্ধ হচ্ছিল না তাতে লোকেদের মনে এই চিন্তা আসে যে, 'এক-একজন ব্যক্তির ওপর বিপজ্জনক দায়িত্বটা — সাধারণ ক্ষমতা অর্পণ করা হোক আর জনসাধারণের সিদ্ধান্ত পালনের ওপর তত্ত্বাবধানের ভার দেয়া হোক ম্যাজিস্ট্রেটদের'***। ম্যাজিস্ট্রেটদের অনাচারে অসাম্য বৃদ্ধি পেতে থাকে, দেখা দিল পরাক্রান্ত আর অসহায় লোক। সমাজে বিশৃঙ্খলা চলতেই থাকে তার ভেতর থেকেও, রুসো লিখছেন, 'জঘন্য মাথা তোলে স্বৈরতন্ত্র... অসাম্যের এই হল শেষ সীমা ও চূড়ান্ত বিন্দু, যা বৃত্ত সম্পূর্ণ করে আমাদের যাত্রাবিন্দুর সঙ্গে মেশে। এখানে ব্যষ্টি হিশেবে লোকেরা ফের হয়ে দাঁড়ায় সমান, কেননা তারা কিছুই না'****। রুসোর এই বক্তব্যে এঙ্গেলস মন্তব্য করেছেন: 'এইভাবে, অসাম্য ফের পরিণত হচ্ছে সাম্যে, কিন্তু সেটা আর সেই পুরনো,

স্বতঃস্ফূর্তভাবে গড়ে ওঠা, মূক, আদিম লোকেদের সাম্য নয়, সামাজিক চুক্তির উচ্চতর একটা সাম্য। উৎপীড়কদের ওপর নামে উৎপীড়ন। এ হল নেতির নেতিকরণ'*।

'অসাম্যের উদ্ভব বিষয়ে বিচার'এ রুসো রাষ্ট্র উদ্ভবের তত্ত্ব বিকশিত করেছেন। ব্যক্তিগত মালিকানার আবির্ভাবের সঙ্গে রাষ্ট্রের উদ্ভবকে সংশ্লিষ্ট করেছেন রুসো, দেখিয়েছেন, ব্যক্তিগত মালিকদের স্বার্থের সঙ্গে রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপের শর্তবদ্ধতা। সেইসঙ্গে রাষ্ট্রের শ্রেণী চরিত্রের বোধ থেকে রুসো অনেক দূরে। যেমন তাঁর পূর্ববর্তীদের কাছে, তেমনি তাঁর কাছেও রাষ্ট্র থেকে যাচ্ছে সাধারণ কল্যাণ সাধনের হাতিয়ার। রাষ্ট্র যে উৎপীড়নমূলক কাজ চালায়, মনীষী সেটাকে দেখেন রাষ্ট্রের সত্যকার কাজ থেকে বিচ্যুতি, ধনীদের চক্রান্তের ফল বলে।

রাষ্ট্র তাঁর আদর্শ অনুসারে কিভাবে সংগঠিত হওয়া উচিত এই প্রশ্নের গবেষণায় তিনি নিবেদন করেছেন তাঁর প্রধান রাজনৈতিক রচনা 'সামাজিক চুক্তি বিষয়ে অথবা রাজনৈতিক অধিকারের নীতি'। 'সামাজিক চুক্তি'তে রুসো তাঁর সামনে কর্তব্য রেখেছেন 'সমিতির এমন রূপের সন্ধান যা সমগ্র সাধারণ শক্তি দিয়ে সমিতির প্রতিটি সদস্যের ব্যক্তিত্ব ও সম্পত্তি রক্ষা করবে ও ঘিরে রাখবে, যার কল্যাণে প্রত্যেকে সকলের সঙ্গে মিলিত হবে, কিন্তু অধীনতা মানবে কেবল নিজের এবং আগের মতোই সমান স্বাধীন থাকবে'**। কেবল এমন সমিতিতেই, মন্তব্য করেছেন মনীষী, আইনসঙ্গত ও সুস্থায়ী শাসন সম্ভব।

শাসন প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না শক্তির ওপর। শক্তি অধিকার গড়তে পারে না, আর মানুষ কেবল আইনসঙ্গত ক্ষমতা মানতে বাধ্য। 'জনতার অধীনতা মানা আর সমাজকে চালনার মধ্যে সর্বদাই বিরাট পার্থক্য থাকবে। যদি একেক জন লোক আলাদা আলাদা ভাবে একের পর এক একই ব্যক্তির বশীভূত হয়, তাহলে তাদের সংখ্যা যতই হোক, আমি এক্ষেত্রে দেখছি কেবল প্রভু ও দাসেদের, জনগণ ও তাদের কোনো প্রধানকে নয়। একে বলা যেতে পারে লোকের ভিড়, সমিতি নয়। এখানে নেই সাধারণ কল্যাণ, নেই রাজনৈতিক 'সংগঠন'।'***

রুসো দেখিয়েছেন যে 'লোকেদের মধ্যে যেকোনো আইনসঙ্গত ক্ষমতার ভিত্তি হতে পারে কেবল চুক্তি'*।

লোকেরা স্বাভাবিক অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার পর চুক্তি সম্পাদন অপরিহার্য। রুসো লিখেছেন: 'আমি মনে করি, লোকে সেই সীমায় পেশছেছে যখন স্বাভাবিক অবস্থায় থাকার প্রতিবন্ধক শক্তি সেই শক্তিকে ছাড়িয়ে গেছে যা ঐ অবস্থায় থাকার জন্য প্রতিটি স্বতন্ত্র ব্যক্তি প্রয়োগ করতে সক্ষম। তখন এই আদি অবস্থাটা চালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়, এবং নিজেদের জীবনযাত্রা না বদলালে মানববংশ ধ্বংস পেত।'**

লোকেরা নিজেদের মধ্যে যে চুক্তিতে আসছে, সেটা সরকার নির্বাচনের চুক্তি নয়। রুসো তীব্র সমালোচনা করেছেন হুগো গ্রটিয়াসের যিনি মনে করতেন যে জনগণ রাজক্ষমতার অধীনতা মেনে নিতে পারে। রুসো লিখছেন: 'গ্রটিয়াসের মতে, জনগণ নাকি অমনি ছিল রাজার অধীন হওয়ার আগেও। কিন্তু এরূপ ক্রিয়া হল একটা নাগরিক বিধান, তাতে ধরে নিতে হয় জনগণ কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত। তাই, যে বিধান দ্বারা জনগণ রাজা নির্বাচন করছে সেটা বিচার করার আগে মন্দ হবে না, যদি বিচার করি সেই বিধানটা যার বলে জনগণ হয় জনগণ, কেননা এই বিধানটা নিশ্চিতই প্রথমটার পূর্ববর্তী এবং সমাজের সত্যকার ভিত্তি।'***

রুসোর মতে, এই বিধানের বিষয়বস্তু কী? মনীষী বলেন যে, মূলত তা পর্যবসিত হয় একটি শর্তে, যথা: 'গোটা গোষ্ঠীর হিতার্থে সমিতির প্রতিটি সদস্যের সমস্ত অধিকার সহ সম্পূর্ণ আত্মবিবিক্তি; কেননা, প্রথমত, প্রত্যেকে যদি পুরোপুরি নিজেকে দিয়ে দেয়, তাহলে যে পরিস্থিতি গড়ে ওঠে সেটা সবার পক্ষে সমান; আর সবার পক্ষেই যখন পরিস্থিতি সমান, তখন অন্যের কাছে সেটা দুর্বহ করে তোলায় কারো আগ্রহ থাকে না।'****

রুসো এই কথায় জোর দিয়েছেন যে আত্মবিবিক্তি হওয়া চাই পরিপূর্ণ, কেননা এক-একজন ব্যক্তির যদি কিছু অধিকার থেকে যায়, তাহলে সমাজের সঙ্গে তাদের বিবাদ মীমাংসা করার মতো উচ্চতম ক্ষমতার অবর্তমানে কতকগুলি প্রশ্নে নিজেই নিজের বিচারক হওয়ায় প্রত্যেকে অন্য

সমস্ত প্রশ্নেও বিচারক হবার দাবি করতে শুরু করত। এতে করে স্বাভাবিক অবস্থা চলতে থাকবে আর সমিতিকে হতে হবে হয় স্বৈরাচারী নয় নিষ্ফল।*

রুসোর এই যুক্তি বিচার করে কিছু কিছু গবেষক মনে করেছেন যে ব্যক্তির অনপসরণীয় স্বাভাবিক অধিকারের যে ধারণাটা ছিল তাঁর সময়ের পক্ষে প্রগতিশীল, রুসো এখানে তার দৃঢ় বিরোধিতা করেছেন।** আমাদের মনে হয় এ কথা ঠিক নয়। সামাজিক চুক্তিতে সবাইকে প্রদত্ত সাধারণ অধিকার নাকচ হয় না। বিশেষত, স্বয়ং রুসোই লিখেছেন যে সার্বভৌম ক্ষমতা যতই নিরঙ্কুশ, পবিত্র ও অলঙ্ঘনীয় হোক না কেন, সাধারণ চুক্তির সীমা তা অতিক্রম করতে পারে না এবং 'এই চুক্তি তাকে তার সম্পত্তি ও স্বাধীনতার যা-কিছু দিয়েছে প্রত্যেকে তার ওপর পুরোপুরি অধিকার খাটাতে পারবে; সুতরাং, প্রজাদের একজনের ওপর অন্যদের চেয়ে বেশি বোঝা চাপাবার অধিকার নেই সার্বভৌমের। কেননা তাদের মধ্যে বিবাদ তখন ব্যক্তিগত চরিত্র পরিগ্রহ করবে, তাই সার্বভৌমের ক্ষমতা এখানে আর বলবৎ নয়।'

সামাজিক চুক্তির ফলে চুক্তিবদ্ধরা হয়ে দাঁড়ায় একক সামাজিক সত্তা। 'চুক্তিবদ্ধ প্রত্যেকের আলাদা আলাদা ব্যক্তিসত্তার বদলে সমিতির এই বিধান তৎক্ষণাৎ সভার যতগুলি ভোট আছে ততগুলি সভ্য নিয়ে একটা নৈতিক ও যূথবদ্ধ সমগ্র গড়ে তুলবে -- এমন সমগ্র যা এই বিধান মারফত পাবে তার ঐক্য, তার সাধারণ অহং, জীবন ও অভিপ্রায়। বাকি সমস্ত ব্যক্তির মিলনে গঠিত এই সামাজিক ব্যক্তিসত্তার নাম আগে ছিল নাগরিক সমাজ, বর্তমানে তাকে বলা হয় প্রজাতন্ত্র কিংবা রাজনৈতিক দেহ, যার সদস্যেরা তার নাম দেয় রাষ্ট্র, যখন তা থাকে নিষ্ক্রিয়, এবং সার্বভৌম, যখন তা সক্রিয়, তার সদৃশদের সঙ্গে তুলনা করে — শক্তি। অংশীদের ক্ষেত্রে যৌথভাবে তারা অভিহিত হয় জনগণ, আর আলাদা আলাদা ভাবে, সার্বভৌম ক্ষমতার অংশী হিশেবে — নাগরিক, রাষ্ট্রীয় আইনের অধীনস্থ হিশেবে — প্রজা।'***

চুক্তি সম্পাদনের ফলে যে নতুন অবস্থা দেখা দিচ্ছে, রুসো তাকে বলেছেন

নাগরিক অবস্থা। স্বাভাবিক অবস্থার প্রতি অনুরাগ থেকে রুসো এক্ষেত্রে সরে গেছেন। 'সামাজিক চুক্তি' গ্রন্থে আমরা পড়ি: মানুষ 'ঐ অবস্থায় প্রকৃতিপ্রদত্ত নানা সুবিধা থেকে বঞ্চিত হলেও সে পুরস্কৃত হয় বেশ গুরুত্বপূর্ণ অন্যান্য সুবিধায়; তার সামর্থ্য পরিশীলিত ও বিকশিত হয়, তার বোধশক্তি প্রসারিত হয়, অনুভূতি হয় উন্নত, তার সমস্ত আত্মা এমন একটা মাত্রা লাভ করে যাতে যে স্তর থেকে সে উঠে এসেছে তার নিম্ন স্তরে নতুন অবস্থার বিভ্রান্তি তাকে ঘন ঘন নিপাতিত না করলে সেই সৌভাগ্যবান মুহূর্তকে তার অবিরাম আশীর্বাদ করা উচিত যা চিরকালের মতো তাকে সেখান থেকে ছিনিয়ে এনে নির্বোধ ও সীমাবদ্ধ একটা জীব থেকে করে তুলেছে বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন প্রাণী — মানুষ।'* রুসোর এই কথাগুলোয় প্রকাশ পেয়েছে সমাজবিকাশের প্রক্রিয়া সম্পর্কে তাঁর সত্যকার মনোভাব। কেবল অনাচারই মানুষকে নামিয়ে দেয় সেই মানেরও নিচে যেখানে সে ছিল স্বাভাবিক অবস্থায়। এই অনাচার দূরীকরণের যে পথ রুসো সন্ধান করেছেন তাঁর 'সামাজিক চুক্তি'তে তা মানুষকে পেঁাছে দিতে পারে নৈতিক পরিপূর্ণতার প্রশস্ত রাজপথে।

নতুন সামাজিক ব্যবস্থার ভিত্তি হওয়া উচিত সত্য করেই সামাজিক চুক্তির রূপায়ণ। রুসো লিখছেন: 'প্রাথমিক চুক্তিতে লোকেদের স্বাভাবিক সমতা আদৌ ক্ষুণ্ণ তো হয়ই না, বরং লোকেদের দৈহিক সত্তায় প্রকৃতি যেসব অসাম্য দিয়েছিল তার স্থানে ব্যক্তি হিশেবে আইনের কাছে তাদের সাম্য স্থাপিত হয়; লোকে শক্তিতে ও সামর্থ্যে অসম হলেও চুক্তির ফলে তারা আইনেও হয়ে দাঁড়াবে সমান।'**

সামাজিক চুক্তির ভিত্তিতে রুসো জনগণের সার্বভৌমত্বের মতবাদ প্রচার করেছেন। তিনি লিখেছেন 'কেবল সাধারণ অভিপ্রায়ই রাষ্ট্র স্থাপনের উদ্দেশ্যে — যা হল সাধারণ কল্যাণ — তার শক্তিকে চালনা করতে পারে।'*** মানুষ হিশেবে প্রতিটি স্বতন্ত্র ব্যক্তির নিজস্ব অভিপ্রায় থাকতে পারে, নাগরিক হিশেবে তার যে সাধারণ অভিপ্রায় আছে, এই নিজস্ব অভিপ্রায় হতে পারে তার বিরোধী অথবা অসদৃশ। তার ব্যক্তিগত স্বার্থ সাধারণ স্বার্থ থেকে ভিন্ন কিছু হতে পারে।

এই অবস্থার দর্ন সকলের অভিপ্রায় আর সাধারণ অভিপ্রায়ের মধ্যে একটা বৃহৎ পার্থক্য দেখা দিতে পারে। তিনি লিখছেন: 'এই দ্বিতীয়টা কেবল সাধারণ স্বার্থ অনুসরণ করে; প্রথমটা — ব্যক্তিগত স্বার্থ এবং তা হল ব্যক্তি বিশেষের যা অভিপ্রায় তার সমষ্টি মাত্র। ব্যক্ত এই অভিপ্রায়গুলি থেকে পরস্পরকে নাকচ করা চরম দিকগুলি বাদ দিন; অবশিষ্ট ভেদগুলি যোগ দিলে পাওয়া যাবে সাধারণ অভিপ্রায়।'*

রুসোর মতে, সার্বভৌমত্ব হল সাধারণ অভিপ্রায়ের রূপায়ণ। এ থেকে দেখা দেয় সার্বভৌমত্বের দুটি গুরুত্বপূর্ণ ধর্ম — তার অবিভাজ্যতা ও অনপসরণীয়তা।

তিনি লিখেছেন: 'আমি বলছি, যে সার্বভৌমত্ব হল কেবল সাধারণ অভিপ্রায়ের রূপায়ণ, তা কখনো হস্তান্তরিত হতে পারে না এবং যে সার্বভৌম যৌথ সত্তা ছাড়া আর কিছু নয়, তা নিজেই নিজের প্রতিনিধি। হস্তান্তরিত হতে পারে ক্ষমতা, কিন্তু অভিপ্রায় কোনোক্রমেই নয়।'**

সার্বভৌমত্ব হস্তান্তরিত হতে পারে না, এই নীতি থেকে রুসো প্রতিনিধিত্বমূলক শাসনব্যবস্থায় আপত্তি করেছেন। তিনি বলেছেন, সার্বভৌমত্ব নিহিত একমাত্র সাধারণ অভিপ্রায়ে, যার প্রতিনিধিত্ব চলে না। লোকসভা সদস্যরা জনগণের প্রতিনিধি হতে পারে না, তারা কেবল তার কমিসার, যারা 'চূড়ান্তরূপে কিছু স্থির করতে পারে না'। জনগণ নিজেরা সরাসরি যদি প্রবর্তিত না করে, তাহলে কোনো আইন বলবৎ নয়, আদপেই ওটা আইন নয়।'***

'সামাজিক চুক্তি'তে সমান সোজাসাপটায় সার্বভৌমত্বের অবিভাজ্যতার নীতি সমর্থন করা হয়েছে। রুসো লিখছেন: 'সার্বভৌমত্ব যে কারণে হস্তান্তরিত হতে পারে না, সেই একই কারণে তা অবিভাজ্যও, কেননা অভিপ্রায় হতে পারে হয় সাধারণ, নয় তা নেই; তা হল হয় সমগ্র জনগণের অভিপ্রায়, নয় তার একাংশের। প্রথম ক্ষেত্রে এই ঘোষিত অভিপ্রায় হল সার্বভৌমত্বের অনুষ্ঠান এবং তা আইন গড়ে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে এটা ব্যক্তিগত

অভিপ্রায় বা ম্যাজিস্ট্রেটের ফরমান; বড়ো জোর, এটা একটা ডিক্রি।'* সেই কারণে রুসো তীব্রোক্তি করেছেন ক্ষমতা বিভাগ তত্ত্বের পক্ষপাতীদের সম্পর্কে। তাঁর মতে, 'সার্বভৌমকে তারা পরিণত করছে কী একটা কাল্পনিক জীবে, যা গঠিত নানান জায়গা থেকে নেয়া অংশ দিয়ে।'** ক্ষমতা বিভাগ তত্ত্বের বিরুদ্ধে মনীষীর তীব্র আক্রমণটা আসছে তাঁর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির সমগ্র মর্মার্থ থেকেই। আঠারো শতকে ক্ষমতা বিভাগের তত্ত্ব ছিল অভিজাত ও বুর্জোয়া শ্রেণীর মধ্যে আপোসরফার ভাবাদর্শীয় সমর্থন। জনাধিকারের যুক্তিসঙ্গত পক্ষপাতী রুসো স্বভাবতই সর্ববিধ আপোসের বিরোধী।

সার্বভৌমত্ব প্রকাশ পায় আইনপ্রণয়নে। 'আইনপ্রণয়নী ছাড়া সার্বভৌমের অন্য কোনো ক্ষমতা নেই,' লিখেছেন রুসো।***

আইনের অর্থ নির্দিষ্ট করতে গিয়ে রুসো সর্বাগ্রে এই কথায় জোর দিয়েছেন যে তা হল সাধারণ অভিপ্রায়ের ফল। তিনি ঘোষণা করেছেন, 'তিনি যেই হোন, কোনো একজন লোকের অনুজ্ঞাকে আইন বলা যায় না।'**** তবে উদ্ঘাটিত সংজ্ঞাই যথেষ্ট নয়। 'সাধারণ অভিপ্রায়কে যদি তাই হতে হয়, তাহলে নিজের বিষয়ের দিক থেকে এবং নিজের মর্মার্থের দিক থেকেও তাকে হতে হবে সাধারণ, সবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে হলে তাকে আসতে হবে সবার কাছ থেকেই, যখন কোনো একটা নির্দিষ্ট ও স্বতন্ত্র বিষয়ের দিকে তা চালিত হয়, তখন তার স্বাভাবিক ঔচিত্য খোয়া যায়।'*****

রাষ্ট্রে আইনপ্রণয়নী ক্ষমতার সঙ্গে সঙ্গে থাকা উচিত কার্যনির্বাহী ক্ষমতা। রুসো বলতে চান যে আইনদাতা বা সার্বভৌম হিশেবে গোটা সমাজের হাতে কার্যনির্বাহী ক্ষমতা থাকতে পারে না, কেননা তা প্রকাশ পায় কেবল ব্যক্তিগত দলিলাদিতে, যা আইন নয়, সুতরাং, তা সার্বভৌমের ক্রিয়াক্ষেত্রের মধ্যে পড়ে না, সার্বভৌমের সমস্ত দলিলই হতে পারবে কেবল আইনকানুন।

রুসোর মতে, কার্যনির্বাহী ক্ষমতা থাকা উচিত সরকারের হাতে, আর সরকার বলতে বোঝা হচ্ছে 'সার্বভৌম ও প্রজাদের মধ্যে আদানপ্রদানের জন্য স্থাপিত মধ্যস্থতার সংস্থা, আইন পালনের ব্যবস্থা করা এবং যেমন

নাগরিক, তেমনি রাজনৈতিক স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যা ক্ষমতাপ্রাপ্ত'*। 'সামাজিক চুক্তি'র রচক বিশেষ করে জোর দিয়েছেন এই কথায় যে সার্বভৌমের সঙ্গে সরকারকে কোনোক্রমেই গুলিয়ে ফেলা চলবে না, সরকার শুধু প্রথমের ইচ্ছা পালন করে।

সরকার গঠিত হতে পারে নানাভাবে। তিন ধরনের সরকারের মধ্যে পার্থক্য করেছেন রুসো — গণতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র, রাজতন্ত্র।

এই রূপগুলির প্রত্যেকটি সম্পর্কে রুসোর ভাবনার ওপর মন্তব্য করার আগে তাঁর পরিভাষার বৈশিষ্ট্য বিষয়ে কিছু কথা বলা দরকার। 'সামাজিক চুক্তি'তে দুই ধরনের রাষ্ট্রের মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছে: প্রজাতন্ত্র, অর্থাৎ আইনশাসিত রাষ্ট্র (ধরে নেয়া হচ্ছে যে আইন হল সাধারণ অভিপ্রায়ের ফল) আর স্বৈরতন্ত্র, অর্থাৎ আইনের ঊর্ধ্বে অবস্থিত স্বৈর প্রভু শাসিত রাষ্ট্র। এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে স্বৈরতন্ত্র অধঃপতিত রাষ্ট্র। আর 'গণতন্ত্র', 'অভিজাততন্ত্র', 'রাজতন্ত্র' কথাগুলো ধরলে 'সামাজিক চুক্তি'তে তা শাসনের রূপ বর্ণনায় প্রযুক্ত হয় নি, ব্যবহৃত হয়েছে কেবল সরকারের বৈশিষ্ট্য বর্ণনায়। গণতান্ত্রিক সরকার গঠিত হয় সমস্ত নাগরিকদের নিয়ে, অভিজাততান্ত্রিক — অল্পসংখ্যক নাগরিক আর রাজতন্ত্র — একজন ব্যক্তিকে নিয়ে।

'গণতন্ত্রকে' এই সংকীর্ণ অর্থে ধরে রুসো সোজাসুজি গণতান্ত্রিক সরকারের বিরোধিতা করেছেন। তিনি মন্তব্য করেছেন যে এরূপ সরকারের রাষ্ট্রে সার্বভৌম আর সরকার বিভক্ত নয়। রুসো বলতে চান, কার্যত এরূপ রাষ্ট্রে সরকার নেই। রুসো বলে যাচ্ছেন: 'শব্দটাকে যদি তার যথার্থ অর্থে ধরি, তাহলে সত্যকার গণতন্ত্র কখনো ছিল না, কখনো থাকবেও না'**। তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গির সমর্থনে নাগরিকদের সাধারণ সভায় সমস্ত, এমনকি সবচেয়ে ছোটোখাটো রাষ্ট্রীয় ব্যাপারেও সিদ্ধান্ত গ্রহণ কী মুশকিলের সঙ্গে জড়িত তার উল্লেখ করেছেন তিনি।

আর অভিজাততান্ত্রিক ও রাজতান্ত্রিক সরকারের কথা ধরলে, সবচেয়ে সার্থক নির্বাচন, 'সামাজিক চুক্তি'র রচয়িতার মতে, নির্ভর করে একসারি কারিকার ওপর। এক রাষ্ট্রকে প্রথমটা মানায়, অন্য রাষ্ট্রকে দ্বিতীয়টা। শুধু একটা জিনিস গুরুত্বপূর্ণ: সরকারকে কাজ করতে হবে অধিকাংশের স্বার্থে,

তাদের নিজেদের স্বার্থে নয়। নীতির দিক থেকে সেটা সহজে সাধিত হতে পারে অভিজাততন্ত্রে। রাজতান্ত্রিক ধরনের সরকারে ব্যক্তিগত অভিপ্রায় আধিপত্য করে অন্য সমস্ত অভিপ্রায়ের ওপর, তাই প্রজাতন্ত্রের পক্ষে (রুসো যে অর্থে শব্দটা ব্যবহার করেছেন) স্বৈরতন্ত্রে পরিণত হওয়া খুবই সম্ভব।

'সামাজিক চুক্তি'তে বেশ বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে জনগণের সার্বভৌমত্ব কার্যকৃত করার উপায়ের প্রশ্ন। রুসো এই কথায় জোর দিয়েছেন যে 'সার্বভৌম কেবল তখনই কাজ করতে পারে, জনগণ যখন সভায় সমবেত।'*

রুসোর মতে, জনগণ সমবেত হয়ে বরাবরের জন্য রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রবর্তন করল, বিধানাবলি অনুমোদন করল, এইটুকুই যথেষ্ট নয়; জনগণ স্থায়ী সরকার গঠন করল অথবা বরাবরের জন্য পদাধিকারীদের বেছে দিল, তাও যথেষ্ট নয়। অপ্রত্যাশিত অবস্থার কারণে ডাকা জরুরি সমাবেশ ছাড়াও কিছু কাল অন্তর অন্তর নিয়মিত সমাবেশও প্রয়োজন। কিছুই এই শেষোক্ত সভাগুলিকে নাকচ করতে, বা স্থগিত রাখতে পারবে না; কোনোরকম আনুষ্ঠানিক আহ্বানের প্রয়োজনীয়তা ছাড়াই নির্দিষ্ট একটা দিনে আইন অনুসারে জনগণকে সমবেত হতে হবে।

সার্বভৌম সংস্থা হিশেবে জনগণ সমবেত হওয়া মাত্র সরকারের সমস্ত এক্তিয়ারের অবসান হবে। সরকার কর্তৃক সার্বভৌম ক্ষমতার জবরদখল বন্ধ করার উদ্দেশ্যে জন সমাবেশ শুরু করবে দুটি প্রশ্নে ভোট দিয়ে: 'সরকারের বিদ্যমান রূপ বজায় রাখা কি সার্বভৌমের পক্ষে সুবিধাজনক?' এবং 'বর্তমানে যাদের হাতে শাসনভার আছে তাদের হাতেই তা রেখে দেয়া কি জনগণের পক্ষে সুবিধাজনক?'**

সামাজিক চুক্তি ও জনগণের সার্বভৌমত্ব বিষয়ে রুসোর মতবাদ বৈপ্লবিক প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ। রুসো উল্লেখ করেছেন যে নাগরিকদের সভার পক্ষে 'এমনকি সামাজিক চুক্তি সমেত রাষ্ট্রের এমন কোনো মৌলিক আইন নেই, যা নাকচ করা যাবে না'***। 'সামাজিক চুক্তি' গ্রন্থে 'সরকারের অনাচার ও অধঃপতনের দিকে তার প্রবণতা প্রসঙ্গে' নামক বিশেষ এক অধ্যায়ে রুসো

এই কথায় জোর দিয়েছেন যে 'সরকার যে মুহূর্তে সার্বভৌমত্ব বেদখল করে, তখনই সামাজিক চুক্তি বাতিল হয়, সমস্ত সাধারণ নাগরিক সঙ্গত অধিকারেই ফিরে যায় নিজেদের স্বাভাবিক স্বাধীনতায়, অধীনতা স্বীকারে তারা বাধ্য হতে পারে, কিন্তু সেটা তাদের কর্তব্য নয়।'*

রুসোর রাজনৈতিক আদর্শ ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত তাঁর সামাজিক আদর্শের সঙ্গে। ক্ষুদ্র উৎপাদকদের স্বার্থ প্রতিফলিত করে তিনি সমমাত্রিক বণ্টনের দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেন। যেখানে সম্পত্তির একটা নির্দিষ্ট সমতা বিদ্যমান, কেবল সেখানেই সাধারণ অভিপ্রায় গড়ে ওঠা সম্ভব। স্বাধীনতা হতে পারে না সমতা ছাড়া, সুতরাং 'কোনো নাগরিকের এতটা প্রাচুর্যের অধিকারী হওয়া উচিত নয়, যাতে সে অন্যকে কিনতে পারে এবং একজনেরও হওয়া উচিত নয় এতটা গরিব, যাতে সে নিজেকে বিক্রয়ে বাধ্য হয়: এতে ধরে নেয়া হচ্ছে সম্ভ্রান্ত ও ধনীদের ক্ষেত্রে তাদের সম্পত্তি ও প্রতিপত্তির সীমিতকরণ।'**

সর্ববিধ দেশের পক্ষে প্রযোজ্য সম্পত্তি বিষয়ে এমন আইনের প্রস্তাব দেন নি রুসো, কেননা, তাঁর মতে, স্থানীয় পরিস্থিতি ও অধিবাসীদের বৈশিষ্ট্য অনুসারে আইন রূপান্তরিত হওয়া উচিত। তবে নির্দিষ্ট এক-একটা দেশের ক্ষেত্রে এমন আইনের বিষয়বস্তু সম্পর্কে তিনি বেশ বিশদ সুপারিশ করেছেন। যেমন, কর্সিকার জন্য সংবিধানের খসড়ায় তিনি লিখেছেন: 'সংক্ষেপে বলতে গেলে, আমি চাই রাষ্ট্রের মালিকানা যেন হয় সর্বোচ্চ মাত্রায় বিপুল ও প্রবল আর নাগরিকদের সম্পত্তি যতটা সম্ভব ক্ষুদ্র ও নগণ্য'***।

সমমাত্রিক বণ্টনের আদর্শ প্রচারের সময় রুসো সুস্পষ্ট জানতেন যে তা বৃহৎ বুর্জোয়া ও অভিজাত সম্প্রদায়ের সমর্থন পাবে না। রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান বিষয়ে অসমাপ্ত গ্রন্থে তিনি লেখেন যে ধনীরা এবং যারা নিজেদের অবস্থায় তুষ্ট তাদের সবার স্বার্থ এই যে সবকিছু যেন বর্তমান অবস্থায় থাকে, যেক্ষেত্রে হতভাগ্যেরা লাভবান হতে পারে বিপ্লব থেকে'****।

রুসোর ভাবনায় খুবই প্রভাবিত হয় জ্যাকোবিনদের দৃষ্টিভঙ্গি। কনভেণ্টে বক্তৃতায় রবেস্পিয়ার বলেন, রুসো 'আমাদের বিপ্লবের উদ্‌গাতা'*। রুসোর রাজনৈতিক মতবাদের অনেক বিষয় প্রতিফলিত হয়েছে ১৭৯৩ সালের ফরাসি সংবিধানে। এ সংবিধান ঘোষণা করে জনগণের সার্বভৌমত্বের নীতি। আইন হল সাধারণ অভিপ্রায়ের স্বাধীন ও সুগম্ভীর অভিব্যক্তি, এই সংজ্ঞা দিয়ে সংবিধানের ১০ ধারা বলেছে: 'জনগণ আইন আলোচনা ও জারি করে'। বিদ্যমান জনপ্রতিনিধিত্বের সঙ্গে এই ধারাটা মেলাবার উদ্দেশ্যে সংবিধানে ধরে নেয়া হয়েছে যে বিধানপ্রণয়নী কক্ষ থেকে প্রস্তাবিত আইনের বিরুদ্ধে যদি অর্ধেকের একটি বেশি ডিপার্ট-মেণ্টে ক্যাণ্টনে ক্যাণ্টনে সমবেত প্রাথমিক সভাগুলির একদশমাংশ যদি মত প্রকাশ করে, তাহলে বিধানপ্রণয়নী কক্ষ থেকে প্রস্তাবিত আইনের ওপর ভোটাভুটি স্থানান্তরিত হবে প্রাথমিক সভাগুলিতে (৫৯-৬০ ধারা)।

মুক্তি কার্যকর করতে একমাত্র রাজনৈতিক সমতাই যথেষ্ট নয়, রুসোর এই ধারণাও সমর্থন করে জ্যাকোবিনরা। এঙ্গেলস লিখেছেন যে সমতার দাবি পালন করেছে 'বিশেষ করে রুসোর কল্যাণে নির্দিষ্ট একটা তাত্ত্বিক ভূমিকা এবং মহান বিপ্লবের সময়ে ও তার পরে — ব্যবহারিক-রাজনৈতিক ভূমিকা এবং... এখনো প্রায় সমস্ত দেশের সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে পালন করছে রীতিমতো প্রচারমূলক ভূমিকা'**।

ক্ষমতায় এসে বুর্জোয়ারা জনগণের সার্বভৌমত্বের তত্ত্ব অতি শীঘ্রই অস্বীকার করে। রুসোর দৃষ্টিভঙ্গি অধিপতি বুর্জোয়া শ্রেণীর কাছে বড়ো বেশি র‍্যাডিকেল মনে হয়েছিল। সার্বভৌমত্বের র‍্যাডিকেল তত্ত্বের স্থান নেয় উদারনৈতিক তত্ত্ব। বিশিষ্ট ইতালীয় সংবিধানবিদ ভ. অর্লান্দো লিখেছেন: 'জনগণের সার্বভৌমত্ব কথাটির জায়গায় জাতীয় সার্বভৌমত্ব কথাটি বসিয়ে এ তত্ত্ব দাবি করে যে এই সার্বভৌমত্ব সত্যিই জনগণেরই হাতে থাকছে, তবে জনগণকে বোঝা হয়েছে একটা ব্যবহারশাস্ত্রীয় সংগঠন হিশেবে।'***

সাংবিধানিক আইনের বুর্জোয়া তত্ত্বে উল্লেখ করা হচ্ছে যে 'যদি জনগণের সার্বভৌমত্ব নয়, জাতীয় সার্বভৌমত্ব থেকে এগুতে হয় তাহলে

মেনে নেয়া আবশ্যক যে 'নির্দিষ্ট মুহূর্তে অধিকাংশ যা প্রকাশ করে, প্রত্যেকটি গুরুতর সিদ্ধান্ত দাবি করে তার চেয়ে অনেক গভীর ও সুচিন্তিত সম্মতি'*। ১৯৪৬ সালে ফ্রান্সের সংবিধান সভায় এমন কথা শোনা গিয়েছিল যে জনগণের সার্বভৌমত্বের নীতি নাকি 'নৈরাজ্যবাদী ও বিপজ্জনক**, তাহলেও ব্যাপক জনসাধারণের দাবিতে ১৯৪৬ সালে ফ্রান্সের সংবিধানে জনগণের সার্বভৌমত্বের নীতিই গৃহীত হয়। ১৯৪৬ সালের গণতান্ত্রিক সংবিধানের স্থলে ১৯৫৮ সালে যে নতুন সংবিধান গৃহীত হয়, তাতেও ফরাসি বুর্জোয়ারা এ নীতি বজায় রাখতে বাধ্য হয়। ফ্রান্সে জনগণের সার্বভৌমত্বের নীতি নিয়ে যে সংগ্রাম চলেছে তা এই সাক্ষ্য দেয় যে রুসোর ভাবধারা আজো বেঁচে আছে এবং রাজনৈতিক সংগ্রামে তা কাজে লাগছে।



§ ১০। **টমাস জেফারসন**

টমাস জেফারসন (১৭৪৩-১৮২৬) অতীতের সেই মনীষীদের অন্যতম, রাজনৈতিক মতবাদের ইতিহাসে ও আধুনিক কালে যাঁদের অবিচল তাৎপর্যের কারণ নিহিত তাঁদের বৈজ্ঞানিক-তাত্ত্বিক সিদ্ধান্তগুলির প্রত্যক্ষ ব্যবহারিক অভিমুখে। জেফারসন হলেন আমেরিকান গণতান্ত্রিকতার ক্ল্যাসিক। ইতিহাসে তিনি স্থান নিয়েছেন আঠারো শতকের আমেরিকান বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব আর স্বাধীনতা যুদ্ধের তত্ত্বকার ও অন্যতম নেতা হিশেবে, আমেরিকান রাষ্ট্রপাট গঠনের সক্রিয় অংশী হিশেবে, যা কোনো গুরুত্বপূর্ণ আনুষ্ঠানিক রাষ্ট্রিক-আইনী রূপের পরিবর্তন ছাড়াই আজ দুই শতাধিক ধরে বিদ্যমান; টমাস পেইনের সঙ্গে একত্রে তিনি হয়ে

দাঁড়ান 'আমেরিকান আদর্শের' গণতান্ত্রিক ধারার প্রবর্তক, যে 'আদর্শ' নিয়ে বর্তমানের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রচণ্ড বিতর্ক চলেছে। জেফারসনের ভাবধারার একটা স্বকীয় সমকালীনতা আছে। এটা জড়িত আমেরিকান বুর্জোয়া রাষ্ট্রপাটের বিকাশের বৈশিষ্ট্য ও ভাবাদর্শীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে।

আমেরিকান বুর্জোয়া সাহিত্যে এইরকম একটা অভিমত প্রচলিত যে জেফারসন হলেন লকের উদারনৈতিক মতবাদের ভাষ্যকার। তবে লকের মত-বাদের রক্ষণশীল দিকগুলির যে সমালোচনা জেফারসন করেছেন, তাতে এ অভিমত টেঁকে না। 'সীমিত শাসনের' যে উদারনৈতিক ধারণাকে মালিকানার অধিকারের অনুকূলে ব্যাখ্যা করা হয়, জেফারসন তাঁর মতবাদে এ সীমা অতিক্রম করে তাকে বিকশিত করেছেন গণতান্ত্রিক ধারায়। এটা উল্লেখযোগ্য, স্বাধীনতার যে ঘোষণার প্রধান রচয়িতা ছিলেন জেফারসন, তাতে 'জীবন, মুক্তি ও সম্পত্তিতে' মানুষের অলঙ্ঘনীয় স্বাভাবিক অধিকারের যে সূত্র লক দিয়েছিলেন তার শেষ অংশটার স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে 'সুখের আকাঙ্ক্ষা'। জেফারসনের সময় থেকে 'শাসিতদের ইচ্ছা অনুসারে শাসন', 'জনগণের শাসন', প্রতিটি নাগরিকের মুক্তি ও সমতা বিষয়ে তাঁর ধারণা অন্যান্য দেশেও বুর্জোয়া গণতন্ত্রের বিকাশকে প্রভাবিত করেছে। মার্কস যাকে বলেছেন মানবাধিকারের প্রথম ঘোষণা,* স্বাধীনতার সেই ঘোষণায় বলা হয়েছে 'সমস্ত লোকে সমান হয়ে সৃষ্ট'। ঘোষণায় মানুষের অলঙ্ঘনীয় অধিকার বলে ধরা হয়েছে 'জীবন, মুক্তি ও সুখের আকাঙ্ক্ষার' অধিকার। এই অধিকারগুলি নিশ্চিত করার জন্যও সরকার গঠিত; এই সব সরকারের সত্যকার ক্ষমতা আসে 'শাসিতদের সম্মতি' থেকে। শাসনের কোনো রূপ যদি এই লক্ষ্যগুলির বিরুদ্ধে যায়, তাহলে সে রূপকে 'পরিবর্তন অথবা ধ্বংস করার অধিকার আছে জনগণের'; 'জনগণ যখন স্বৈরতন্ত্রের সঙ্গে সংঘাতে আসে, তখন তেমন সরকারকে উচ্ছেদ করার অধিকার রাখে জনগণ এবং সেটা তাদের কর্তব্য'**। স্বাধীনতা যুদ্ধে বিজয়ের পর স্থায়ী সাংবিধানিক-আইনী কাঠামো গঠনের পর্বে জেফারসন ছিলেন পুরনো রাষ্ট্রিক প্রতিষ্ঠানের সুসঙ্গত গণতন্ত্রীকরণ ও নতুন প্রতিষ্ঠান গঠনের পক্ষপাতীদের নেতৃত্বে।

নরমপন্থী ও দক্ষিণপন্থী রক্ষণশীল-ফেডারেলিস্টরা তখন ক্ষমতায় পাকা হয়ে বসছিল। তাঁদের বিশিষ্ট ভাবাদর্শী ছিলেন জ. অ্যাডামস ও আ. হ্যামিল্টন। তাঁদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে জেফারসন গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সমস্যাদি ব্যাখ্যা করেন বৈপ্লবিক-গণতান্ত্রিক অবস্থান থেকে, সেগুলিকে সমৃদ্ধ করেন সুগভীর তাত্ত্বিক চিন্তায়।

আঠারো শতকের শেষে আমেরিকান বিপ্লব শুধু বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক নয়, ঔপনিবেশিকতা-বিরোধী বিপ্লবও ছিল। স্বাধীনতা যুদ্ধের পরিণামে যখন ক্ষমতায় এল জাতীয় বুর্জোয়া, বৃহৎ সম্পত্তিমালিকদের প্রতিনিধিত্বকারী তাদের দক্ষিণ অংশে প্রাধান্য ছিল নরমপন্থী রক্ষণশীলদের; চূড়ান্ত দক্ষিণপন্থী রাজতান্ত্রিক লোকেরা হটে গিয়েছিল। অন্য দিকে, ছোটো খামারীদের ওপর নির্ভর করে জাতীয় বুর্জোয়ার বামপন্থী অংশও বেশ প্রভাব অর্জন করে যেটা অন্যান্য দেশের বুর্জোয়া বিপ্লবে দেখা যায় নি। আমেরিকান মার্কসবাদী ঐতিহাসিক উই. জ. ফস্টার দেখিয়েছেন যে আমেরিকান বিপ্লব ছিল এমন বুর্জোয়া বিপ্লব যাতে গণতান্ত্রিক উপাদান ছিল প্রবল। ছোটো খামারীরা জনসাধারণের অধিকাংশ হওয়ায় বিপ্লবের গতিপথে নির্ধারক প্রভাব ফেলতে পারে।

গণতান্ত্রিক শক্তির রাজনৈতিক প্রভাব বৃদ্ধির আরো একটা কারণ ছিল এই যে আমেরিকায় সামন্ত শ্রেণী এবং উল্লেখযোগ্য সামন্ততান্ত্রিক জের ছিল না। ১৮০১ সালে জেফারসনের দল এমনকি ক্ষমতাতেই এল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের আপোসমূলক চরিত্র ছিল স্বকীয় ধরনের, এটা ছিল একদিকে বৃহৎ বুর্জোয়া ও আবাদ-মালিক, অন্যদিকে ছোটো ও মাঝারি বুর্জোয়ার মধ্যে আপোস। এই শেষোক্তরা গৌণ স্থানে অপসারিত হয় নি, যা ঘটেছিল, দৃষ্টান্তস্বরূপ, ইংলন্ডে, বরং শ্রেণীগত রফার সমাধিকারী শরিক হিশেবে এগিয়ে আসে। এর ফলে বৃহৎ সম্পত্তিধরেরাই প্রধানত নতুন রাষ্ট্রপাট গঠন করলেও তাতে পেটি বুর্জোয়ার গণতান্ত্রিক স্বার্থও বিবেচিত হয়েছিল।

মার্কিন রাষ্ট্রপাটের স্বকীয় ধরনের সামাজিক-রাজনৈতিক ভিত্তি এ রাষ্ট্রের উদয়লগ্নেই যে রাজনৈতিক-ভাবাদর্শীয় ফলাফল সূচিত করে তা অতি সুস্পষ্ট রূপে ফুটে উঠেছে আমেরিকান বুর্জোয়া গণতন্ত্রের সংকটের বর্তমান পর্যায়ে।

প্রথমত, আঠারো শতকের শেষ দিককার যে বুর্জোয়া ও পেটি-বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক আদর্শের ক্ল্যাসিকাল সূত্রায়ণ করেন জেফারসন ও পেইন, তাতে

বৈপ্লবিক আবেগ কম নেই, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসের ২০০ বছর ধরে তা ক্রমাগত ব্যবহার করেছে সেখানকার প্রগতিশীল শক্তিরা। আমেরিকান বিপ্লবকালীন যে উচ্চ আদর্শের প্রবক্তা ছিলেন জেফারসন, তা প্রথমে দাসপ্রথার বিরুদ্ধে, পরে পুঁজিতান্ত্রিক একচেটিয়া ও রাষ্ট্রীয়-একচেটিয়া ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রলেতারীয় সমেত অগ্রণী স্তরগুলির সংগ্রামে ভাবাদর্শীয় ও তাত্ত্বিক অস্ত্রের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে।

দ্বিতীয়ত, আমেরিকান রাষ্ট্রপাটের আদি পর্যায়ের বৈশিষ্ট্যের ফলে এটাও নির্ধারিত হয়ে যায় যে গণতান্ত্রিক শব্দাবলি শুধু সঙ্গতিপরায়ণ বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক শক্তির ভান্ডারেই স্থান পায় নি। উদারনৈতিক ও নরমপন্থী-রক্ষণশীল কর্মকর্তারাও জনগণকে স্বপক্ষে টানার জন্য গণতান্ত্রিক বুলি ব্যবহার করেছে ব্যাপকভাবে।

মার্কিন রাষ্ট্রপাট গড়ে ওঠার বিশেষ পরিস্থিতিতে জেফারসনের প্রগতিশীল বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি কেবল আধাপ্রলেতারীয় ও পেটি-বুর্জোয়া স্তরের স্বার্থই নয়, মাঝারি বুর্জোয়ার প্রভাবশীল স্তরেরও স্বার্থানুসারী, যারা প্রকৃতিগতভাবেই গণতান্ত্রিক নয়, উদারনৈতিক রাজনীতির সামাজিক অবলম্বন, বৃহৎ সম্পত্তির স্বার্থের সঙ্গে আপোস যার ভিত্তি। আমেরিকান রাষ্ট্রপাটের অন্যতম স্রষ্টা জেফারসনের ধ্যানধারণা শাসক বুর্জোয়ার উদারনৈতিক অংশটা গ্রহণ করে, তবে র‍্যাডিকেল-গণতান্ত্রিক সারাংশটা বাদ দিয়ে। গণতান্ত্রিক শব্দাবলির ভেলকি দিয়ে বুর্জোয়া উদারনৈতিকতা প্রভুত্বকারী রাজনৈতিক-ভাবাদর্শীয় ধারা হয়ে উঠতে পারে।

এটাও উল্লেখ করা উচিত যে জেফারসনের গণতান্ত্রিকতার ছিল ঐতিহাসিক কারণে সীমাবদ্ধ পেটি-বুর্জোয়া চরিত্র। এর ফলে বুর্জোয়া প্রজাতান্ত্রিকতার নীতি স্বীকৃতির সাধারণ ভিত্তিতে বুর্জোয়ার বিভিন্ন স্তরের মধ্যে আপোসের সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়। বুর্জোয়ার দক্ষিণ অংশের তীব্র সমালোচনা করার সঙ্গে সঙ্গে প্রজাতান্ত্রিক নীতির ভিত্তিতে সংযুক্ত সরকার গঠনের জন্য যাদের তিনি মনে করতেন 'ফেডারেলিস্টদের মধ্যে প্রজাতান্ত্রিক' তাদের সমর্থন লাভের চেষ্টা করেন।

সাধারণভাবেই রাজনৈতিক জ্ঞানের এবং বুর্জোয়া গণতন্ত্রের তত্ত্বে তাঁর যা অবদান, তাঁর রাজনৈতিক মতবাদের সেই মূল প্রতিপাদনগুলি বিচার করা যাক। জেফারসন তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলেন রক্ষণশীল রাজনৈতিক দর্শন ও নিয়মতান্ত্রিক কর্মসূচির বিরুদ্ধে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এবং

আগে যা বলা হয়েছে, জেফারসনের রাজনৈতিক সমস্যার উপস্থাপন আজকের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষেও প্রাসঙ্গিক। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির এক-একটা উপাদান যথোচিত ব্যাখ্যা সহ র‍্যাডিকেল গণতান্ত্রিক বিরোধী পক্ষ, নয়া-উদারনৈতিক দল, এমনকি নয়া-রক্ষণশীল দলের বর্তমান ভাবাদর্শে পরিলক্ষিত হচ্ছে। এক্ষেত্রে আঠারো শতকের শেষে প্রযুক্ত জেফারসনের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির মূর্ত-নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক অর্থ, আমেরিকান ভাবাদর্শীয় ঐতিহ্যে তার প্রতিসরণ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাম্প্রতিক ভাবাদর্শীয় বিতর্কে বিভিন্ন রাজনৈতিক শক্তি কর্তৃক সে ঐতিহ্য ব্যবহারের পদ্ধতির তুলনা করা আবশ্যক।

জেফারসনের রাজনৈতিক মতবাদের কেন্দ্রীয় একটা প্রশ্ন হল রাষ্ট্রক্ষমতার গণতান্ত্রিক সংগঠন ও ব্যক্তির অধিকারের সমস্যা।

তাঁর মতে, রাষ্ট্রক্ষমতার কাজ হল মানুষের সেইসব স্বাভাবিক অধিকার রক্ষা যা সে নিজে রক্ষা করতে পারে না। নাগরিক অধিকারের মধ্যে জেফারসন অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন রাজনৈতিক অধিকারকে, যা তাঁর মতে, 'মুক্ত শাসনের বনিয়াদ'। উল্লেখ করা গুরুত্বপূর্ণ যে সম্পত্তির অধিকারকে তিনি স্বাভাবিক অধিকারের কোঠায় ফেলেন নি, 'রাষ্ট্রীয় সংগঠনে' যোগ দেবার পরেও যা অক্ষুণ্ণ থাকে, ফেলেছেন নাগরিক অধিকারের কোঠায় যা পরিবর্তিত হতে পারে। তাঁর নিজ ভার্জিনিয়া স্টেটে ভূমিস্বত্বে মেয়রেটের— সামন্ততান্ত্রিক উপাদান উচ্ছেদের আইন পাশ জেফারসনের কীর্তি। দাসেদের ওপর মালিকানার বিরুদ্ধে জেফারসনের সংগ্রামের কথা তো সুবিদিত। ব্যক্তির অধিকার আর সম্পত্তির অধিকারের মধ্যে সম্পর্ক ব্যাখ্যায় জেফারসন প্রথমটাকেই কাম্য মনে করেছিলেন, যদিও সম্পত্তির অধিকারও স্বীকার করেছিলেন। জেফারসন পরিষ্কার দেখতে পেয়েছিলেন 'নৈতিক' প্রাণী হিশেবে মানুষের অধিকার আর সম্পত্তির অধিকারের মধ্যে বৈপরীত্যের সম্ভাবনা এবং এই সমস্যা সমাধানেই প্রকাশ পেয়েছে তাঁর গণতান্ত্রিকতা।

জেফারসনের দৃষ্টিভঙ্গির চরিত্র ছিল মানবিক এবং আঠারো শতকের নৈতিক বর্গগুলি থেকেই তার উদ্ভব। সমগ্র সমাজের কল্যাণ আর ব্যক্তির সচ্ছলতাকে তিনি পরস্পরের বিপরীতে দাঁড় করান নি। প্রতিটি ব্যক্তির মুক্তি ছাড়া সমাজ মুক্ত হতে পারে না। রাষ্ট্রের সমক্ষে ব্যক্তির অলঙ্ঘ্য অধিকারের ভাবনাকে জেফারসন মিলিয়েছেন স্বশাসন ও জনগণের সার্বভৌমত্বের যৌথবাদী দর্শনের সঙ্গে। তিনি মনে করতেন, জনগণের কর্ম হল রাজনৈতিক ন্যায় ও রাষ্ট্রক্ষমতার স্বেচ্ছাচার থেকে আত্মরক্ষার

মূর্তায়ন। 'আমাদের শাসনের ভিত্তি হল জনগণের অভিমত। জনগণের ভুলভ্রান্তির প্রতি বড়ো বেশি কঠোর হবেন না, শিক্ষাদান মারফত তাদের সুসভ্য করে তুলুন।'*

মনে রাখা উচিত যে আলোচ্য যুগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রক্ষণশীলতা, উদারনৈতিকতা ও গণতান্ত্রিকতার ক্ল্যাসিকাল রাজনৈতিক সীমাভেদ সবে দানা বেঁধে উঠেছে। বিপ্লবোত্তর যে গণতান্ত্রিক জোয়ারে ভাটা পড়ে নি, তাতে শুধু নরমপন্থী রক্ষণশীলতা ও বুর্জোয়া গণতান্ত্রিকতার মধ্যে আপোসই নয়, বহু ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিকতা ও উদারনৈতিকতার মধ্যে খানিকটা অখণ্ডতাতেও সাহায্য হয়। নবীন মার্কিন পুঁজিবাদের বিকাশে উদারনৈতিকতা ছিল একটা প্রগতিশীল ঘটনা। এই পরিস্থিতিতে জেফারসন 'সাধারণ কল্যাণের' ধারণা থেকে বৃহৎ বুর্জোয়া ও আবাদমালিকদের মধ্যেকার নরমপন্থী-রক্ষণশীল প্রতিনিধিদের সঙ্গে রাজনৈতিক আপোসের পথ নেন। আঠারো শতকের আলোকদাতাদের নিঃস্বার্থপরতা বিষয়ে লেনিনের উক্তি জেফারসন সম্পর্কেও পুরোপুরি প্রযোজ্য: এই আলোকদাতারা 'একান্ত আন্তরিকভাবেই সাধারণ সমৃদ্ধিতে বিশ্বাস করতেন এবং আন্তরিকভাবেই তা চাইতেন'**।

ক্ল্যাসিকাল বুর্জোয়া উদারনীতিক জেফারসন ছিলেন না, তাঁর রাজনৈতিক ও ভাবাদর্শীয় ধারণার আপোসপ্রবণতার চরিত্র ছিল পেটি-বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক। এটা জেফারসনের দোষ নয় যে স্বকালের পক্ষে প্রগতিশীল আমেরিকান রাষ্ট্রপাটের বিকাশের পরিণতি হয়েছে শাসক শ্রেণীর ভাবাদর্শীদের দ্বারা আমেরিকান বিপ্লবের সমুচ্চ আদর্শগুলিকে কলুষিত করায়। প্রজাতান্ত্রিকতাকে 'সাধারণ কল্যাণ' হিশেবে দেখার জেফারসনীয় বোধকে 'সর্বজনীন সমৃদ্ধির রাষ্ট্র' নামক আধুনিক বুর্জোয়া-সংস্কারবাদী ধারণায় রূপান্তর, 'সর্বনিম্ন' রাষ্ট্রক্ষমতার নীতি থেকে 'নিয়ন্ত্রক রাষ্ট্রের' উদারনৈতিক ধারণায় উত্তরণ তার দৃষ্টান্ত।

জেফারসন এগিয়েছিলেন সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে সীমারেখা টানা, জনগণের অধিকার ও সরকারের অধিকারের মধ্যে বৈপরীত্য থেকে। জেফারসন এবং অন্যান্য পেটি-বুর্জোয়া গণতন্ত্রীদের কাছে জনগণের সার্বভৌমত্বের ধারণাটা

যুক্ত হয় রাষ্ট্রক্ষমতার কাজকে সীমিত করা এবং তাতে করে রাষ্ট্রক্ষমতার পক্ষ থেকে স্বেচ্ছাচারের বিপদ হ্রাস করার প্রয়াসের সঙ্গে।

রাষ্ট্রক্ষমতায় সীমারোপ অর্জিত হয় তার ন্যায়পরায়ণ, প্রজাতান্ত্রিক সংগঠন মারফত। জেফারসন অনুসারে, 'কেবল প্রজাতন্ত্রই হল এমন রূপের শাসন যা মানবের অধিকারের সঙ্গে প্রকাশ্য বা গোপন যুদ্ধ চালায় না।'*

প্রজাতান্ত্রিক রূপের শাসনে 'সাধারণ কল্যাণ' নিশ্চিত করতে হবে অধিকাংশের শাসনের নীতির ভিত্তিতে। 'জাতি আর প্রজাতান্ত্রিক থাকে না, যখন অধিকাংশের ইচ্ছা আর আইন নয়।'** জেফারসনের মানববাদী-জ্ঞানপ্রচারণী দর্শন অনুসারে, অধিকাংশের অভিপ্রায় যথাযোগ্যরূপে প্রকাশ করে সমগ্র জনগণের সার্বভৌমত্ব। সেইসঙ্গে তিনি মনে করেন যে 'অধিকাংশের ইচ্ছাকে সর্বক্ষেত্রেই প্রাধান্য করতে হবে। কিন্তু এ ইচ্ছা যাতে হয় ন্যায়সঙ্গত, সেজন্য তাকে হতে হবে বিচক্ষণ, যাতে সংখ্যাল্পের সমান অধিকার থাকে, যার লঙ্ঘন হবে উৎপীড়ন।'*** 'অধিকাংশের স্বৈরাচারের' বিরোধিতা করেছেন জেফারসন। তবে তাঁর মতবাদ এ ব্যাপারে স্ববিরোধিতা থেকে মুক্ত নয়, যেটা এ মতবাদের পেটি-বুর্জোয়া চরিত্রের ফল। জেফারসন যে যুগের লোক সে পরিস্থিতিতে সংখ্যাল্পের অধিকার রক্ষার অর্থ কার্যক্ষেত্রে বৃহৎ সম্পত্তির স্বার্থ স্বীকার। কিন্তু অধিকার সাম্যের যে নীতি জেফারসন সমর্থন করেছিলেন, এতে তার গণতান্ত্রিক তাৎপর্য হ্রাস পায় না। যখন ব্যাপক জনগণের স্বার্থ এবং শাসক শ্রেণীদের স্বার্থের মধ্যে কোনো একটাকে বেছে নিতে হয়েছে, জেফারসন যোগ দিয়েছেন জনগণের সঙ্গে। তিনি লিখেছেন: 'যারা জনগণকে ভয় পায়, আমি তাদের দলে নই। ধনীরা নয়, জনগণই হল মুক্তি রক্ষার নির্ভরস্থল।'****

রাজনীতিকে জেফারসন জনগণের ব্যাপার করে তুলতে চেয়েছিলেন এবং রাজনীতির সামাজিক-অর্থনৈতিক শর্তাধীনতা উপলব্ধি করে কতিপয়,

'উচ্চ শ্রেণীর' হাতে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতার পুঞ্জীভবনের বিরোধিতা করেন তিনি। এও তাঁর চোখে পড়ে যে শক্তিশালী রাষ্ট্রযন্ত্র লাভজনক সর্বাগ্রে বৃহৎ সম্পত্তিধরদের পক্ষে, যারা তার সাহায্যে জনগণের গণতান্ত্রিক 'অমিতাচার' সফলভাবে দমন করতে পারে। জেফারসনের অবস্থানে প্রতিফলিত হয়েছে ছড়িয়ে-থাকা খামারী আর ছোটো ছোটো শহুরে বসতির আত্মশাসনের রেওয়াজ, যাদের কাছে কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রক্ষমতার ভাবনা ছিল সত্যিই বিজাতীয়। এরূপ ক্ষমতার বিরোধিতা করেছেন জেফারসন, কেননা তার মধ্যে তিনি দেখেছেন 'সতেজ শাসনের' বিপদ, যা 'সর্বদাই উৎপীড়নমূলক'। ঘন ঘন বিদ্রোহের সঙ্গে প্রবল স্বৈরাচারী সরকারের তুলনা করে তিনি প্রশ্ন করেছেন, সতেজ শাসনের বদলে জনগণকে আলোকদানের মাধ্যমে শান্তি রক্ষাই কি শ্রেয় নয়? একই সঙ্গে তিনি স্বশাসন নীতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সুদৃঢ় রাষ্ট্রক্ষমতা, রাষ্ট্রের ব্যাপারে জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণের পক্ষ নিয়েছেন। ১৮০১ সালে প্রেসিডেন্ট পদ থেকে বক্তৃতায় তিনি বুর্জোয়া প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের নীতির ভিত্তিতে জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার আহ্বান জানান: 'আমরা সবাই প্রজাতন্ত্রী, সবাই ফেডারেলিস্ট। নানান নামে আমরা অভিহিত করি একই নীতিকে। আত্মরক্ষার জন্য যে সরকারের প্রয়োজন কর্মশক্তি, দেশপ্রেমিকেরা তাকে ছেড়ে যেতে পারে না। আমি মনে করি, দুনিয়ার মধ্যে এটা সবচেয়ে শক্তিশালী সরকার। আমরা ইউনিয়ন ও প্রতিনিধিত্বমূলক শাসনের অনুরাগী।'*

জেফারসন তাঁর জ্ঞানপ্রচারণী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে 'সাধারণ কল্যাণের' জন্য উদ্যোগী ব্যবস্থা গ্রহণকারী শক্তিশালী রাষ্ট্রক্ষমতার ইতিবাচক অর্থ দেখেছিলেন, 'উচ্চ শ্রেণীগুলির' আত্মপর স্বার্থে অকল্যাণের জন্য নয়। বৃহৎ সম্পত্তিমালিকদের স্বার্থে এরূপ শক্তিশালী রাষ্ট্রক্ষমতার অপব্যবহারের আশংকা তাঁর অমূলক ছিল না। তিনি মনে করতেন, যেকোনো প্রতিষ্ঠান 'মন্দ লোকের হাতে' পড়লে অনাচারের হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারে'**। গণতান্ত্রিক নীতিগুলির দরুন শক্তিশালী, 'বহিঃনিরাপত্তা ও দেশাভ্যন্তরে শান্তি' নিশ্চিত করার জন্য যথেষ্ট ক্ষমতাধর এরূপ সরকারকে ব্যক্তির স্বাধীনতা, অবাধ প্রতিযোগিতা সীমিতকরণ, পেটি বুর্জোয়ার অর্থনৈতিক

ব্যাপারে স্বেচ্ছাচারী হস্তক্ষেপ এবং বৃহৎ মালিকানাকে বড়ো বেশি সমর্থনের ক্ষেত্রে হতে হবে 'দুর্বল'। বর্তমানে জরুরি তাৎপর্য ধরে অর্থনীতির ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ না করা বিষয়ে জেফারসনের ঐ ভাবনাটা নয়, সামাজিক জীবনের সর্বক্ষেত্রে বর্তমানে ব্যাপকভাবে হস্তক্ষেপকারী 'শক্তিশালী শাসনের' গণতান্ত্রিক সংগঠনের ধারণা। এই দিক থেকে বর্তমানের যে উদারনীতিকেরা জেফারসনের ঐতিহ্য বহন করছে বলে দাবি করে, তাদের 'নিয়ন্ত্রক রাষ্ট্রের' ধারণা জেফারসনের রাজনৈতিক অবস্থানের সত্যকার অর্থের পরিপন্থী, এই নিয়ন্ত্রক রাষ্ট্র কাজ করে সর্বাগ্রে বৃহৎ একচেটিয়া বুর্জোয়ার স্বার্থে। মার্কিন রাজনীতিবিদ ক. ফ্রিডরিখ 'নিয়ন্ত্রক রাষ্ট্রের' অবস্থানে উদারনীতিকদের সরে আসার ব্যাখ্যা দিয়েছেন সরাসরি এই বলে যে বিভিন্ন সামাজিক গ্রুপের বর্ধমান চাপ প্রতিরোধ করা ও তাদের পারস্পরিক সংঘাতে বিচারক হবার জন্য রাষ্ট্রক্ষমতাকে হতে হবে যথেষ্ট শক্তিশালী। বর্তমান উদারনীতিকেরা রাষ্ট্রক্ষমতার কর্তৃত্ব দেখছেন তার শ্রেণী-ঊর্ধ্ব চরিত্রে, যেক্ষেত্রে জেফারসনের কাছে এ কর্তৃত্ব তার গণতান্ত্রিকতায়, জনগণের অভিপ্রায় প্রকাশে।

জেফারসনের মতবাদে বিকশিত বুর্জোয়া গণতান্ত্রিকতাকে কিভাবে কলুষিত করা হয়েছে, 'সর্বজনীন সমৃদ্ধির রাষ্ট্র' বিষয়ে সাম্প্রতিক বুর্জোয়া-উদারনৈতিক ধারণা তার দৃষ্টান্তস্থল। নরমপন্থী রক্ষণশীলতার সঙ্গে জেফারসনের রাজনৈতিক আপোসের অর্থ গণতান্ত্রিক অবস্থান থেকে পশ্চাদপসরণ নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ১৭৮৭ সালের নরমপন্থী-রক্ষণশীল নীতির সংবিধানকে স্বীকার করলেও তিনি রাজতন্ত্রী, দাসপ্রথার পক্ষপাতী ও স্টেটগুলিতে প্রতিক্রিয়াশীলদের বিরুদ্ধে তাকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন গণতন্ত্রের অনুকূলে। 'সর্বজনীন সমৃদ্ধির রাষ্ট্রের' আধুনিক তত্ত্বকারেরা কিন্তু শ্রেণী বৈর, শ্রেণীভেদ দূর করা সম্ভব, 'গণতান্ত্রিক সম্মতির' সমাজ গঠন করা যায়, এই সব মোহ ছড়িয়ে খোলাখুলি একচেটিয়া বৃহৎ পুঁজির স্বার্থ রক্ষা করছে। রাষ্ট্রক্ষমতার স্বেচ্ছাচার থেকে ব্যক্তির অধিকার রক্ষার জন্য জেফারসনের আহ্বানও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান জীবনের পক্ষে প্রাসঙ্গিক। ব্যাপক রাষ্ট্রিক নিয়ন্ত্রণ, সামাজিক ভরণপোষণ, শিক্ষা, কর নীতির উন্নয়ন ইত্যাদি মারফত জনসাধারণের সুবিধাহীন স্তরের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের বুর্জোয়া-সংস্কারবাদী কর্মসূচিগুলিও রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজিবাদের পরিস্থিতিতে সন্তোষজনক ফল দেয় না। অথচ তা ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্কে রাষ্ট্রিক

অবস্থানের অবিরাম শক্তিবৃদ্ধি, সে রাষ্ট্রের গোষ্ঠীতান্ত্রিক দিকগুলির বৃদ্ধি ঘটাচ্ছে।

'ব্যক্তিগত উদ্যোগ সীমিত করণের' বিলোপ কিংবা ফেডারেল সরকারের কাজ সংকুচিত করে স্টেট ও শাসনের স্থানীয় সংস্থাগুলির অধিকার প্রসার বিষয়ে আধুনিক মার্কিন রক্ষণশীলদের দাবির সঙ্গে রাষ্ট্রক্ষমতা সংকোচনের জেফারসনী ধারণার সত্যকার গণতান্ত্রিক অর্থের মিল আরো কম। জেফারসন স্টেটগুলির অধিকার সমর্থন করেছিলেন গণতান্ত্রিক অবস্থান থেকে। স্টেটগুলির পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় সরকারকে বিরোধিতার সাংবিধানিক ও 'স্বাভাবিক' অধিকারকে তিনি মনে করতেন জনগণের অধিকার রক্ষার কার্যকর উপায়। প্রথম মেয়াদের জন্য প্রেসিডেন্ট পদে গিয়ে তিনি 'আমাদের স্থানীয় ব্যাপারাদির জন্য সর্বাধিক উপযোগী প্রশাসন এবং প্রজাতন্ত্রবিরোধী প্রবণতার বিরুদ্ধে অতি বিশ্বস্ত গড় হিশেবে স্টেট সরকারগুলির সমস্ত অধিকার' সমর্থন করেন, যদিও একই সঙ্গে 'সাধারণ সরকারকে তার পূর্ণ সাংবিধানিক শক্তিতে সংরক্ষণের' কর্তব্য হাজির করেন।* স্টেটগুলির অধিকারকে স্টেটে জনগণের অধিকার বলে জেফারসনের গণতান্ত্রিক ব্যাখ্যা আর স্থানীয় রাজপুরুষ ও ভূস্বামী অভিজাতবৃন্দের পক্ষ থেকে স্টেটগুলির অধিকার রক্ষার মধ্যে পার্থক্য করা উচিত। স্টেট সরকারে স্থানীয় বৃহৎ ভূস্বামী ও আবাদ-মালিকদের পক্ষ থেকে ক্ষমতা দখল ছিল সত্যিই সহজ। ১৭৮৭ সালের সংবিধানের অনুমোদনের বিরুদ্ধে স্টেটের সংগ্রামে যে অ্যান্টিফেডারেলিস্টদের — স্টেটের অধিকারের পক্ষপাতীদের রকমারি শিবিরে যেমন সংবিধানের গণতন্ত্রীকরণ দাবিকারী পেটি-বুর্জোয়া গণতন্ত্রী, তেমনি স্থানীয় প্রতিক্রিয়াশীলেরাও ছিল, যাদের কাছে সংবিধান মনে হয়েছিল বড়ো বেশি গণতান্ত্রিক, তাদের আঞ্চলিক ক্ষমতার প্রতিবন্ধক, সেটা অকারণে নয়। স্টেটগুলির অধিকার রক্ষায় বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক ও রক্ষণশীল ধারার মধ্যে এই বিরোধ আজো বজায় আছে।

এইভাবে, প্রথম আমেরিকান বুর্জোয়া বিপ্লবের যুগে উত্থিত বহু সমস্যার প্রাসঙ্গিকতা বর্তমানেও রয়ে গেছে।

ভাবাদর্শের ক্ষেত্রে মার্কিন সমাজের গত কয়েক দশকের সংকট হল সর্বাগ্রে আমেরিকান উদারনীতিবাদ ও নয়া-উদারনীতিবাদের সংকট, যারা

শ্রেণী আপোসের নামে শাসক শ্রেণীগুলির নিকট জনগণের নতিস্বীকার প্রতিষ্ঠিত করে।

এই সংকটের সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে উঠছে দক্ষিণপন্থী রক্ষণশীলতা ও বামপন্থী বিরোধিতার মধ্যে রাজনৈতিক প্রভেদ। যেমন, ৬০-এর দশকের আমেরিকান 'নয়া-বামদের' নানা গোত্র সত্ত্বেও তাদের প্রধান একটা ভাবাদর্শীয় ধারা ছিল মৌল রাজনৈতিক সমস্যাদির র‍্যাডিকেল-গণতান্ত্রিক উপস্থাপনের প্রয়াস, যার পক্ষপাতী ছিলেন জেফারসন। জেফারসনের ক্ষেত্রে ব্যক্তির স্বাধীনতা ও রাষ্ট্রের বিশেষাধিকারের মধ্যে বৈপরীত্য চালিত হয়েছিল রাষ্ট্রীয় সংযোগ দুর্বল করার দিকে নয়, তাদের গণতান্ত্রিকীকরণ, রাষ্ট্র চালনায় সমস্ত নাগরিকের অংশগ্রহণ সম্প্রসারণের দিকে। তাঁর কাছে 'প্রজাতন্ত্রের' আদর্শ ছিল অব্যবহিত গণতন্ত্র, অধিকাংশ দ্বারা প্রবর্তিত নিয়ম অনুসারে রাষ্ট্রশাসন। জেফারসনের মতে, যেকোনো শাসন সেই অনুপাতে প্রজাতান্ত্রিক, যে পরিমাণে তাতে থাকে নাগরিকদের 'সরাসরি' রাজনৈতিক ক্রিয়ার এই উপাদান। নিজের তাঁর সন্দেহ ছিল টাউনশিপ, অর্থাৎ নয়া ইংলণ্ডে খামারিদের ও শহুরে খুদে বসতির পরিসীমার বাইরে কোথাও এরূপ বিশুদ্ধ প্রজাতান্ত্রিক শাসন সম্ভব কিনা। 'বিশুদ্ধ' প্রজাতান্ত্রিকতার লক্ষণ জেফারসন দেখেছিলেন সরকারের ওপর নাগরিকদের প্রত্যক্ষ ও অবিরাম নিয়ন্ত্রণে। তেমন শাসনকে তিনি 'বিশুদ্ধ' প্রজাতন্ত্রের কাছাকাছি বলে ধরতেন, যেখানে ক্ষমতার বিভাগ আর নির্বাচকদের অভিপ্রায়ের আধিপত্য, 'জনগণের শাসন' বিদ্যমান।

জনগণের কাছ থেকে রাষ্ট্রিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতার ক্রমবর্ধমান হস্তান্তর, একচেটিয়া গোষ্ঠীরূপী অনির্বাচনীয় উচ্চ কোটির প্রভুত্বের পরিস্থিতিতে বর্তমানে প্রভুত্বকারী রাজনৈতিক মতবাদ ও সাংবিধানিক ক্রিয়াকলাপে এইসব নীতির অধঃপতন একেবারে সুস্পষ্ট। এতে অধিবাসীদের অতি বিভিন্ন সব স্তরের প্রতিনিধিদের মধ্যে বর্ধমান প্রতিবাদ জাগছে। যেমন, 'নয়া-বামদের' আন্দোলন একেবারে গোড়া থেকেই মানবাধিকারের আদর্শের, 'জনগণের জন্য ও জনগণের মাধ্যমে জনগণের শাসন', ইত্যাদির সরকারিভাবে প্রভুত্বকারী উদারনৈতিক ও রক্ষণশীল ব্যাখ্যার খোলাখুলি অস্বীকৃতি রূপে দেখা দেয়।

মার্কিন সমাজের 'গণতান্ত্রিক সম্মতি' ও 'সুযোগের সমতার' সরকারি কল্পকথা যত ধ্বসে পড়ছে, অন্যান্য মার্কিন গণতন্ত্রীর সঙ্গে জেফারসন যেসব র‍্যাডিকেল-গণতান্ত্রিক ধারণার প্রবক্তা ছিলেন, তাদের গুরুত্ব ততই

স্পষ্ট হয়ে উঠছে। 'নয়া-বাম' আন্দোলনের প্রতিনিধি, মার্কিন ঐতিহাসিক স. লিন্ড দেখিয়েছেন যে এ আন্দোলনের নেতারা যেসব ভাববর্গ ব্যবহার করছেন তা আঠারো শতকের শেষদিককার আমেরিকান র‍্যাডিকেল ভাবাদর্শের বৈশিষ্ট্যসূচক, যথা: সর্বোচ্চ নৈতিক অধিকার, অলঙ্ঘ্য অধিকার, বিপ্লবের অধিকার, ইত্যাদি। এইভাবে, রাজনৈতিক সমস্যার র‍্যাডিকেল-গণতান্ত্রিক উপস্থাপনায় পড়ছে আংশিকভাবে ঐতিহ্যের একটা ছাপ। 'গণতান্ত্রিক সমাজের পক্ষে ছাত্র' সংগঠনের পক্ষ থেকে ১৯৬২ সালে প্রকাশিত 'নয়া-বাম' আন্দোলনের প্রথম দিককার একটি ইসতাহারে বলা হয়েছে যে মার্কিন বাস্তবতায়, বিশেষ করে দক্ষিণের এবং বড়ো বড়ো উত্তুরী শহরের নিগ্রোদের কাছে সমতার ঘোষণাপত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে একটা ফাঁকা বুলি। তাতে আরো বলা হয়েছে যে সমাজ সংগঠিত হওয়া উচিত অল্পাংশের জন্য নয়, অধিকাংশের জন্য; যেসব সামাজিক সিদ্ধান্তে ব্যক্তির জীবনের অন্তঃসার ও অভিমুখ নির্ধারিত হয়ে যাচ্ছে, তা গ্রহণে অংশ নিতে হবে তাকে।

'নয়া-বাম' আন্দোলনের কয়েকটি ধারার বৈশিষ্ট্য হল অহিংস সংগ্রামের দর্শন ও রণকৌশল, বড়ো কারবারের সেবারত ব্যাপক সংবাদের প্রতিক্রিয়াশীল একচেটিয়ার বিরুদ্ধে স্বস্থানে জ্ঞানপ্রচারণী কাজের সাহায্যে জনগণের রাজনৈতিক চেতনা ও জ্ঞান বৃদ্ধির প্রবণতা।

যে বুর্জোয়া সাংবিধানিক ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে তার প্রতি 'নয়া-বামদের' যেমন হতাশা, তেমনি খোলাখুলি অবিশ্বাস প্রকাশ পাচ্ছে। এ ব্যবস্থা মানুষের অধিকার নিশ্চিত করতে অক্ষম শুধু তাই নয়, তার প্রতি শত্রুভাবাপন্নই। ক্ষমতার বিদ্যমান ব্যবস্থার সমালোচনা করে তাঁরা জেফারসন ও অন্যান্য পেটি-বুর্জোয়া গণতন্ত্রীর আদর্শের শরণাপন্ন হচ্ছেন যাঁরা প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থাকে দেখেছেন সর্বোচ্চ ক্ষমতার সার্বভৌম ধারক হিশেবে নয়, শুধু জনগণের প্রতিনিধি হিশেবে, যারা সে ক্ষমতা নিজেদের হাতে রাখছে যেকোনো পরিস্থিতিতে। যদি কোনো প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থা (নির্বাচিত না হলে তো কথাই ওঠে না) সংখ্যাল্পের স্বার্থে পলিসি অনুসরণ করতে থাকে এবং জনগণের অধিকাংশের অভিপ্রায়কে অমান্য করে, তাহলে সেরূপ পলিসির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা উচিত, সে পলিসি এমনকি আইনের রূপ ধারণ করলেও। যেমন জেফারসন, তেমনি 'নয়া-বামদের' কাছে রাষ্ট্রক্ষমতার অপব্যবহারের বিরুদ্ধতার অন্তিম উপায় রয়েছে নরমপন্থী-রক্ষণশীল আমেরিকান সংবিধানে নিবদ্ধ ব্যবস্থাদির বাইরে। তা নিহিত

জনগণের মধ্যে। অন্যদিকে, জেফারসনের মতোই 'নয়া-বামেরা' বিরোধী রাজনৈতিক সংগ্রামের সাংবিধানিক পদ্ধতির বোধকেও প্রসারিত করার চেষ্টা করেছেন। এই আন্দোলন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার অংশীরা নিগ্রোদের নাগরিক অধিকার প্রদান ও 'অধিকার বিল'এ নিবদ্ধ নাগরিক স্বাধীনতা মান্য করানোর জন্য সংগ্রামে দেশের সামরিকীকরণ, যুবজনের সামাজিক অধিকার সংকোচন, সরকারের সাম্রাজ্যবাদী নীতির বিরুদ্ধে অভিযান ইত্যাদিকে কাজে লাগিয়েছেন।

'নয়া-বামদের' মধ্যকার চরমপন্থী ধারাগুলি শাসনের রাষ্ট্রীয়-একচেটিয়া ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রামে যে নৈরাজ্যবাদী ও সন্ত্রাসমূলক পদ্ধতি অনুসরণ করে, তার স্বতঃস্ফূর্তির সামনে মাথা নত করার অসার্থকতা কার্যক্ষেত্রে যত পরিস্ফুট হয়ে উঠছে, জেফারসনের গণতান্ত্রিক ভাবনার প্রাসঙ্গিকতাও ততই বেড়ে উঠছে। সমাজে সত্যকার সমানাধিকারের জন্য আমেরিকান আন্দোলনের সামনে কর্তব্য দাঁড়াচ্ছে আন্দোলনের সংগঠনশীলতার সঙ্গে তার জনবহুলতাকে মেলানো, খোদ রাষ্ট্রক্ষমতাতেই অবস্থান জিতে নেয়া।

জেফারসনের রাজনৈতিক মতবাদ আঠারো শতকের বৈপ্লবিক ঘটনাবলির ফল। রাষ্ট্রে প্রতিটি স্বতন্ত্র ব্যক্তির থাকবে সমান অধিকার এই নিয়ে তাঁর মানববাদী ভাবনার তাৎপর্য তৎসাময়িক নয়, যদিও পুঁজিবাদ, ব্যক্তিমালিকানার পরিস্থিতিতে কার্যক্ষেত্রে তা থেকে যাচ্ছে একটা গণতান্ত্রিক স্বপ্নই। বর্তমানের রাষ্ট্রীয়-একচেটিয়া পুঁজিবাদের পরিস্থিতিতে এ স্বপ্নের চরিত্র হয়ে ওঠে আরো বেশি ইউটোপীয়। এটা নেহাৎ দৈবাৎ নয় যে 'নয়া-বামদের' অনেক ভাবাদর্শী দাবি করছেন 'শেয়ারের গণতন্ত্র', অর্থাৎ 'কর্পোরেট পুঁজিবাদের' বাহ্য গণতন্ত্রের বদলে অব্যবহিত, 'কেজো' গণতন্ত্র। 'নয়া-বামদের' মতে, 'শেয়ারের গণতন্ত্র' সম্ভব অনতিবৃহৎ কোষ-কমিউনে, যেখানে রাজনৈতিক ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণে নাগরিকেরা বাস্তব অংশ নিতে পারে। স্বশাসনের একটা রূপ হিশেবে জেফারসনের 'বিশুদ্ধ প্রজাতন্ত্রের' ধারণার সঙ্গে এ দৃষ্টিভঙ্গির মিল আছে। তবে জেফারসন তখনই দেখতে পেয়েছিলেন যে বুর্জোয়া গণতন্ত্র উচ্চতম গণতান্ত্রিক আদর্শের রূপায়ণ নিশ্চিত করে না। আধুনিক আমলাতান্ত্রিক কেন্দ্রীভূত বুর্জোয়া রাষ্ট্রের বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে 'অব্যবহিত গণতন্ত্রের' ধারণা তাই আরো বেশি ইউটোপীয়।



§ ১১। আলেক্সান্দর রাদিশ্যেভ

রুশ সামাজিক-রাজনৈতিক চিন্তার ইতিহাসে আঠারো শতকের দ্বিতীয়ার্ধের স্থান অতি গুরুত্বপূর্ণ। আ. ন. রাদিশ্যেভের (১৭৪৯-১৮০২) ক্রিয়াকলাপ প্রধানত এই পর্বেই। ঠিক এই বছরগুলিতেই জনসেবা, ন্যায়পরায়ণ সামাজিক ও রাষ্ট্রিক ব্যবস্থার ধারণা দানা বাঁধে ও রুশ সমাজের অগ্রণী স্তরগুলির মধ্যে ব্যাপকভাবে ছড়ায়। অগ্রণী রুশ মনীষীরা তাঁদের রচনায় ভূমিদাস প্রথা ও আলোকপ্রাপ্ত পরারাজতন্ত্রের তীব্র সমালোচনা করেন। রাশিয়ায় যে জনমত গড়ে ওঠে তা স্বৈরতন্ত্র কর্তৃক চাপানো ভাবাদর্শ থেকে মুক্ত হয়ে সে ভাবাদর্শের দৃঢ় বিরোধিতা করতে থাকে।

রুশ ইতিহাসের এই পর্বের বিপুল তাৎপর্য প্রসঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি ও রাষ্ট্রের প্রমুখ কর্মকর্তা ম. ই. কালিনিন উল্লেখ করেন যে রাশিয়ায় আঠারো শতকের সাহিত্যে আমরা পাই বৈপ্লবিক নৈতিকতার প্রথম অঙ্কুর। তিনি লিখেছেন: 'আভিজাতিক-রাজতান্ত্রিক উ'চু মহলের সংকীর্ণ-স্বার্থপর নৈতিকতার বিপরীতে দেখা দিল নতুন নৈতিকতার ভিত্তি: শোষকদের প্রতি ঘৃণা, জনগণের প্রতি ভালোবাসা, দেশপ্রেম।'*

রাশিয়ায় আঠারো শতকের দ্বিতীয়ার্ধের সামাজিক-রাজনৈতিক চিন্তার এক মহত্তম সৃষ্টি হল আ. ন. রাদিশ্যেভের রচনা, যা হয়ে দাঁড়ায় রাশিয়ায় বৈপ্লবিক ঐতিহ্যের অতি গুরুত্বপূর্ণ এক উৎস।

রুশ রাজনৈতিক ও আইনী চিন্তার ইতিহাসে রাদিশ্যেভ প্রথম বিপ্লবী-প্রজাতন্ত্রী হিশেবে স্থান পেয়েছেন। আঠারো শতকের ৬০-৮০-এর দশকের অগ্রণী রুশ রাজনৈতিক ও আইনী চিন্তার সঙ্গে রাদিশ্যেভ ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। সেই সঙ্গে তাঁর ধ্যানধারণা হল রুশ আলোকপ্রাপ্তির এক নতুন পর্যায়। পূর্ববর্তী রুশ সাহিত্যে যেসব তাত্ত্বিক প্রস্তাব দেখা দিয়েছিল, ব্যাপকভাবে তা ব্যবহার করে তিনি সেগুলিকে বিকশিত, পরিপূরিত করেন। কৃষক বিপ্লবের দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি বিচার করেন তাঁর সমকালীন রাশিয়ার সমস্ত বনিয়াদী রাজনৈতিক প্রশ্ন। ।

ভূমিদাস প্রথা ও রুশ পরারাজতন্ত্রের সমালোচনা তিনি করেছেন বিপ্লবীর অবস্থান থেকে, রাশিয়ার ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রব্যবস্থা নিয়ে তাঁর পরিকল্পনা প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ভাবনায় উদ্দীপ্ত। রাদিশ্যেভের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির গুরুত্বপূর্ণ দিক হল সমমাত্রিক সাম্যবাদ।

রাদিশ্যেভের রাজনৈতিক কর্মসূচির তাত্ত্বিক বনিয়াদ হল রাষ্ট্র ও আইনের উদ্ভব ও মর্মার্থ বিষয়ে তাঁর মতবাদ।

রাষ্ট্রের উদ্ভব বিষয়ে নিজের মতবাদ সংরচনে রাদিশ্যেভ এগিয়েছেন স্বাভাবিক অবস্থার ধারণা থেকে। স্বাভাবিক অবস্থা ও সামাজিক চুক্তি সম্পর্কে তাঁর ধারণা অনেক দিক থেকে ব্ল্যাকস্টোন ও রুসোর দৃষ্টিভঙ্গির

মতো। আগেই যা বলা হয়েছে, রুসো মনে করতেন, স্বাভাবিক অবস্থা 'সম্ভবত কখনোই বিদ্যমান ছিল না'।

রুসোর মতো রাদিশ্যেভ এই কথায় জোর দেন যে স্বাভাবিক অবস্থার প্রশ্ন বিচারে এগুতে হচ্ছে বিমূর্তায়ন থেকে, লোকেদের 'সমাজের বাইরে' কল্পনা করে নিতে হয় 'মনে মনে'। ফরাসি মনীষী থেকে রাদিশ্যেভের পার্থক্য এই যে তিনি নিশ্চিত যে স্বাভাবিক অবস্থা একটা অলীক ব্যাপার। রুসো মনে করতেন, স্বাভাবিক অবস্থায় যৌন সঙ্গমের চরিত্র ছিল আপতিক, লোকে সাধারণত বাস করত পরস্পর থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নতায়। রাদিশ্যেভের মতে, প্রকৃতি 'নারীপুরুষের পার্থক্য থেকে ...মানুষের মধ্যে গড়ে তুলেছে সহবসতির প্রবণতা'। তিনি লিখেছেন: 'মানুষ হল সামাজিক জীব, তা সৃষ্ট স্বীয় সদৃশদের সমাজে বাস করার জন্য।'*

রাদিশ্যেভ দৃঢ়ভাবে দাবি করেন যে স্বাভাবিক অবস্থায় মানুষের 'সংবেদনশীল গঠনের দরুন' ন্যায় ও অন্যায়ের অভ্যন্তরীণ বোধ তার প্রকৃতিগত। লোকে এখানে অনুসরণ করে এই নীতি: 'অন্যের বেলায় তেমন কিছু ক'রো না যেটা চাও না যে নিজের ক্ষেত্রে ঘটুক'**। মনে হয় ঠিক এইসব ধারণা থেকেই তিনি বিরোধিতা করেছেন 'আইনশিক্ষকদের', যা বলতে তিনি সর্বাগ্রে মনে রেখেছেন হবসকে। রাদিশ্যেভ লিখেছেন: 'আইনশিক্ষকেরা বলেন যে লোকেরা একে অপরের বিবেচনায় তেমনি পরিস্থিতিতে, যেমন স্বাভাবিক অবস্থায় মানুষের একজনের সঙ্গে অন্যের সম্পর্ক। প্রশ্ন: মানুষের স্বাভাবিক অবস্থায় তার অধিকারের মর্মার্থ কী? উত্তর: তাকিয়ে দ্যাখো তার দিকে। সে উদ্ধত, লোভী, লোলুপ। নিজের প্রয়োজন মেটাবার জন্য তার পক্ষে যাকিছু নেয়া সম্ভব তা সে আত্মস্থ করে। কোনো কিছু যদি তাতে বাধা দিতে চায়, তাহলে সে বাধাটাকে দূর করে, চূর্ণ করে, লাভ করে নিজের বাঞ্ছনীয়। প্রশ্ন: নিজের প্রয়োজন মেটাবার পথে যদি নিজ সদৃশের দ্বারস্থ হয়, দৃষ্টান্তস্বরূপ, যদি বুভুক্ষু দু'জন খিদে মেটাতে চায় একটা টুকরো থেকে, তাহলে দু'জনের মধ্যে সেটা গ্রাস করার অধিকার কার বেশি? উত্তর: যে টুকরোটা নেবে। প্রশ্ন: কে নেবে?

উত্তর: যে বেশি বলবান। — এটাই কি স্বাভাবিক বিধি, জনগণের অধিকারের এই কি ভিত্তি!'*

যেখানে শক্তি সক্রিয়, রাদিশ্যেভের মতে, সেখানে অধিকারের কোনো কথাই উঠতে পারে না। 'শক্তি যখন বলবৎ, তখন কিসের অধিকার? তা কি থাকতে পারে যখন সিদ্ধান্তে মোহর-ছাপ পড়ছে জনগণের রক্তে? অধিকার কি থাকতে পারে যখন তা কার্যকর করার মতো শক্তি নেই?'**

আঠারো শতকের অধিকাংশ মনীষীর মতো রাদিশ্যেভ স্বাভাবিক বিধির বিষয়বস্তু নিষ্কাশিত করেছেন মানুষের প্রকৃতি থেকে। 'পৃথিবীতে আবির্ভূত মানুষ সবকিছুতে অন্যের সঙ্গে সমান। সে দুর্বল, নির্লজ্জ, লোভী, গ্রাসসর্বস্ব। এই থেকে তার প্রথম প্রবণতা অথবা স্বাভাবিক বাধ্যতা হল নিজের আহার্য ও রক্ষণাবেক্ষণের সন্ধান; তার প্রথম অধিকার হল তার ঘাটতি মেটাবার জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ব্যবহার। ...এই হল স্বাভাবিক নিয়মের ভিত্তি।'*** সম্পত্তি আবির্ভাবের আগে সমাজে ছিল একচিত্ততা এবং 'সাধারণ উপকারের জন্য প্রত্যেকের নিজস্ব প্রেরণা ছাড়া, প্রত্যেকের নিজস্ব ইচ্ছা পূরণের প্রায় প্রাকৃতিক প্রবণতা ছাড়া আইন আর কিছু নয়; কেননা প্রত্যেকেই যা চায় তা কী চাইছে সবাই, তাছাড়া আর কিছু নয়, কিংবা সঠিকভাবে বললে, সবাই যা চায় তার বিপরীত কেউ কিছু চায় না।'****

মানবসমাজ, রাদিশ্যেভ যা বলেন, 'ক্রমোন্নতির বহু পর্যায়' অতিক্রম করেছে। সঠিকভাবেই তিনি মনে করেন যে সমাজ বিকাশের প্রথম পর্যায়টা ছিল কৌলিক ব্যবস্থা। যেমন, সাইবেরিয়ায় ইয়েরমাকের অভিযানকালে বুরিয়াতদের সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে তিনি লিখেছেন যে তারা 'ছিল তাদের প্রাথমিক অবস্থায়, নানা কুলে বিভক্ত, যাদের প্রত্যেকে নির্বাচিত বা বংশানুক্রমিক পরিচালকের অধীনতা মানত'*****।

রাষ্ট্র ও আইনপ্রণয়নের উদ্ভবকে রাদিশ্যেভ সংশ্লিষ্ট করেছেন যাযাবরদের

কৃষিতে উত্তরণের সঙ্গে। তিনি লিখেছেন: 'কৃষি থেকে দেখা দেয় অঞ্চল ও রাষ্ট্রে ভূমির বিভাগ, গড়ে ওঠে গ্রাম ও শহর, দেখা দেয় কারিগরি, হস্তশিল্প, বাণিজ্য, ব্যবস্থা, আইন, শাসন।'*

রুসোর মতো রাদিশ্যেভও রাষ্ট্রের উদ্ভবকে সংশ্লিষ্ট করেছেন সম্পত্তির উদ্ভবের সঙ্গে। ফরাসি মনীষীর সুবিদিত উক্তি পুনরুদ্ধার করে তিনি মন্তব্য করেছেন: 'মানুষ যখন বলল: এই পরিমাণ জমি আমার! তখন সে জমির সঙ্গে নিজেকে গেঁথে রাখল, খুলে দিল পশুসদৃশ আত্মতুষ্টির পথ, যখন মানুষ হুকুম চালায় মানুষের ওপর।'** তবে রাষ্ট্র উদ্ভবের রাদিশ্যেভের তত্ত্ব রুসোর তত্ত্ব থেকে আমূল পৃথক। আগে যা বলা হয়েছে, রুসোর মতে, ক্ষমতা, বিচারক, বিচারালয় দেখা দিয়েছে ধনীদের ধূর্ত পরিকল্পনার ফলে, যেসব শক্তি তাদের আক্রমণ করছিল তারা সেগুলিকে নিজেদের কাজে লাগাবার চেষ্টা করে। জায়মান শাসন ক্রমে নিয়মিত রূপ লাভ করে ও দেখা দেয় রাষ্ট্র। রাদিশ্যেভের অবস্থান অন্যবিধ। রাদিশ্যেভ মনে করেন, 'রাষ্ট্র হল বিরাট এক জগদ্দল যার লক্ষ্য হল নাগরিকদের পরিতৃপ্তি'***। জনগণের বিচারবুদ্ধিতে বিশ্বাস রেখে তিনি অস্বীকার করেছেন যে তারা নাকি স্বেচ্ছায় শেকল পরেছে। রাদিশ্যেভের মতে, রাষ্ট্র দেখা দিয়েছে দুর্বল ও নিপীড়িতদের রক্ষার জন্য অনুক্ত চুক্তির ফলে। 'অশক্তি ও অপূর্ণতার প্রবল কণ্ঠে সহবসতিতে আহূত মানুষেরা অচিরেই বুঝতে পারল যে নির্লজ্জতা ও ঔদ্ধত্য খর্ব করার জন্য প্রয়োজন দুর্দান্ত শক্তির, যা সমস্ত সামাজিক সঙ্ঘের ঊর্ধ্বে উঠে দুর্বলদের, নিপীড়িতদের রক্ষণের, নির্ভরস্থলের কাজ করবে,' লিখেছেন তিনি তাঁর 'সদাচার ও পুরস্কার প্রসঙ্গে' পাণ্ডুলিপিতে****। 'স্বাধীনতা' গাথাতেও রাষ্ট্র উদ্ভবের প্রশ্নটিকে অনুরূপ ভাবে রেখেছেন:

'জনগণে দেখা দিল সাধারণ ক্ষমতা,
সব ক্ষমতাকে জড়ো ক'রে এক ভাগ্য,
সবকিছুতেই সমাজের কাছে মান্য,

সবখানে তার সাথে সবে একমত।
সাধারণ উপকারে নেই কোনো বন্ধক;
সবাকার ক্ষমতাতে দেখি নিজ ভাগ্য,
নিজেরটা গ'ড়ে, গড়ি সকলের ইচ্ছা;
সমাজে জন্ম নিল আইন।'*

রুসোর দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে রাদিশ্যেভের তত্ত্বের তুলনা করলে স্বীকার করতেই হবে যে রাষ্ট্রের সত্যকার মর্ম ও তার উদ্ভবের কারণ সম্পর্কে রাদিশ্যেভের বোধ ছিল অনেক বেঠিক। বোঝাই যায়, রাষ্ট্র গড়ে ওঠার সত্যকার ছবিটা পরিষ্কার করে নেবার কর্তব্যও রাদিশ্যেভ নেন নি। আমাদের মতে, তাঁর কাছে চুক্তি তত্ত্ব স্বাভাবিক অবস্থার মতোই সমান অলীক।

উল্লেখ করা যাক যে সামাজিক চুক্তির এইরূপ ব্যাখ্যা কেবল রাদিশ্যেভের বৈশিষ্ট্য নয়। অনুরূপ দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করতেন ব্ল্যাকস্টোন, যাঁর ভাবনা-ধারণার সঙ্গে রাদিশ্যেভ সুপরিচিত ছিলেন। আদিম লোকেরা 'অভাব ও অনটনে ভুগত' মন্তব্য করে ব্ল্যাকস্টোন বলেছেন: 'এরূপ অনুভূতি [অভাব-অনটন] যা প্রতিটি লোকে টের পাচ্ছে, তার মারফত জনসমাজের উক্ত আদিম চুক্তিও ধরে নেয়া হয় যা কোনো ক্ষেত্রেই জনগণকে এক করার ব্যাপারে সগাম্ভীর্যে ঘোষিত না হলেও নিহিত থাকার কথা।'**

সমাজের সমস্ত শরিকদের স্বার্থে 'অনুক্ত' সামাজিক চুক্তির ধারণা রাদিশ্যেভ কাজে লাগিয়েছেন দাসত্বের শৃঙ্খল ছিন্ন করে রাজার উপর বিচারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হবার জন্য সর্বাভৌম জনগণের অধিকারের পক্ষে যুক্তির ভিত্তি হিশেবে। তিনি লিখেছেন: 'আমরা যদি আইনের ক্ষমতাধীনে থাকি, তবে সেটা পালনে আমরা বাধ্য বলে নয়; তাতে লাভ আছে বলে। আমরা যদি আমাদের অধিকার ও স্বাভাবিক ক্ষমতার একাংশ আইনকে দিয়ে থাকি, তবে সেটা আমাদের উপকারে ব্যবহৃত হবার জন্য। তা নিয়ে সমাজের সঙ্গে আমরা অনুক্ত চুক্তি করি। সে চুক্তি ভঙ্গ হলে আমরাও আমাদের দায়িত্ব থেকে মুক্তি পাই। রাজার অবিচার তার

বিচারক — জনগণকে দেয় অপরাধীর ওপর আইনের যা অধিকার তার চেয়েও বেশি অধিকার।'*

রাদিশ্যেভের মতে, আইনের ধারণাটা রাষ্ট্রের ধারণার সমতুল্য, কেননা 'কিসে সামাজিক মঙ্গল তার বিজ্ঞপ্তি ছাড়া আইন আর কিছু নয়'**। এই ভিত্তিতে তিনি মানুষের অলঙ্ঘ্য স্বাভাবিক অধিকারের সিদ্ধান্ত টেনেছেন এবং তার অন্তর্ভুক্ত করেছেন সম্পত্তি, নিরাপত্তা, স্বাধীনতা, জীবনের অধিকারকে। জারি করা আইনের দাবিকে মিলে যেতে হবে স্বাভাবিক নিয়মের দাবির সঙ্গে। সমাজের অন্তর্ভুক্ত হলে নাগরিক আর মানুষ নয়, তার স্বাভাবিক অধিকার থাকে না এমন নয়। সেই সঙ্গে সাধারণ কল্যাণের স্বার্থে এই অধিকারগুলি সীমিত করা যেতে পারে, তবে রাজার সিদ্ধান্তে নয়, নাগরিকদের সাধারণ স্বার্থের প্রতিফলক সুচিন্তিত আইন জারি করে। তিনি লিখছেন: 'আইন নাগরিকের সম্পত্তি, সম্মান, স্বাধীনতা কিংবা জীবন কেড়ে নিতে পারে। এর কোনো একটা অধিকার নাগরিকের কাছ থেকে কেড়ে নিলে রাজা আদি শর্ত ভঙ্গ করে এবং রাজদণ্ড হাতে থাকলেও সিংহাসনের অধিকার হারায়।'***

ভূমিদাস প্রথার তীব্র সমালোচনা করেছেন রাদিশ্যেভ। এ ব্যাপারে তিনি একক ছিলেন না। আঠারো শতকের ৬০-৮০-এর দশকের রুশ জ্ঞানপ্রচারকদের রচনায় ভূমিদাস প্রথা অভিযুক্ত হয়েছে বারম্বার।

তবে রাদিশ্যেভের পূর্ববর্তীরা সাধারণত সীমাবদ্ধ থেকেছেন ভূমিদাস প্রথার বিরুদ্ধে আলাদা আলাদা যুক্তির বিচারে। যেমন, ন. ই. নোভিকভ পেশ করেন প্রধানত নৈতিক যুক্তি, স. ইয়ে. দেসনিৎস্কি প্রধান মনোযোগ দেন ভূমিদাস প্রথার বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক আপত্তিতে। এই প্রশ্নে রাদিশ্যেভের পূর্ববর্তীদের মধ্যে একটি প্রোজ্জ্বল রচনা হল ন. ই. নোভিকভের 'জিভোপিসেৎস' (চিত্রকর) পত্রিকায় প্রকাশিত (১৫ মে ১৭৭২) ৫ সংখ্যায় 'ই... ত...তে ভ্রমণের ছিন্নাংশ'। তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হয় 'ইংলন্ডে পায়চারি' (সংখ্যা ১৩) ও 'ই... ত...তে ভ্রমণের ছিন্নাংশের ক্রমানুবর্তন' (সংখ্যা ১৪)। ১৭৭৫ সালে 'জিভোপিসেৎস'এর তৃতীয়

সংস্করণে নোভিকভ 'ছিন্নাংশ...' ও 'ছিন্নাংশের ক্রমানুবর্তন'কে একটি রচনায় সংযুক্ত করেন।

'ছিন্নাংশ'এর লেখক অতি স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে তিনি এক-একজন জমিদারের এক-একটা পাপের ওপর কষাঘাত করছেন না, সমগ্রভাবে গোটা ভূমিদাস প্রথাকেই সমালোচনা করছেন! 'কৃষকের মূর্তিতে সর্বত্রই আমি দেখা পেয়েছি দারিদ্র্য ও দাসত্বের। কৃষক দারিদ্র্যের কারণ জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য একটি গ্রামকেও আমি বাদ দিই নি। আর তাদের উত্তর শুনে অতি মর্মাহত হয়ে সর্বদাই এই দেখেছি যে দোষ তাদের জমিদারদের। হে মানবত্ব! — তোমাকে জানে না এই বসতির লোকেরা। হে প্রভুত্ব। তুমি তোমারই মতো মানুষদের ওপর অত্যাচার করছ...'*

'ছিন্নাংশ'এর লেখক রাজোরেন্নায়া (ধ্বংসপ্রাপ্ত) গ্রামের একান্ত বাস্তব একটা ছবি দিয়েছেন, যেখানে কৃষকেরা সমস্ত সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত, বন্য জন্তুর মতো তারা ভয় পায় জমিদারকে। ক্রন্দনরত তিনটি শিশুর বর্ণনা দিয়ে তিনি চিৎকার করে উঠেছেন: 'কাঁদো, বেচারি জীবেরা ...নিজেদের নালিশ জানাও! ছেলেবেলাকার এই শেষ তৃপ্তিটা উপভোগ করো: যখন বড়ো হয়ে উঠবে তখন এই সান্ত্বনাটাও থাকবে না।'** 'উপযুক্ত দপ্তর এড়িয়ে' দরখাস্ত দিয়ে সম্রাজ্ঞীকে 'বিরক্ত' করা নিষিদ্ধ করে ১৭৬৫ সালের ১৯ জানুয়ারি যে আদেশ প্রচারিত হয়েছিল, তাকে ধিক্কার দান এক্ষেত্রে চোখে না পড়ে পারে না।

কাঁথা-জড়ানো তিনটি শিশুর মূর্তি বেড়ে ওঠে নিগড়বদ্ধ জনগণের রূপকে, যারা শুধু স্বাধীনতা থেকে নয়, খাদ্য, জীবন, নির্যাতন থেকে আত্মরক্ষার অধিকার থেকেও বঞ্চিত।

'ছিন্নাংশ...' প্রকাশ কবায় নোভিকভ তার কষাঘাতী শক্তি সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তিনি লেখেন, এই 'খাবারটা' 'বানানো হয়েছে খুব নুন দিয়ে, তাই অজ্ঞ মহাশয়দের স্নিগ্ধ রুচির পক্ষে এটা কটু ঠেকবে।'***

রাদিশ্যেভের রচনায় ভূমিদাস প্রথার সমালোচনা ওঠে এক নতুন স্তরে। ব্যাপারটা শুধু এই নয় যে রুশ সাহিত্যে সর্বপ্রথম ভূমিদাস প্রথার বিরুদ্ধে

রাদিশ্যেভের পূর্ববর্তীদের কথিত সমস্ত যুক্তি সুসঙ্গতভাবে ও খোলাখুলি উপস্থিত করা হল। আরেকটা জিনিস অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ: এইসব যুক্তির প্রত্যেকটাই কৃষক বিপ্লবের ভাবনায় উদ্দীপ্ত। রাদিশ্যেভের রচনায় আমরা প্রথম দেখি ভূমিদাস প্রথার বৈপ্লবিক উৎসাদনের চিন্তা।

তাঁর পূর্ববর্তীদের মতো রাদিশ্যেভও ভূমিদাস প্রথার বিরুদ্ধে ব্যবহারশাস্ত্রীয়, অর্থনৈতিক ও নৈতিক যুক্তি প্রদান করেছেন।

ভূমিদাস প্রথার বিরুদ্ধে ব্যবহারশাস্ত্রীয় যুক্তিগুলি তিনি সর্বাধিক সুসঙ্গতভাবে বিবৃত করেছেন 'পিটার্সবুর্গ থেকে মস্কো যাত্রা' রচনায়। যুক্তির বড়ো একটা অংশ এখানে বসানো হয়েছে 'পুরনো বন্ধু', লেখক ক্রেস্তিয়ানকিনের মুখে, অথবা আছে লেখকের 'আন্তরিক বন্ধু' রচিত 'ভবিষ্যতের প্রকল্প'এ। কিছু কিছু চিন্তা রাদিশ্যেভ স্বনামেই প্রকাশ করেছেন।

'পিটার্সবুর্গ থেকে মস্কো যাত্রা' বইটির বৈশিষ্ট্য তার ললিত সাহিত্যিক চরিত্র, ফলে তার ভিত্তিতে রাদিশ্যেভের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি মেলে ধরা খুবই কঠিন হয়ে পড়ে। পরিব্রাজক আলাপ করছেন বহু লোকের সঙ্গে, বিভিন্ন তাদের মতামত, মাঝে মাঝে এমনকি সরাসরি বিপরীত।

এই কারণে রাদিশ্যেভের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির কোনো একটা দিক আলোচনার সময় স্বয়ং পরিব্রাজক যে ভাবনাটা তুলে ধরেন চেষ্টা করব রাদিশ্যেভের অন্যান্য রচনার বিষয়বস্তুর সঙ্গে তার তুলনা করতে, তার পরেই কেবল 'যাত্রা'র অন্যান্য অংশের দিকে চোখ দেব, যেখানে এইসব ভাবনা আরো বিকশিত হয়েছে, কিন্তু বিবৃত হয়েছে পরিব্রাজকের স্বনামে নয়।

ক্রেস্তিয়ানকিন এবং 'আন্তরিক বন্ধু' এখানে যেসব কথা বলেছেন, সেটা স্বয়ং রাদিশ্যেভেরই চিন্তা। ভূমিদাস প্রথার সমালোচনা প্রসঙ্গে 'যাত্রা'র এই নায়কেরা স্বাভাবিক বিধি ও সামাজিক চুক্তি তত্ত্বের সেইসব যুক্তি অবলম্বন করেছে যা রাদিশ্যেভের আগেকার রচনায় প্রদত্ত হয়েছিল। সেই সঙ্গে রাদিশ্যেভের আগেকার রচনায় এইসব যুক্তির চরিত্র ছিল খানিকটা বিমূর্ত, 'যাত্রা'য় সেগুলি সরাসরি ভূমিদাস প্রথার সমস্যার সঙ্গে জড়িত।

'যাত্রা'য় রাদিশ্যেভ 'ভবিষ্যতের প্রকল্প' থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন। এই প্রকল্পে উল্লেখ করা হয়েছে যে স্বাভাবিক অবস্থায় সকলের ছিল একই রকম অধিকার, নিজেদের মধ্যে সবকিছুতে তারা ছিল সমান, কেউ কারো দ্বারা দমিত হত না। নাগরিক অবস্থায় লোকে 'সীমাহীন স্বাধীনতার' স্থলাভিষিক্ত করে 'তার শান্তিপূর্ণ ব্যবহারকে'। 'কিন্তু সবাই যদি নিজেদের

স্বাধীনতায় সীমারোপ ও ক্রিয়াকর্মে নিয়মবন্ধন করে থাকে, তাহলেও প্রাকৃতিক স্বাধীনতায় তারা মাতৃগর্ভ থেকে সমান, তার সীমারোপেও তাদের সমান হতে হবে। সুতরাং, এক্ষেত্রেও একজন অপরের ক্ষমতাধীন নয়। সমাজে প্রথম ক্ষমতাধর হল আইন; কেননা তা সবার পক্ষে একই' — পড়ি আমরা 'প্রকল্প'এ। পরে কৃষকের কথা বলা হয়েছে, যে 'শৃঙ্খলিত', 'বন্দিত্বের কষ্ট ভোগ করে' এবং দৃঢ় মত প্রকাশ করা হয়েছে যে 'দাসকরণ হল অপরাধ'*।

এইসব বিবেচনা থেকে রাদিশ্চেভ অতি সুদৃঢ় সিদ্ধান্ত টেনেছেন। উনি স্পষ্টতই ক্রেস্তিয়ানকিনের সঙ্গে একমত, যিনি মনে করেন, নাগরিককে যে বঞ্চিত করতে চাইবে 'নাগরিক উপাধি থেকে, সে তার শত্রু। নিজের শত্রুর বিরুদ্ধে সে আত্মরক্ষা ও প্রতিশোধ খোঁজে আইনে। আইন যদি তার পক্ষে দাঁড়াতে না পারে, অথবা তা যদি না চায়, কিংবা তার ক্ষমতা যদি আসন্ন বিপদের মুখে তাকে দ্রুত সাহায্য করতে না পারে, তাহলে নাগরিক আত্মরক্ষা, টিকে থাকা, সমৃদ্ধি লাভের প্রাকৃতিক অধিকার কাজে লাগায়। কেননা নাগরিক হয়ে গেলে সে আর মানুষ থাকে না এমন নয়, গঠন থেকেই উদ্ভূত যার প্রথম কর্তব্য হল আত্মরক্ষা, টিকে থাকা, সমৃদ্ধি লাভ।'** ক্রেস্তিয়ানকিনের মতে, পশুরূপী জমিদারকে হত্যাকারী কৃষককে 'অভিযুক্ত করা যায় না আইনে', কেননা তার পাশবিকতার কালে 'নাগরিককে রক্ষাকারী আইন ছিল সুদূরে, তার ক্ষমতা অনুভব্য ছিল না; তখন পুনর্জন্ম নেয় প্রকৃতির নিয়ম এবং বিগতকালে ক্ষতিগ্রস্ত নাগরিকের যে ক্ষমতা জারি করা আইন দ্বারা লঙ্ঘনীয় নয়, তা বলবৎ হয়েছে।'*** 'যাত্রা' থেকে উদ্ধৃত জায়গাগুলি প্রসঙ্গে দ্বিতীয় ইয়েকাতেরিনা বইয়ের পাতার ধারে নোট করেছিলেন: 'রচয়িতার ব্যাখ্যাগুলি কার্যকর নয়, আইনসঙ্গত নয়, ফাঁকা দার্শনিকতা'। সম্রাজ্ঞীর মতে, 'জাইৎসভো' অধ্যায়ে, যেখানে ক্রেস্তিয়ানকিনের যুক্তিগুলি আছে, তাতে বিধৃত হয়েছে 'ঠিক সেইসব' ভাবনা 'যার দরুন ফ্রান্সকে উল্টো করে দাঁড় করানো হয়েছে।'****

সর্ববিধ সম্পত্তি থেকে কৃষকদের বঞ্চিত করার প্রতিবাদ করেন রাদিশ্চেভ। নিজের 'আন্তরিক বন্ধুর' মুখ দিয়ে তিনি ক্রুদ্ধ বক্তব্য উপস্থিত

করেছেন: 'কিন্তু দখলের ব্যাপারে আদি সামাজিক অবস্থা থেকে কত সরে গেছি আমরা। আমাদের এখানে যার এই স্বাভাবিক অধিকার আছে, সে তা থেকে একেবারে বঞ্চিত তাই নয়, তদুপরি পরের জমিতে খেটে অন্যের ক্ষমতার ওপর নির্ভরশীল খাদ্য সংগ্রহ করে।'*

এই বিবেচনা থেকে রাদিশ্যেভ অতি দৃঢ়সংকল্প সিদ্ধান্ত টেনেছেন। কৃষকদের সমস্ত সম্পত্তি হরণ করেছে এমন এক অভিজাতের কথা বলে রাদিশ্যেভ রায় দিয়েছেন যে 'এই রক্তচোষার ধন তার নয়। তা জমেছে লুঠ করে। আইনে কঠোর শাস্তি তার প্রাপ্য।' তার চাষের হাতিয়ার-পত্র চুরমার করার, তার ঝাড়াইতলা, মাড়াইতলা, গোলাবাড়ি পুড়িয়ে দেবার ডাক দিয়েছেন তিনি, আর অভিজাতটিকে সামাজিক দস্যু বলে ঘোষণা করতে বলেছেন 'যাতে সবাই তাকে দেখে শুধু ঘেন্নাই করবে না, তার সান্নিধ্য থেকে পালাবেও, যাতে তার দৃষ্টান্তে সংক্রামিত না হয়'**।

ভূমিদাস কৃষকদের বিষয়ে রুশ আইনপ্রণয়নের তীব্র সমালোচনা করেছেন রাদিশ্যেভ। 'পিটার্সবুর্গ গুবের্নিয়ার বর্ণনা' পাণ্ডুলিপিতে, যা নিয়ে তিনি 'পিটার্সবুর্গ থেকে মস্কো যাত্রা' ছাপাবার জন্য তৈরি করার একই সময়ে খাটছিলেন বলে বোঝা যায়, তাতে রাদিশ্যেভ সরোষে প্রশ্ন করেছেন: 'মালিক যদি যতটুকু খুশি ততটুকু জমি কৃষককে দেবার ক্ষমতা রাখে, তাকে যত খুশি খাটাবার ক্ষমতা ধরে, তাহলে কিসের সঙ্গে এরূপ কৃষকের তুলনা সম্ভব? অন্তিম অপুষ্টি ও মৃত্যু থেকে তার একমাত্র পরিত্রাণ জমিদারের স্বার্থগৃধ্নুতা। এই তার রক্ষা।'***

'যাত্রা'য় আইনের ক্ষেত্রে ভূমিদাস কৃষকের জীবনের অসহায়তা বিষয়ে ভাবনা আরো তীক্ষ্ন: 'লুব্ধ জানোয়ার, অতৃপ্ত জোঁক — কী আমরা কৃষকদের জন্যে রেখে দিচ্ছি: যা ছিনিয়ে নেয়া যায় না — বাতাস। হ্যাঁ, শুধুই বাতাস। প্রায়ই আমরা ওর কাছ থেকে পৃথিবীর দান — শস্য ও জলই শুধু ছিনিয়ে নিই না, জীবনও কেড়ে নিই। — আইনে প্রাণহরণ নিষিদ্ধ, কিন্তু সেটা শুধু তাৎক্ষণিক প্রাণহরণ। কিন্তু কত পদ্ধতি আছে ক্রমিক

প্রাণহরণের!'* রাদিশ্যেভ বলেছেন যে অসহায় কৃষকদের ক্ষেত্রে জমিদার প্রায় সর্বশক্তিমান। 'কৃষকদের ব্যাপারে জমিদার হল আইনদাতা, বিচারক, নিজের সিদ্ধান্ত ও ইচ্ছার নির্বাহক, ফরিয়াদি, যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী কিছু বলার সাহস পায় না।'**

ভূমিদাস কৃষকের আইনী অবস্থার প্রশ্নে তিনি আবার ফেরেন সাইবেরিয়ায় নির্বাসন থেকে প্রত্যাবর্তনের পরে লিখিত 'এই আমার দখল, বিষয় আশয়, মহাল, গ্রাম, যা বলবেন বলুন, তার বর্ণনা' দানে। এখানে কৃষকের ব্যক্তিত্ব ও সম্পত্তির ওপর জমিদারের বিপুল অধিকারের বিস্তারিত তালিকা আছে।

সর্বাগ্রে রাদিশ্যেভ বলেছেন কৃষককে বিক্রি করে দেবার যে অধিকার জমিদারের আছে তার কথা। প্রকাশ্য দরাদরিতে কৃষক বিক্রয়ের যে নিষেধ আছে আইনে, তাকে তিনি উপহাস করেছেন, কেননা আইনের এই ধারা কোনোক্রমেই খোদ আইনের অমানুষিকতা রোধ করে না। রাদিশ্যেভ বলেছেন, জমিদার কৃষককে বেচে দিতে পারে 'পাইকারি অথবা খুচরো হারে। এটা রহস্য করে বলা হচ্ছে না: কেননা এই খুচরোটা হতে পারে মায়ের কাছ থেকে মেয়ে, বাপের কাছ থেকে ছেলে, এমনকি স্বামীর কাছ থেকে স্ত্রীকে বিক্রি।' এমন জমিদারও আছে (রাদিশ্যেভ তাদের ব্যঙ্গ করে বলেছেন মিতব্যয়ী) 'যারা কর্ষককে খাটিয়ে জীর্ণ করে তার বাকি শক্তিটা বেচে দেয়'***।

কৃষককে যত খুশি তত খাটাবারও অধিকার আছে জমিদারের। ১৭৯৭ সালের ৫ এপ্রিল জার প্রথম পাভেলের 'জমিদারের অধীনস্থ কৃষকের জমিদারের জন্য তিন দিন খাটুনি ও রবিবার বিনা বাধ্যবাধকতায় খাটুনি বিষয়ে' ঘোষণাপত্র সম্পর্কে অবিশ্বাস পোষণ করেন রাদিশ্যেভ। ঘোষণাপত্রের সমালোচনা করে তিনি বলেছেন যে তিন দিন বেগার খাটুনিটা কেবল জমিদারদেরকে উপদেশ। তদুপরি 'বর্তমানে এই ধারাটা খুব কার্যকর হবে না, কেননা কর্ষক ও গৃহদাস কারো অবস্থা সুনির্দিষ্ট করে দেয়া হয় নি।'**** জমিদারদের অধিকারের ফর্দ চালিয়ে গিয়ে রাদিশ্যেভ বলেছেন

যে জমিদার কৃষককে শাস্তি দিতে পারে 'নিজের বিবেচনা অনুসারে, সে তার বিচারক ও নিজ দণ্ডের নির্বাহক'; জমিদার 'তার সম্পত্তি ও সন্তানদের প্রভু, দেয় এবং কেড়ে নেয় নিজের মর্জি অনুসারে'। অতি সক্রোধে রাদিশ্চেভ লিখেছেন যে জমিদার 'বিয়ের ওপর কর্তৃত্ব করে, যেমন ইচ্ছা জুড়ি মেলায়; সুতরাং কর্ষক এই দিক থেকে একেবারে দাস।'*

অন্যদিকে, রাদিশ্চেভ যা মন্তব্য করেছেন, জমিদারের অধিকার অতি কম সংকুচিত। 'মালিক তার চাষিকে রাষ্ট্রীয় কর থেকে, অপরাধের জন্য শাস্তি থেকে মুক্তি দিতে পারে না, আত্মীয়কে বিয়ে করতে, লেণ্ট পরবে মাংস খেতে বাধ্য করতে পারে না।'**

ব্যবহারশাস্ত্রীয় যুক্তি ছাড়াও রাদিশ্চেভ ভূমিদাস প্রথার বিরুদ্ধে কতকগুলি অর্থনৈতিক যুক্তিও দিয়েছেন। তাঁর রচনার এই অংশটা ঘনিষ্ঠভাবে জুড়ে যায় দেসনিৎস্কির রচনার সঙ্গে। লক্ষণীয় যে 'আমার দখলের বর্ণনা' পাণ্ডুলিপিতে রাদিশ্চেভ ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেছেন দেসনিৎস্কি সংকলিত 'কৃষি উপদেষ্টা টমাস বউডেন' থেকে কৃষি ব্যবস্থাপত্র। দেসনিৎস্কিকে রাদিশ্চেভ অভিহিত করেছেন 'কৃষি বিষয়ে রুশী-ইংরেজ লেখক' বলে।

টমাস বউডেনের বইটা দেসনিৎস্কি নিয়েছিলেন কেবল ভিত্তি হিশেবে, অনেকখানি তাকে ঢেলে সাজেন। বইয়ের পাঠ পরিপূরণ করা হয়েছে কেবল অন্য ইংরেজ কৃষিবিজ্ঞানীদের রচনা দিয়ে নয়, অনেক জায়গা লিখেছেন তিনি নিজেই।

'উপদেষ্টা'র ভূমিকায় দেসনিৎস্কি লেখেন যে কৃষিতে 'সবাই লাগতে পারে, তাতে করে সম্পন্ন এবং ফলাও অবস্থায় পেঁাছনো যায়, যদি কোনো রাজনৈতিক অবস্থা বাধা না দেয়...।'*** জ্ঞানপ্রচারক ইংলণ্ডের কৃষির অত্যন্ত কদর করে মন্তব্য করেছেন: 'ইংলণ্ডে কৃষির পথে এখন কোনো রাজনৈতিক প্রতিবন্ধক নেই।'

কৃষিকর্মের নতুন পদ্ধতির বিবরণ দিয়ে দেসনিৎস্কি সাবধান করে দিয়েছেন যে রাশিয়ায় এগুলির প্রবর্তন করতে হবে খুব সতর্কতার সঙ্গে,

প্রথমে অল্প একটু ক্ষেতে পরীক্ষা করে, যদিও ভূমিকায় নিজেই তিনি বলেছেন যে পদ্ধতিগুলি কার্যক্ষেত্রে পরীক্ষিত, তাকে উপেক্ষা করলে অজ্ঞতাই প্রকাশ পাবে। স্পষ্টতই রুশ ব্যবস্থার সমালোচনা করে জ্ঞানপ্রচারক মন্তব্য করেছেন যে বর্ণিত কৃষি পদ্ধতির কয়েকটি রাশিয়ায় আদৌ প্রযোজ্য নয়।*

দেসনিৎস্কি এই কথায় জোর দিয়েছেন যে ইংলণ্ডে কৃষিকাজ চালায় ভূমিদাসেরা নয়, বেতনভোগী খেতমজুর। 'নতুন গ্রামের পত্তন প্রসঙ্গে' অধ্যায়ে, যা তিনি ইংরেজ লেখকের কাছ থেকে নিয়ে রুশ পরিস্থিতিতে প্রয়োগের জন্য অদল-বদল করেছেন, তিনি বলেছেন যে মজুর খাটাবার জন্য টাকা থাকা আবশ্যক।**

ভূমিদাসদের বেগার খাটুনি দিয়ে কৃষিকার্য চালাবার নিন্দা করেছেন জ্ঞানপ্রচারক। ইংলণ্ডের ব্যবস্থার বর্ণনা দিয়ে তিনি মন্তব্য করেছেন: 'ইংলণ্ডে যে হলকর্ষণ চলে তাতে তেমন সব দারোগা আর গোমস্তার প্রয়োজন হয় না যাদের নিয়ে রাশিয়ায় এমনকি প্রবচনই চালু হয়েছে: গ্রাম কিনো না, কেনো গোমস্তা। সমস্ত কৃষিকাজ সেখানে চলে স্বেচ্ছায়, সততার সঙ্গে, অবর্ণনীয় উদ্যোগ, সাফল্য, উন্নতিতে।'

দেসনিৎস্কি ছিলেন এই ধরনের চিন্তার কাছাকাছি যে কৃষিকর্মের নতুন পদ্ধতিতে ভূমিদাস প্রথার অবসান হওয়া উচিত। তিনি লেখেন যে কৃষিকর্ম 'গোটা ইউরোপকে... মুক্তি দান করেছে'। 'কৃষি উপদেষ্টা'তে যথেষ্ট প্রত্যয়জনকতার সঙ্গে ভূমিদাস প্রথার অর্থনৈতিক অসার্থকতা দেখানো হয়েছে, আঠারো শতকের ৮০-র দশকের গোড়ায় এটি ছিল ভূমিদাস প্রথার বিরুদ্ধে একটি বিখ্যাত আক্রমণ। সমসাময়িকেরা এই রচনার ঠিক সেইরূপ মূল্যায়নই করেছিলেন। 'সাংক্ত-পেতেরবুর্গস্কি ভেস্ত্নিক' (সেণ্ট-পিটার্সবুর্গ বার্তাবহ) পত্রিকার সমালোচক কী দক্ষতার সঙ্গে অনুবাদ করা হয়েছে যেন তা দেখাবার ছলে 'উপদেষ্টা...' থেকে এমন একসারি উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন যাতে পরোক্ষে ভূমিদাস প্রথার নিন্দা করা হয় এবং স্পষ্টতই যা ইংরেজ কৃষিবিজ্ঞানী বউডেনের লেখা নয়।

ভূমিদাস প্রথাকে সমালোচনা করার যে পদ্ধতি দেসনিৎস্কি অবলম্বন করেছিলেন, তা পুনরায় ব্যবহৃত হয় ১৭৮৪ সালে 'একোনমিচেস্কি মাগাজিন'এ (অর্থনৈতিক পত্রিকা) প্রকাশিত কারাচেভো জেলার সস্কোভো গ্রামের জনৈক

'কৃষিকর্মীর' লেখা 'আমাদের স্বদেশ ও ততোধিক কারাচেভোর পশুপালন ও কৃষির অঞ্চলগুলিতে অসাম্য সম্পর্কে মন্তব্য' নামক প্রবন্ধে। ব্রিটিশ ও রুশ কৃষির তুলনা এখানে করা হয়েছিল কৃষকদের সম্পত্তি ও মুক্তি দেবার আবশ্যকতা প্রতিপাদনের উদ্দেশ্যে।

আমরা যেসব কথা বললাম, তাতে 'আমার দখলের বর্ণনা'য় ইংলণ্ডীয় ও রুশ কৃষির যে তুলনা রাদিশ্যেভ করেছেন, তাকে নতুন চোখে দেখতে হয়। তার চরিত্র মোটেই আপাতিক নয়। এই তুলনাগুলি করে রাদিশ্যেভ রুশ সাহিত্যে যথেষ্ট সুপ্রতিষ্ঠিত একটা ঐতিহ্যকেই অনুসরণ করেছেন। তাঁর পূর্ববর্তীদের মতোই এগুলি ভূমিদাস প্রথার বিরুদ্ধে চালিত।

ভূমিদাস প্রথার বিরুদ্ধে রাদিশ্যেভের একটা মৌল অর্থনৈতিক যুক্তি হল তার শ্রমের নিম্ন উৎপাদনশীলতার উল্লেখ। 'স্বাধীনতা' গাথায় তিনি লিখেছেন: 'দাসোচিত লালনের আশ্রয়ে স্বর্ণ ফল ফলে না'।* 'পিটার্সবুর্গ থেকে মস্কো যাত্রা'য় নিজের খেতে সোৎসাহে খাটছে এমন এক চাষি পরিব্রাজককে বলে যে বাবুর খেতেও 'এমনি খাটলে পাপ হবে'**।

'ভবিষ্যতের প্রকল্প'এ ভূমিদাস প্রথার অর্থনৈতিক অসার্থকতা নিয়ে বিস্তারিত বিচার আছে। রাদিশ্যেভ তাঁর 'আন্তরিক বন্ধুকে' প্রকল্পের রচয়িতা বলে ঘোষণা করেছেন, কিন্তু স্বনামে রাদিশ্যেভ উপরোক্ত যে কথাগুলি বলেছেন, তা 'প্রকল্প'এ ঘোষিত চিন্তার সমধর্মী। এখানে বলা হয়েছে, মানবিক ক্রিয়াকলাপের প্রধান প্রেরণা হল স্বার্থপরতা, লাভ। 'এই স্বাভাবিক প্রেরণার অনুসরণে যেসব কাজ হাতে নিই নিজের জন্যে, যাকিছু করি বিনা হুকুমে, তা সব করি অধ্যবসায়ের সঙ্গে, সযত্নে, ভালোভাবে। এর বিপরীতে, যেসব কাজ আমাদের নিতে হয় পরাধীনে, যাকিছু আমরা করি নিজের লাভের জন্যে নয়, তা করি অমনোযোগে, আলস্যে, গোঁতোমি করে, খুঁত রেখে। আমরা কৃষিজীবীরা এই দেখি আমাদের রাষ্ট্রে।'***

'প্রকল্প'এ এই কথায় জোর দেয়া হয়েছে যে ভূমিদাসভিত্তিক সমাজে ভূমি ও উৎপাদন দ্রব্য বণ্টনের পরিণাম হয় শ্রমের নিম্ন উৎপাদনশীলতা। 'প্রকল্প'এ আমরা পড়ি: 'ওদের (ভূমিদাসদের — অনুঃ) খেতটা অপরের, সে

এ খেতের ফলের মালিক নয়। সেইজন্য তা চষে কুঁড়েমি করে; কৃতকর্ম অবহেলায় পড়লে তাদের দুঃখ হয় না।' 'আধপেটা খিদে মেটাবার জন্যে দাম্ভিক মালিক কর্তৃক কর্মীকে' প্রদত্ত খেতটায় কিন্তু কাজ চলে সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে। এখানে কৃষক তার মেহনতে কুণ্ঠা করে না। 'কাজ থেকে কিছুই তার মনোযোগ বিক্ষিপ্ত করে না। সময়ের নিষ্ঠুরতা সে কাটিয়ে ওঠে রাত জেগে; বিশ্রামের ঘণ্টাগুলো সুনির্দিষ্ট, তা যায় মেহনতে; ফুর্তি করার দিনগুলো সুনির্দিষ্ট, তাকে সে এড়িয়ে যায়। কেননা কাজের চাড় তার নিজের জন্যে, খাটছে নিজের জন্যে, কাজ করছে নিজের স্বার্থে। তাই তার খেত তাকে অঢেল ফল দেয়।'*

রাশিয়ার দারিদ্র্যের কারণ রাদিশ্চেভ দেখেছিলন ভূমিদাস প্রথায়। তাঁর মতে, দেশের ঐশ্বর্য বহির্বাণিজ্যের ওপর নির্ভর করে না, যা মনে করত বাণিজ্যপন্থীরা, সর্বাগ্রে তা নির্ভর করে কৃষির উন্নতির ওপর। অথচ যে ভূমিদাস প্রথা বিদ্যমান রয়েছে, রাদিশ্চেভ মনে করেন, তা এতে বাধা দিচ্ছে।

রাদিশ্চেভ যেসব চিন্তা ব্যক্ত করেছেন অর্থনীতিবিদ্যার অবস্থান থেকে তা ভূমিদাস প্রথার সমালোচনাকে নতুন একটা উচ্চতর স্তরে তুলে দিয়েছে। সোভিয়েত ব্যবহারশাস্ত্রী ব. আ. সিরোমিয়াৎনিকভ সঠিক বলেছেন, 'ইয়েকাতেরিনার সাম্রাজ্য রাদিশ্চেভের কাছে মনে হয়েছিল ভয়ংকর রোগাক্রান্ত, যা তাকে অর্থনৈতিক দেউলিয়া অবস্থা, জন অভ্যুত্থানের বিপদের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। জনগণের ঐশ্বর্য ও শ্রমের নির্লজ্জ অপচয়ে... রাদিশ্চেভ আরো একবার দাসমালিকানায় নিহিত অভিজাত ভূসম্পত্তি প্রথার সামাজিক বিপদকে দেখিয়ে দেন বিশেষ জোরের সঙ্গে।'**

আঠারো শতকের ৬০-৮০-র দশকের রুশ জ্ঞানপ্রচারকদের ঐতিহ্য অনুসরণে রাদিশ্চেভ ভূমিদাস প্রথার বিরুদ্ধে নৈতিক যুক্তিতেও মনোযোগ অর্পণ করেন। 'পেশ্নাকি' অধ্যায়ে কৃষক কুটিরের দীনহীন সামগ্রীর বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে তিনি ক্রুদ্ধ চিৎকার করে উঠেছেন: 'ন্যায্যত একেই গণ্য করতে হয় রাষ্ট্রীয় প্রাচুর্য, শক্তি, পরাক্রমের উৎস বলে'***। 'মেদনয়ে' অধ্যায়ে

রাদিশ্যেভ কৃষক বিক্রয়ের হৃদয়বিদারক চিত্র দিয়েছেন। যে ভবনে কেনা-বেচা চলে সেখানে যাওয়ার উপক্রম করছেন তাঁর এক বিদেশী বন্ধু, তাঁকে উদ্দেশ করে তিনি বলেছেন: 'ফেরো... লজ্জাকর ঘটনার সাক্ষী হ'য়ো না। তোমার স্বদেশের দূরবর্তী অঞ্চলে পরাধীন কালাদের বিক্রয়ের বর্বর প্রথাকে তুমি একসময় অভিশাপ দিয়েছিলে; ফেরো... আমাদের রাহুগ্রাসের সাক্ষী হ'য়ো না এবং তোমার স্বদেশবাসীকে আমাদের রীতিনীতি প্রসঙ্গে আমাদের লজ্জার কথা জানিও না।'*

'ভবিষ্যতের প্রকল্প'এও ভূমিদাস প্রথার বিরুদ্ধে পুরো একসারি নৈতিক যুক্তি আছে। 'আন্তরিক বন্ধুর' নামে রাদিশ্যেভ বলছেন যে 'কর্ষকেরা অদ্যাবধি আমাদের দাস; আমরা তাদেরকে আমাদের সঙ্গে সমান সহনাগরিক বলে দেখি না, তাদের মধ্যে মানুষকে ভুলে গেছি'**। লোককে পরাধীন করাকে এখানে পাশবিক প্রথা বলা হয়েছে, যাতে সূচিত হচ্ছে 'পাথর হয়ে যাওয়া হৃদয়, প্রাণের একেবারে অনুপস্থিতি'***।

রাদিশ্যেভ স্পষ্টতই বিশ্বাস করতেন না যে ভূমিদাস প্রথার বিরুদ্ধে তাঁর নৈতিক যুক্তিতে অভিজাতদের চৈতন্যোদয় হবে। 'ভবিষ্যতের প্রকল্প'এ সেটা বিশেষ উজ্জ্বল রূপে প্রকাশ পেয়েছে, যেখানে নৈতিক উদ্ঘাটনের সঙ্গে সঙ্গে চলেছে ভূমিদাস মালিকদের প্রতি ভীতি প্রদর্শন: 'দেখতে পাচ্ছ না... কী ধ্বংস আমাদের সামনে, কত বিপদের মধ্যে আমরা পড়ছি। দাসেদের সমস্ত অনুভূতি কর্কশ হয়ে গেছে, স্বাধীনতার শুভ স্থায়ী গতি দিলে অন্তরের অনুভূতিশীলতা দৃঢ় ও উন্নত হবে। বন্যার স্রোত অবরুদ্ধ, তার বিরোধিতা যত দৃঢ় হবে তত তা হবে শক্তিশালী। একবার বাঁধ ভেঙে বেরুলে কিছুই তার প্লাবন রোধ করতে পারবে না। বেঁধে রাখা আমাদের ভাইয়েরা হল এইরকম। সময় আর সুযোগের অপেক্ষায় আছে। ঘণ্টা বাজবে। পাশবিকতার এই ধ্বংসস্রোত বইবে খরবেগে। আমাদের চারপাশে আমরা দেখব তরবারি আর সর্বনাশ। আমাদের কঠোরতা ও অমানুষিকতার জন্য আছে মৃত্যু ও অগ্নিদাহ। আমরা তাদের বন্ধনমুক্তিতে যত দেরি করেছি, কঠোর হয়েছি, প্রতিহিংসায় তারা হবে ততই উদগ্র।'**** জমিদারদের

প্রতি এই হ্মকিতে উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠেছে রাদিশ্চেভের রচনার একটা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য, যাতে সূচিত হয়েছে আঠারো শতকের ৬০-৮০-র দশকের জ্ঞানপ্রচারকদের, বিশেষ করে নোভিকভের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য। ভূমিদাস প্রথার নৈতিক সমালোচনাকে রাদিশ্চেভ কখনই মুখ্য করে রাখেন নি। বিপ্লবী গণতন্ত্রী ন. গ. চের্নিশেভস্কির সহযোদ্ধা বিপ্লবী গণতন্ত্রী ম. আ. আন্তনোভিচের যথার্থ উক্তি অনুসারে, নোভিকভ হলেন নীতিবাদী, ব্যক্তির ভাগ্য উন্নয়ন তাঁর লক্ষ্য, আর রাদিশ্চেভ — প্রাবন্ধিক, সমাজের, সামাজিক ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য চেষ্টিত।

রাশিয়ায় ভূমিদাস প্রথা বিলোপের সমস্যা সমাধানের দুটি পথ নির্দেশ করেছেন রাদিশ্চেভ। প্রথমটি হল তাঁর 'আন্তরিক বন্ধু' কৃত প্রকল্পে নিবদ্ধ সংস্কারের পথ। এই প্রকল্প তার বহু খুঁটিনাটিতে মিলে যায় আঠারো শতকের ৬০-৮০-র দশকের রুশ জ্ঞানপ্রচারকদের প্রকল্প, বিশেষ করে স. ইয়ে. দেসনিৎস্কি, আ. ইয়া. পলেনভ এবং 'কৃষির সুদৃঢ় প্রসারের জন্য কী হতে পারে বা হওয়া উচিত কর্ষকের সম্পত্তি ও উত্তরাধিকার?' — এই প্রশ্নের জবাবে 'স্বাধীন অর্থনৈতিক সমিতি'তে আসা জবাবগুলির মধ্যে অনামা একটি পাণ্ডুলিপির (৭১ নং) লেখকের প্রস্তাবের সঙ্গে।

'যাত্রা'য় সর্বাগ্রে প্রস্তাব করা হয়েছে 'ভূমিদাস ও গৃহদাসের' মধ্যে পার্থক্য করার জন্য। ভূমিদাস কৃষককে গৃহদাস হিশেবে নেয়া চলবে না, যদি নেয়া হয় তবে তাকে মুক্তি দিতে হবে। কৃষকদের মধ্যে বিবাহাদি ঘটবে জমিদারের সম্মতি ছাড়াই।

'যাত্রা'য় দ্বিতীয় যে ব্যবস্থার উল্লেখ করেছেন রাদিশ্চেভ, সেটা কৃষকদের সম্পত্তি ও অধিকার রক্ষা নিয়ে। যে জমি তারা চাষ করছে, সেটা হওয়া উচিত তাদেরই সম্পত্তি। কৃষককে হতে হবে 'তার সমানদের' দ্বারা বিচার্য। 'মালিককে মুক্তির একটা নির্দিষ্ট টাকা দিলে অবাধ স্বাধীনতা অর্জন মঞ্জুর' করা উচিত। 'বিনা বিচারে নিজের মর্জিতে শাস্তিদান' নিষিদ্ধ করতে হবে। এইসব প্রাথমিক ব্যবস্থা গ্রহণের পরে ভূমিদাস প্রথা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করতে হবে। 'এর পর পুরোপুরি উচ্ছেদ করা উচিত এই দাসত্বের,' লিখেছেন রাদিশ্চেভ।*

কিন্তু রাদিশ্চেভের সামাজিক আদর্শ কেবল ভূমিদাস প্রথা উচ্ছেদেই

পর্যবসিত নয়। জমিদারির সম্পূর্ণ উচ্ছেদ এবং সমস্ত জমি কৃষকদের হাতে তুলে দেবার স্বপ্ন দেখেছিলেন তিনি। রাদিশ্যেভ লিখেছেন:

'...মুক্তির প্রেরণায় কবোষ্ণ ক্ষেত,
বিনা অশ্রুজলে ভরা ফসলিয়া জমি
সকলেই বোনে নিজে, তোলে নিজে নিজে'*।

সাহিত্যে রুশ গ্রামে জমির সামাজিক মালিকানার বর্ণনা রাদিশ্যেভই প্রথম দেন। কৃষকদের মধ্যে যে রেওয়াজ দানা বেঁধেছে তাতে উচ্ছ্বসিত হন তিনি। মনীষী লিখেছেন: 'আমাদের কালে কে ভাবতে পেরেছিল যে রাশিয়ায় তাই ঘটছে যা খুঁজেছিলেন প্রাচীন কালের শ্রেষ্ঠ আইনদাতারা, আধুনিকেরা যা নিয়ে ভাবে না।'** রাদিশ্যেভ দেখতে পেয়েছিলেন যে জমির পুনর্বণ্টনে তার উর্বরতা বৃদ্ধিতে বাধা হবে, তাহলেও তার পক্ষ নেন এই মন্তব্য করে যে 'যদিও এটা কৃষির পক্ষে খুব খারাপ, কিন্তু সমতার পক্ষে ভালো'' ***। রাদিশ্যেভের কৃষি কর্মসূচিতে গ্রামসমাজভিত্তিক কৃষিকর্ম বজায় রাখার কথা আছে।

নিজের সামাজিক আদর্শ প্রসঙ্গে রাদিশ্যেভ অনবরত সমতা সমর্থনের প্রয়োজনীয়তায় জোর দিয়েছেন, কিন্তু সেইসঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পত্তি রক্ষার কথাও বলেছেন। এতে করে তাঁর ভাবনাকে বলা যেতে পারে সমমাত্রিক। সমমাত্রিক তত্ত্বে প্রকাশ পেয়েছিল সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামে কৃষকদের স্বার্থ। কিন্তু সমমাত্রাবাদীরা বোঝে নি যে ব্যক্তিগত সম্পত্তি টিকিয়ে রাখলে অনিবার্যতই সম্পত্তিগত অসাম্য দেখা দেবে, ক্ষুদ্র, শ্রমগত সম্পত্তির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সমাজের কোনো সুদৃঢ়তা থাকে না।

রাদিশ্যেভের রাজনৈতিক তত্ত্বের একটা কেন্দ্রস্থলে আছে স্বৈরতন্ত্রের সমালোচনা। 'স্বৈরতন্ত্র' কথাটার ওপর যে প্রখ্যাত মন্তব্য তিনি করেন, তাতে বলেছেন 'স্বৈরতন্ত্র হল মানবিক প্রকৃতির সর্বাধিক বিরোধী একটা অবস্থান'****।

'রাজতন্ত্র' শব্দটি রাদিশ্যেভ ব্যবহার করেছেন রুসোর সঙ্গে একই অর্থে। রাদিশ্যেভ ও রুসোর দৃষ্টিভঙ্গির মিল এসেছে এই থেকে যে উভয়েই তাঁরা ছিলেন জনগণের সার্বভৌমত্ব তত্ত্বের পক্ষপাতী। 'নাগরিকদের সমষ্টিকে বলা হয় গণ; জনগণের সমষ্টিগত ক্ষমতা হল প্রাথমিক ক্ষমতা, সুতরাং সে ক্ষমতা সর্বোচ্চ, একক, সমাজ দেহ গড়বার বা ভাঙবার শক্তিসম্পন্ন,' লিখেছেন রাদিশ্যেভ।* একাধিক বার তিনি এই কথায় জোর দিয়েছেন যে 'সার্বভৌম হল জন সমাজের প্রথম নাগরিক'**। এই প্রসঙ্গে, 'ফিওদর ভাসিলিয়েভিচ উশাকভের জীবনী' থেকে যা দেখা যায়, সার্বভৌম, অর্থাৎ সমাজকে যা চালিত করে 'শুভ অন্তিমে' এবং 'যে অভিশাপে সমাজ পতিত হতে পারে' তাকে দূর করে এমন সংস্থা হতে পারে যেমন একজন ব্যক্তি, তেমনি বিশেষ একটা মণ্ডলী। 'এই ক্ষমতাধর ব্যক্তিকে একক ও সমষ্টিগত রূপে সার্বভৌম বলা হয়,' লিখেছেন রাদিশ্যেভ।***

রাশিয়ার সে সময়কার সরকারি ভাবাদর্শে একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান নিয়েছিল রুসোর এই ভাবনা যে সুবিস্তৃত রাষ্ট্রে রাজতন্ত্র হল সরকারের সবচেয়ে উপযুক্ত রূপ।**** যেমন, নিজের 'আদেশ'এর ১০ ও ১১ ধারায় দ্বিতীয় ইয়েকাতেরিনা লেখেন: 'রুশ সাম্রাজ্যের মতো ভূখণ্ডের বিশালতায় সেই ব্যক্তির মধ্যে স্বৈরতান্ত্রিক ক্ষমতা ধরে নিতে হয় যে ব্যক্তি একে শাসন করছে... অন্য যেকোনো শাসন রাশিয়ার পক্ষে শুধু ক্ষতিকর নয়, পরিণামে ধ্বংসাত্মক।' রুসোর এই ভাবনার তীব্র বিরোধিতা করেন রাদিশ্যেভ এবং বলেন যে রুসো 'ইতিহাসকে সাহায্যে না নিয়ে এই কল্পনা করেন যে সুশাসন হতে পারে ছোটো দেশে, বড়োগুলিতে হওয়া উচিত বলপ্রয়োগ,'***** তাতে তিনি অনেক ক্ষতি করেছেন। লক্ষণীয় যে এই ক্ষেত্রে রাদিশ্যেভ রুসো ব্যবহৃত 'রাজতন্ত্র' কথাটি ব্যবহার না করে তার বদলে বসিয়েছেন 'বলপ্রয়োগ'।

নিজের রচনায় রাদিশ্যেভ স্বৈরতন্ত্রকে কষাঘাত করেছেন সরোষে।

'উঁচু করো দাম্ভিক ললাট,
হাতে লৌহ রাজদণ্ড নিয়ে,
বজ্রাসিংহাসনে বসো, জার,
জনগণে দেখো তুচ্ছ জীব।
জীবন-মরণ মোর হাতে:
'কৃপা করি যত পাষণ্ডকে;
'দিতে পারি ক্ষমতা ও বল;
'যদি হাসি, হাসে সকলেই;
'ভ্রূকুটিতে কাঁপে থরোথরো;
'বেঁচে থাকো, যদি বাঁচতে বলি',

লিখেছেন তিনি 'স্বাধীনতা' গাথায়।*

রাদিশ্যেভ দেখিয়েছেন যে রাজার স্বেচ্ছাচার থেকে দেখা দেয় রাষ্ট্রের সমস্ত পদাধিকারীর স্বেচ্ছাচার। যেমন, 'ফিওদর ভাসিলিয়েভিচ উশাকভের জীবনী'তে তিনি লিখেছেন: 'অনুসরণীয় আইন যার নেই, নিজের মর্জি বা খেয়াল ছাড়া এমনকি কোনো নিয়মও যে মানে না, এমন সার্বভৌমের স্বেচ্ছাচারের দৃষ্টান্ত প্রতিটি কর্মকর্তাকে ভাবতে প্রণোদিত করে যে সীমাহীন ক্ষমতার ভাগ ব্যবহার করে সেও নিজের ক্ষেত্রে তেমনি ক্ষমতাধর যেমন উনি সবার ক্ষেত্রে'।** 'এটা স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের প্রায় সর্বক্ষেত্রে.'*** জোর দিয়ে বলেছেন রাদিশ্যেভ।

এই কথায় তিনি আবার ফেরেন 'যাত্রা'র 'চুদভো' অধ্যায়ে।

রাদিশ্যেভ ভালোই জানতেন যে রাজার ক্ষমতা সীমাহীন নয়। রাজার সিদ্ধান্ত পূর্বনির্ধারিত হয়ে থাকে উত্তরাধিকারী অভিজাতদের ইচ্ছায়। এ প্রসঙ্গে খুবই উল্লেখযোগ্য 'ভবিষ্যতের প্রকল্প' রচয়িতার এই উক্তি যে বংশসূত্রে অভিজাত সম্প্রদায় ভূমিদাস প্রথা উচ্ছেদে বাধা দিচ্ছে। 'প্রকল্প'এ আমরা পাড়ি: 'আমাদের ক্ষমতাধর পূর্বপুরুষেরা তাঁদের রাজদণ্ডের প্রতাপ সত্ত্বেও নাগরিক পরাধীনতার বেড়ি ভাঙতে অক্ষম হয়েছেন। নিজেদের শুভ সংকল্প পূরণ করতে তাঁরা তো পারেনই নি, বরং রাষ্ট্রে প্রচলিত রাজপুরুষ

ব্যবস্থার কারসাজিতে তাঁদের নিয়মের সুবিবেচনা মর্মের বিপরীতে যেতে বাধ্য হন।'*

'যাত্রা'র 'স্পাস্কায়া বনভূমি' অধ্যায়ে 'ক্ষমতায়, সিংহাসনে উপবিষ্ট' কে-একজনের হঠাৎ চোখ খুলে যায় এবং সে বুঝতে পারে যে তার আদেশগুলো কার্যনির্বাহকেরা বিকৃত করছে। সে বলে: 'আমার আদেশের আসল দিকটায় মন না দিয়ে হয় তা একেবারে অমান্য করা হয়েছে, নয় তা কোনো একটা অর্থে পর্যবসিত ও ধীরে পালিত করায় বাঞ্ছিত ফল পাওয়া যায় নি। আমার দয়াকে করা হয়েছে বেচা-কেনার জিনিস, যে বেশি দাম দিয়েছে, তার উদ্দেশেই ঠক ঠক করেছে করুণা ও মহানুভবতার হাতুড়ি।'**

রাজা ও রাজতন্ত্র সম্পর্কে রাদিশ্যেভের যুক্তিগুলির মূল্যায়ন করে দ্বিতীয় ইয়েকাতেরিনা সঠিক মন্তব্যই করেছিলেন: 'রচয়িতা জারকে ভালোবাসে না এবং যে জায়গায় তার প্রতি ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা হ্রাস করা সম্ভব, বিরল স্পর্ধায় সে জায়গাগুলো লোভীর মতো আঁকড়ে ধরে।'***

কৃষক বিপ্লবের প্রস্তাব রাদিশ্যেভের একটা বড়ো কীর্তি। আঠারো শতকের অগ্রণী মনীষীরা সামাজিক জীবন পুনর্গঠনের বৈপ্লবিক উপায়ে সাধারণত হয় আপত্তি করেছেন নয় তার ফলাফল সম্পর্কে অন্তত সংশয় প্রকাশ করেছেন। এমনকি রুসোর মতো জন-সার্বভৌমত্বের সঙ্গতিশীল পক্ষপাতী, যিনি স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থানকে আইনসঙ্গত বলেছেন, তিনিও মনে করেছেন যে 'গৃহযুদ্ধের সর্বগ্রাসী শিখায়' সর্বদা উপকার হয় না: 'হাঙ্গামা... জনগণকে ধ্বংস করতে পারে, বিপ্লবের পক্ষে তার পুনর্জন্ম দেয়া আর সম্ভব হয় না; তাদের বেড়ি ভেঙে পড়া মাত্রই নিজেই তারা ভেঙে পড়ে, জনগণ হিশেবে আর বিদ্যমান থাকে না। তখন তার প্রয়োজন হয় আদেশদাতার, মোটেই কোনো মুক্তিদাতার নয়।'****

পূর্বসূরীদের থেকে রাদিশ্যেভের পার্থক্য এই যে তিনি নির্দ্বিধায় বিপ্লবের ঔচিত্য মেনেছেন, যেমন ব্যবহারশাস্ত্রীয়, তেমনি নৈতিক যুক্তি দিয়ে প্রতিপন্ন করেছেন এই থিসিস।

আঠারো শতকে এই মত খুবই প্রচলিত ছিল যে গণ-বিপ্লব কেবল

একটা বিধ্বংসী শক্তি, সৃষ্টি করতে তা অক্ষম। গণ-বিপ্লবের সৃষ্টিশীল সম্ভাবনায় সন্দেহ দৃঢ়ভাবে খণ্ডন করে তিনি বলেন যে জনসাধারণ নিজেদের মধ্যে থেকে এমন নেতাদের তুলে ধরতে সমর্থ, যারা তাদেরকে বিজয়ে পৌঁছে দেবে। 'অহো, গুরুভার বন্ধনে ক্লিষ্ট দাসেরা যদি তাদের হতাশায় ক্রুদ্ধ হয়ে তাদের স্বাধীনতার প্রতিবন্ধক লোহাটা দিয়ে আমাদের মাথাগুলো, ওদের অমানুষিক প্রভুদের মাথাগুলো চূর্ণ করে ও আমাদের রক্তে রঞ্জিত করে তাদের খেত! তাতে কী ক্ষতি হবে রাষ্ট্রের? নিপীড়িত জাতির রক্ষার্থে অচিরেই তাদের মধ্যে থেকে বহির্গত হবে মহান পুরুষেরা: কিন্তু নিজেদের সম্পর্কে তাদের চিন্তা হবে অন্যরকম এবং নিপীড়নের অধিকার থেকে তারা হবে বঞ্চিত।'*

সমাজজীবনের বৈপ্লবিক পরিবর্তনকে রাদিশ্চেভ দেখেছেন সমাজতাত্ত্বিক নিয়মসঙ্গতির প্রকাশ বলে। তাঁর মতে, সামাজিক জীবন বিকশিত হয় বৃত্তাকারে, স্বাধীনতার স্থান নেয় অত্যাচার, বিপ্লবের ফলে পুনরায় অত্যাচারের স্থান নেয় স্বাধীনতা।**

'এই হল প্রকৃতির বিধি,
অপরিবর্তনীয় সদা,
সর্বজন অধীনস্থ তার,
অলক্ষ্যে চালিত করে সে-ই;
অত্যাচার ভুলে যায় সীমা,
বিষে পরিপূর্ণ তার তীর,
না দেখে নিজেকে বিদ্ধ করে;
মৃত্যুদণ্ড দিয়ে সাম্য জাগে;
ক্ষমতাকে হস্তচ্যুত করে,
নবায়িত করে অধিকার.'

রাদিশ্চেভ লিখেছেন তাঁর 'স্বাধীনতা' গাথায়।*** রাদিশ্চেভের কাছে বিপ্লব একটা অবিরাম সক্রিয় প্রথা। এই বিপ্লবের গতিপথেই জনগণ তাদের সার্বভৌমত্ব কার্যকর করে।

কৃষক বিপ্লবের ভাবনা উপস্থিত করলেও তা শীঘ্র অনুষ্ঠিত হবে, এমন বিশ্বাস রাদিশ্যেভের ছিল না।

কৃষক বিপ্লবের একটা চিত্র দিয়ে 'যাত্রা'য় তিনি মন্তব্য করেছেন: 'এটা স্বপ্ন নয়, কিন্তু আমাদের ভবিষ্যৎকে আড়াল করা কালের ঘন যবনিকা ভেদ করে দৃষ্টি; পুরো শতাব্দী পেরিয়ে আমি দেখছি'।*

রাদিশ্যেভ বুঝতেন যে সংগ্রামটা হবে কঠিন, কেননা 'নাছোড়বান্দা ক্ষমতা তার মৃত্যুকালে... সমস্ত শক্তি নিয়োগ করবে।' তবে বিপ্লবের বিজয়ে তিনি ছিলেন নিঃসন্দেহ। 'মানবজাতি শৃঙ্খলের মধ্যে পরিণত হয়ে উঠে এবং স্বাধীনতার আশা ও প্রকৃতির অলঙ্ঘ্য নিয়মে চালিত হয়ে এগিয়ে যাবে... ক্ষমতা কেঁপে উঠবে... তখন গুরুভার ক্ষমতা মিলিয়ে যাবে এক মুহূর্তে', এই ছিল রাদিশ্যেভের স্বপ্ন।**

অসাধারণ এই মনীষী বুঝেছিলেন যে সফল বিপ্লবকে প্রস্তুত করা দরকার।

তবে কৃষকদের ভাগ্যে উন্নতি না ঘটিয়ে বিপ্লবের জন্য অপেক্ষা করতে রাদিশ্যেভ পারেন নি। এই থেকেই এসেছে সংস্কার ও বিপ্লবের মধ্যে তাঁর দোলায়মানতা। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে 'ভবিষ্যতের প্রকল্প'এ ভূমিদাসদের ক্রমিক মুক্তির যে পরিকল্পনা দেয়া হয়েছে, তাতে তিনি কোনো আপোস করেন নি, কৃষকদের পরিপূর্ণ মুক্তি ও কর্ষিত জমি তাদের নিকট হস্তান্তরের দাবি করেছেন।

আরো একটা দিক খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সংস্কারের যে পরিকল্প রাদিশ্যেভ দিয়েছেন, তাতে তাঁর সমমাত্রিক আদর্শ রূপায়ণের কথা নেই। একথা মনে করার সঙ্গত কারণ আছে যে মনীষী সে আদর্শ রূপায়ণের কথা ভেবেছিলেন কেবল গণ-বিপ্লবের মাধ্যমে।

রাদিশ্যেভের সামাজিক আদর্শ শুধু অভিজাতদের স্বার্থ নয়, রাজার অধিকারকেও স্পৃষ্ট করেছে। সেই সঙ্গে রাদিশ্যেভ এই কথায় জোর দিয়েছেন যে 'এমন উদাহরণ নেই এবং পৃথিবীর শেষাবধি পাওয়া যাবে না যে সিংহাসনে উপবিষ্ট জার স্বেচ্ছায় তার কিছু ক্ষমতা ত্যাগ করছে।'***

রাদিশ্যেভের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি বোঝার পক্ষে ব্রিটিশ, আমেরিকান ও ফরাসি বিপ্লব প্রসঙ্গে তাঁর অবস্থানটা জানা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

ক্রমওয়েলের একনায়কত্বের নিন্দা করেছেন রাদিশ্যেভ, বলেছেন যে তিনি বিপ্লবের প্রগতিশীল বিকাশের প্রতিবন্ধকতা করেছেন।

'ক্রমওয়েল, পাষণ্ড তুমি, এই ভাবি আমি...
দৃঢ়হস্তে স্বাধীনতা করেছ দলন...,'

লিখেছেন তিনি 'স্বাধীনতা' গাথায়।* তবে ক্রমওয়েল ব্যক্তিত্বের এই নেতিবাচক দিকটাতেই তিনি থেমে যান নি:

'তবুও তো জনে মনে ঘুরে ঘুরে তুমি
শিখিয়েছ জনগণে প্রতিশোধ নিতে,
আদালতে প্রাণদণ্ড দিয়েছ চার্লসকে'।**

গণ-বিপ্লবের গতিপথে স্বৈরাচারীর প্রাণদণ্ডের ধারণাটা একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান নিয়েছে 'স্বাধীনতা' গাথায়। জনগণের সার্বভৌম অধিকারের প্রতিটি লঙ্ঘনকেই গুরুতর অপরাধ বলে গণ্য করা হয়েছে।

'হুল ফুটানোর স্পর্ধা করিয়াছ তুমি,
'একটা মরণ তার পক্ষে বড়ো কম,
মরো তুমি! মৃত্যু, মৃত্যু, মৃত্যু শতবার!'

উৎখাত স্বৈরাচারীর উদ্দেশে গাথায় চিৎকার করে উঠেছে জনগণ।***

ইংলণ্ডের উত্তর আমেরিকান উপনিবেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে অভিনন্দন জানান রাদিশ্যেভ। 'তব প্রভু — স্বাধীনতা, ওয়াশিংটন,' লিখেছেন তিনি 'স্বাধীনতা' গাথায়।****

'পিটার্সবুর্গ থেকে মস্কো যাত্রা'য় রাদিশ্যেভ পেনসিলভানিয়া, ভার্জিনিয়া প্রভৃতি স্টেটের সংবিধান থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন সহানুভূতি দেখিয়ে, যেখানে নিবদ্ধ আছে বাক্ ও মুদ্রণের স্বাধীনতা।

সেইসঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমাজব্যবস্থা ছিল রাদিশ্যেভের আদর্শ থেকে বহু দূরে। নিগ্রোদের দাসত্ব টিকিয়ে রাখার তীব্র সমালোচনা করেন তিনি, নবীন আমেরিকান রাষ্ট্রে যে বৈষয়িক অসাম্য রয়ে গেছে তার দৃঢ় বিরোধিতা করেন, 'সেখানে শতখানেক গর্বিত নাগরিক বিলাসে ডুবে থাকে আর হাজার হাজার লোকের উপযুক্ত আহার জোটে না, গরম আর ঠান্ডা থেকে মাথা গোঁজার নিজস্ব চালা নেই।*

'পিটার্সবুর্গ থেকে মস্কো যাত্রা'য় কৃষক বিপ্লবের যে ভাবনা আছে, তা থেকে বোঝা যায় যে ১৭৮৯ সালের ফরাসি বিপ্লবকে রাদিশ্যেভের স্বাগত করার কথা। তাঁর পুস্তক সম্পর্কে মন্তব্যে দ্বিতীয় ইয়েকাতেরিনা খামোকা লেখেন নি যে 'ফরাসি বিপ্লব তাঁকে করেছে রাশিয়ায় তার প্রথম চ্যাম্পিয়ন।'**

কিন্তু ফরাসি বিপ্লবের সবকিছুতেই যে তিনি তুষ্ট ছিলেন এমন নয়। যেমন, জাতীয় সভার পক্ষ থেকে জ. প. মারাতের ওপর পীড়নের বিরোধিতা করেন তিনি। এই প্রসঙ্গে তিনি লেখেন: 'ও ফ্রান্স! এখনো তুমি বাস্তিলের অতল গহ্বরের কাছে ঘুরে ফিরছ।'*** ফরাসি বৃহৎ বুর্জোয়ার রাজনীতির বিরোধিতা করলেও রাদিশ্যেভ জ্যাকোবিন সন্ত্রাসও গ্রহণ করতে পারেন নি। সাইবেরিয়ার নির্বাসন থেকে ফেরার পর, বোঝা যায় ১৮০১ সালেই 'ঐতিহাসিক গান' কবিতায় সুল্লা প্রবর্তিত কালা তালিকা ধরে হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে লিখে যোগ করেছেন:

'হিংস্রতায় সামান্য সমান
তার সঙ্গে হবে নাকো কেউ,
আমাদের একালের রবেস্পিয়ার যেন।'****

১৭৯০ সালের মে মাসে প্রকাশিত 'পিটার্সবুর্গ থেকে মস্কো যাত্রা' বহু বছর ধরে অগ্রণী রুশ সামাজিক-রাজনৈতিক চিন্তার কেন্দ্রীয় সমস্যাগুলি স্থির করে দেয়। আঠারো শতকের ৯০-এর দশকের ই. প. প্নিন, ভ. ভ.

পপ্নগায়েভ প্রভৃতি র্নশ জ্ঞানপ্রচারকদের রচনা দেখা দিচ্ছিল রাদিশ্চেভের গ্রন্থে নিবদ্ধ চিন্তার প্রভাবে, তাদের বৈশিষ্ট্য ছিল উত্থাপিত প্রশ্নের র‍্যাডিকেল-গণতান্ত্রিক সমাধান। রাদিশ্চেভের সামাজিক-রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির বিপ্নল প্রভাব পড়েছিল ডিসেম্ব্রিস্টদের ওপর।

কোন সন্দেহ নেই যে রাদিশ্চেভ ও র্নশ বিপ্লবী-গণতন্ত্রীদের মধ্যে একটা ধারাবাহিকতা আছে। গ. ভ. প্লেখানভ লিখেছেন: 'রাদিশ্চেভ ছিলেন আমাদের জীবনের সেই অগ্রণী শিক্ষকদের সারিতে প্রথম, পরে যাঁদের মধ্যে প্রম্নখ স্থান গ্রহণ করেন চের্নিশেভস্কি ও দব্রোলিউবভ। এই শেষোক্তদের রচিত নিয়মগ্নলির সঙ্গে তাঁর ব্যবহারিক নিয়মগ্নলির সাদৃশ্য আরো বেশি মনোযোগ্য এই কারণে যে তত্ত্বের ক্ষেত্রে উনি যেসব প্নর্বানুমানের ওপর দাঁড়িয়েছেন তার সঙ্গে চের্নিশেভস্কি ও দব্রোলিউবভের দার্শনিক প্নর্বানুমানের অনেক মিল আছে।'*

সামন্ততান্ত্রিক-ভূমিদাস ব্যবস্থার যে নির্ভীক বিরোধিতা করেছিলেন রাদিশ্চেভ, তা উত্তরপ্নর্নষদের স্মৃতিতে অক্ষয় হয়ে থাকবে। 'বড়ো র্নশীদের জাতিগর্ব' প্রবন্ধে র্নশ বৈপ্লবিক আন্দোলনের ইতিহাসের অতি উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলির উল্লেখ প্রসঙ্গে ভ. ই. লেনিন রাদিশ্চেভের ক্রিয়াকলাপের কথা বলেছেন।**



§ ১২। ইম্মানুয়েল কাণ্ট

ইম্মানুয়েল কাণ্ট (১৭২৪-১৮০৪) হলেন জার্মান ধ্রুপদী দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর মতবাদে, যেমন ফিখ্‌টে ও হেগেলেরও, সঙ্গতিহীন, আপোসমূলক ও চূড়ান্ত দূরকল্পী আকারে বিধৃত হয়েছে যাকে বলা হয় আঠারো শতকের শেষ এবং উনিশ শতকের গোড়াকার জার্মান দর্শনের বিপ্লব। এ ছিল জার্মান বুর্জোয়া বিপ্লবের ভাবাদর্শীয় প্রস্তুতি।

জার্মান ধ্রুপদী দর্শনের সঙ্গে জার্মান সমাজতন্ত্রের সম্পর্ক কী তার মূল্যায়ন প্রসঙ্গে এঙ্গেলস লেখেন: '...আমরা, জার্মান সমাজতন্ত্রীরা এইজন্য গর্বিত যে আমরা জন্ম গ্রহণ করেছি কেবল সাঁ-সিমোঁ, ফুরিয়ে, ওয়েনের কাছ থেকেই নয়, কাণ্ট, ফিখ্‌টে হেগেলের কাছ থেকেও।'*

লেনিন ব্রিটিশ অর্থশাস্ত্র, ফরাসি ইউটোপীয় সমাজতন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে জার্মান ধ্রুপদী দর্শনকেও গণ্য করেছিলেন মার্কসবাদের ভাবাদর্শীয় উৎস বলে। জার্মান ধ্রুপদী দর্শনের তাৎপর্য সর্বাগ্রে এই যে আধিবিদ্যক বস্তুবাদ থেকে তা দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদে উত্তরণের প্রয়োজনীয় পূর্বশর্ত গড়ে দেয় আর ঐ শেষ বস্তুটি ছাড়া বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র অকল্পনীয়। সচেতন দ্বন্দ্ববাদী হওয়ায় কাণ্ট এমন সব সমস্যা উপস্থিত করেন যার বিকাশ সাধনে প্রস্তুত হয়ে ওঠে হেগেলের দ্বান্দ্বিক মতবাদ।

'আইনের ঐতিহাসিক স্কুলের দার্শনিক ঘোষণাপত্র'এ মার্কস ১৮৪২ সালে কাণ্টের দর্শনকে ফরাসি বিপ্লবের জার্মান তত্ত্ব বলে অভিহিত করেছেন এবং আইনের ঐতিহাসিক স্কুলের গ. হুগো প্রভৃতি তাত্ত্বিকদের প্রতিক্রিয়াশীল দৃষ্টিভঙ্গির বিপরীতে রেখেছেন তাকে।

'ভাববাদের সঙ্গে বস্তুবাদের আপোস, উভয়ের মধ্যে রফা, একই তন্ত্রের মধ্যে ভিন্নধর্মী, বিপরীতমুখী ভাবাদর্শীয় ধারার মিলনকে' লেনিন বলেছেন কাণ্টের দর্শনের মূল দিক।* 'ব্যবহারিক বিচারবুদ্ধির' অবস্থান থেকে কাণ্ট তাঁর রাষ্ট্র বিষয়ক মতাবাদের র‍্যাশনাল যৌক্তিকতা দেখাবার চেষ্টা করেছেন।

কাণ্টের সময়ে জার্মানি ছিল কয়েক শত আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীন রাষ্ট্র নিয়ে গঠিত পশ্চাৎপদ সামন্ততান্ত্রিক একটা দেশ। এইসব রাষ্ট্রের প্রত্যেকটির ছিল নিজ নিজ ফৌজ, পুলিস, কর-ব্যবস্থা ইত্যাদি। জার্মান রাষ্ট্রগুলিতে ছিল ভূমিদাস প্রথা, সামন্ততান্ত্রিক স্বেচ্ছাচার, মফস্বলী সংকীর্ণতার আধিপত্য। বুর্জোয়াদের ঐক্যবদ্ধ শ্রেণী ছিল না। স্বাধীন, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শক্তির প্রতিনিধিত্ব তারা করত না, তবে ভয়ে ভয়ে এবং সঙ্গতিহীনতায় হলেও প্রভুত্বকারী সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে চাপা প্রতিবাদ জানাতে শুরু করেছিল তারা। এই প্রতিবাদ ভাষা পায় কাণ্ট ও ফিখ্‌টের দর্শনে, গ্যেটে ও শিলারের রচনায়।

আইন সম্পর্কে কাণ্টের মতবাদ প্রধানত স্থান পেয়েছে তাঁর 'নৈতিকতার অধিবিদ্যা' রচনায়। 'নৈতিকতার অধিবিদ্যার মূলকথা' এবং 'ব্যবহারিক বিচারবুদ্ধির সমালোচনা'য় তিনি দার্শনিক ধারায় নৈতিক বিধির বোধ

প্রতিপাদন করেন, আর 'নৈতিকতার অধিবিদ্যা'য় দেয়া হয়েছে আইনী ও নীতিশাস্ত্রীয় দৃষ্টিভঙ্গির একটা ব্যবস্থাধারা। জ্ঞানপ্রচারকেরা আইনী ব্যবস্থার যে বুর্জোয়া ভাবনা উপস্থিত করেছিলেন কাণ্ট সেটাকে প্রতিষ্ঠিত করেন। আইনী ব্যবস্থায় কল্পিত হয়েছিল সমস্ত ধরনের ব্যক্তিগত পরাধীনতার অবসান, ব্যক্তি স্বাধীনতা, আইনের দিক থেকে সমস্ত লোকের সমতার স্বীকৃতি, সমস্ত আইনী বিশেষাধিকারের উচ্ছেদ।

কাণ্ট মনে করতেন, ব্যবহারশাস্ত্রীদের পক্ষে আইনের মর্মার্থ নির্ধারণ তেমনি কঠিন যেমন যুক্তিবিদদের কাছে সত্য নির্ধারণ। কোনো একটা স্থানে, কোনো একটা সময়ে আইনের নিরিখ সম্পর্কে কী নির্দেশ দেয়া হবে — ব্যবহারশাস্ত্রী কেবল সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে, কিন্তু কোনটা আইন, কোনটা আইন নয়, তার পার্থক্য করার মতো মানদণ্ড দিতে পারে না।

আইনকে কাণ্ট নীতিশাস্ত্রের অধীনস্থ করেছেন, আবার সেইসঙ্গে চেষ্টা করেছেন তাদের পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করার। কাণ্টের নীতিশাস্ত্র মানুষের আচরণের 'বৈধতা' ও 'নৈতিকতার' মধ্যে, লোকেদের বৈধ ও নৈতিক ব্যবহারের মধ্যে পার্থক্য করেছে। উদ্দেশ্য নির্বিশেষে আচরণ যদি আইনের সঙ্গে আপাতদৃষ্টিতে মেলে, তবে তা বৈধ। অতএব আইন লোকেদের একমাত্র বাহ্যিক সম্পর্কে প্রসারিত, সাবজেকটিভ দিকটা তা স্পর্শ করে না। আচরণের নৈতিকতা নির্ভর করে অভিপ্রায়ের ওপর, অভ্যন্তরীণ চৈতন্যের ওপর।

আইন ও নৈতিকতার কাণ্টীয় ধারণা অনুসারে, আইনপ্রণয়ন হল নীতিশাস্ত্রীয় আইনপ্রণয়নের একাংশ। নীতিশাস্ত্রীয় আইনের মধ্যে কেবল নৈতিক কর্তব্য কথাটার ঐকান্তিক অর্থই পড়ে না, সমস্ত ব্যবহারশাস্ত্রীয় কর্তব্যের নির্দেশনামাও তার অন্তর্ভুক্ত।

কাণ্টের আইনব্যবস্থা দুই অংশ নিয়ে গঠিত — ব্যক্তিগত আইন ও সাধারণী আইন। সাধারণ স্বার্থের সঙ্গে ব্যক্তিগত স্বার্থের বৈপরীত্য বুর্জোয়া সমাজের মূলেই নিহিত, যেখানে অর্থনৈতিক জীবন গড়ে ওঠে ব্যক্তিগত মালিকানা ও বাজারের প্রতিযোগিতা দিয়ে।

বিচারবোধসম্পন্ন জীব হিশেবে লোকেদের মধ্যে সম্পর্ক নিয়ন্ত্রিত করে ব্যক্তিগত আইন। ব্যক্তিগত আইনকে কাণ্ট ভাগ করেছেন বৈষয়িক, ব্যক্তিগত ও বৈষয়িক-ব্যক্তিগতে। কাণ্টের কাছে বৈষয়িক আইনের বিষয় হল দ্রব্যাদি,

ব্যক্তিগত আইনের ক্ষেত্র লোকেদের ব্যক্তিগত ক্রিয়া, বৈষয়িক-ব্যক্তিগত আইন হল পিতামাতার অধিকার, বিবাহসংক্রান্ত আইন নিয়ে।

মালিকানার অধিকারকে সামাজিক সম্পর্ক বলে বোঝার কাছাকাছি গিয়েছিলেন কাণ্ট। মালিকানার অধিকারকে তিনি ব্যাখ্যা করেছেন স্বতন্ত্র ব্যক্তির পরম সাবজেকটিভ অধিকার বলে, যা সমাজের বাইরে সম্ভব নয়। আর ব্যক্তিগত আইনের ক্ষেত্রে কাণ্ট মনে করেন তা অর্জনের একমাত্র উপায় হল চুক্তি। মালিকানার অধিকার ও ব্যক্তিগত আইন বিষয়ে কাণ্টের দৃষ্টিভঙ্গির একটা সামন্ততন্ত্রবিরোধী, ভূমিদাস প্রথাবিরোধী, প্রগতিশীল চরিত্র ছিল।

ব্যক্তিগত-বৈষয়িক অধিকারের বেলায় সেকথা বলা যাবে না। কাণ্ট এখানে স্ত্রীর ওপর স্বামীর প্রভুত্বের অধিকার ঘোষণা করেছেন, গৃহত্যাগী স্ত্রী বা সন্তানদের প্রত্যর্পণের দাবি, মালিকের কাছ থেকে পলাতক চাকর-বাকরের ফেরত আসতে বাধ্য করার অধিকার স্বীকার করেছেন।

সাধারণী আইনে নির্দিষ্ট হয় স্বতন্ত্র ব্যক্তিদের পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে আইনী অবস্থা (নাগরিক অবস্থা), অথবা এক-একটা রাষ্ট্রে জনগণের জীবন (রাষ্ট্রীয় আইন), অথবা বিভিন্ন রাষ্ট্রের জনগণের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক (আন্তর্জাতিক আইন)।

ব্যবহারশাস্ত্রীয় আইনকে কাণ্ট নীতিশাস্ত্রীয় আইনের অন্তর্ভুক্ত করেছেন এবং এই থেকে আইনী মানদণ্ডের অগ্রস্থানীয়তা এবং বিশুদ্ধ ব্যবহারিক বিচারবুদ্ধির নিকট তার অধীনতার ধারণা উপস্থিত করেছেন। আইনকে তিনি চেষ্টা করেছেন অবজেকটিভ ও সাবজেকটিভ দিক থেকে সংজ্ঞাত করার। অবজেকটিভ দিক থেকে আইন হল স্বাধীনতার সাধারণ নিয়মের দৃষ্টিকোণ থেকে একজন ব্যক্তির স্বেচ্ছাচরণ অন্য ব্যক্তির স্বেচ্ছাচরণের সঙ্গে একত্রে চলতে পারে এমনসব শর্ত, আর সাবজেকটিভ দিক থেকে 'সাধারণ আধিকারিক আইন ঘোষণা করে — বাহ্যত এমনভাবে চলো যাতে তোমার স্বেচ্ছাচরণের স্বাধীন প্রকাশ সাধারণ নিয়ম অনুসারে প্রত্যেকের স্বাধীনতার সঙ্গে একত্রে চলতে পারে'*।

নৈতিকতার ধর্মীয় মঞ্জুরিতে অস্বীকৃত কাণ্ট ধর্মের জ্ঞানপ্রচারণী সমালোচনা চালিয়ে যান, যা শুরু করেছিলেন হিউম, 'ব্যবহারিক বিচারবুদ্ধির সমালোচনা' লিখিত হবার কয়েক দশক আগেই যিনি ঘোষণা

ক'রেছিলেন যে নীতিশাস্ত্র ধর্ম থেকে স্বাধীন। তবে ধর্ম প্রসঙ্গে নীতিশাস্ত্রের স্বায়ত্তাধিকারের স্বীকৃতিতে কাণ্ট সঙ্গতিশীল ছিলেন না। একদিকে, তিনি ধর্মবিশ্বাস থেকে নৈতিকতার পরিপূর্ণ স্বাধীনতায় জোর দিয়েছেন, অন্যদিকে, বিশ্বে নৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত ও সুসিদ্ধ করার জন্য ঈশ্বরে বিশ্বাসের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন। এইভাবে ধর্মের কর্তৃত্ব কাণ্ট কেবল সীমাবদ্ধ করেছেন, কিন্তু ধর্মবিশ্বাসে আপত্তি করেন নি। কাণ্টের মতে, ঈশ্বর যদিও নৈতিকতার বিধিদাতা, নৈতিক আইনের উৎস নন, তাহলেও বিশ্বে নৈতিক ব্যবস্থার কারণ থেকেই যাচ্ছেন ঈশ্বর। এতে ক'রে লোকেদের আচরণ শেষ পর্যন্ত হবে নৈতিক আইনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং পরলোকে তাদের আচরণ যে অপুরস্কৃত থাকবে না, তার গ্যারাণ্টি।

নৈতিক আইনপ্রণয়নকে ধর্মের মঞ্জুরি থেকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য কাণ্টের প্রয়াসে খুবই মূল্য দিয়েছিলেন জ্ঞানপ্রচারণার ঐতিহ্যবাদী দার্শনিকেরা, সেই সঙ্গে তাঁর সঙ্গতিহীনতা ও ধর্মবিশ্বাসের কাছে নতিস্বীকারেরও সমালোচনা করেছেন তাঁরা।

ধর্ম থেকে নৈতিকতার স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন কাণ্ট, বলেছিলেন নৈতিকতার আইন পালনীয় পূতাশীর্বাদ বা ঐশ্বরিক সৃষ্টির কারণে নয়, প্রয়োজন নেই ধর্মে, কেননা ব্যবহারিক বিচারবুদ্ধির বলে তা স্বায়ত্তাধীন। নৈতিকতার আইন পালনীয় পূতাশীর্বাদ বা ঐশ্বরিক সৃষ্টির কারণে নয়, এই জন্য যে এগুলি হল নিয়মের সাধারণ, আইনসিদ্ধতার সহজ রূপ।

কাণ্টের ধারণায়, মানুষ হল দ্বৈত প্রাণী। একদিকে, সে একটা ঘটনা। এক্ষেত্রে মানুষ তার অস্তিত্বের জন্য অচেতন সংগ্রাম চালিয়ে নিজের স্বার্থপর লক্ষ্যের প্রতিভূ। এইক্ষেত্রে কোনো না কোনো রূপে তার যে পরার্থবাদ, নৈতিকতার ইতিবাচক উপাদান প্রকাশ পায়, তাকে কাণ্ট শেষ বিচারে মানুষের ব্যক্তিগত স্বার্থ, উপযোগিতাবাদী প্রেরণা বলে ব্যাখ্যা করেছেন। এক্ষেত্রে প্রকৃতির অংশ হিশেবে মানুষের আচরণ নিমিত্ত ও আবশ্যিকতা দ্বারা নির্ধারিত।

অন্যদিকে, মানুষ প্রকৃতির সীমা অতিক্রম করে যায়, নিমিত্তের ওপর নির্ভর করে না তার চৈতন্য। এই দৃষ্টিকোণ থেকে নৈতিক চেতনা বাস্তবতা থেকে স্বাধীন, তা দেখা দেয় নৈতিক কর্তব্য রূপে, স্বার্থপর প্রেরণার সঙ্গে যার দ্বন্দ্ব অবিরাম। এই নৈতিক কর্তব্যকে কাণ্ট বলেছেন পরম নির্দেশ। পরম নির্দেশের কল্যাণে ব্যক্তি হয়ে ওঠে স্বায়ত্তাধীন, স্বাধীন, সত্যকার মানবিক ও নৈতিক গুণের অধিকারী।

পরম নির্দেশ বা নৈতিক কর্তব্যের সঙ্গে বাস্তবতার কোনো মিল নেই এবং খোদ বাস্তবতায় তা রূপায়িত হতে পারে না। তাহলেও তা নৈতিক আচরণের মৌল প্রতিপাদ্য বা নীতি নির্ধারিত করে। কাণ্ট লিখেছেন: 'পরম নির্দেশে অভিব্যক্ত হয় কেবল যেটা অবশ্যকর্তব্য, তা ঘোষণা করে: তেমন নীতিসূত্র অনুসারে চলো যা একই সঙ্গে সাধারণ নিয়মের শক্তি রাখতে পারে।* সুতরাং, এমনভাবে চলতে হবে যাতে তোমার আচরণের নীতিতে প্রকাশ পায় সবার আচরণের আইন, যেন তা হয়ে দাঁড়ায় প্রকৃতির সাধারণ নিয়ম।

এই থেকে রোমের ব্যবহারশাস্ত্রী উল্‌পিয়ানের তিনটি প্রমুখ নির্দেশের নিজস্ব ব্যাখ্যা দিয়েছেন কাণ্ট:

১) 'স্বভাব অনুসারে চলো।' — কাণ্ট এর অর্থ করেছেন অন্য লোকের সঙ্গে সম্পর্কে মানুষ হিশেবে নিজের মর্যাদা রক্ষায় অভিব্যক্ত আইনী সততা বলে। 'অন্যের কাছে কেবল একটা উপায় হ'য়ো না, লক্ষ্য ও হও,'** লিখেছেন কাণ্ট।

২) 'কারো অধিকার লঙ্ঘন ক'রো না।' — এর সঙ্গে কাণ্ট যোগ দিয়েছেন: 'তার জন্য যদি তোমায় বাকিদের সঙ্গে সবরকম সম্পর্ক বন্ধ করতে এবং যেকোনো সমাজ বর্জন করতে হয়, তাহলেও।'***

৩) 'প্রত্যেককে তার জিনিসটা দাও।' — এ সূত্রটাকে কাণ্ট মনে করেছেন বিদ্ঘুটে, কেননা কাউকে সেটা দেয়া যায় না যা তার আগে থেকেই আছে। এবং কাণ্ট এইভাবে এটাকে সূত্রবদ্ধ করেছেন: '(অন্যদের সঙ্গে তেমন সম্পর্ক বর্জন করতে না পারলে) তাদের সঙ্গে এমন সাহচর্যে যোগ দাও যেখানে প্রত্যেকের নিজেরটা অক্ষুণ্ণ থাকবে।'****

কাণ্ট আহ্বান করেছেন যাতে প্রতিটি বিচারবুদ্ধিশীল জীবের সাধারণ ইচ্ছা অনুসারে স্বতন্ত্র ব্যক্তিরা চলে, যাতে স্বতন্ত্র ব্যক্তির ইচ্ছা হয়ে দাঁড়ায় সাধারণ আইনপ্রণয়নী নৈতিক ইচ্ছা।

কাণ্টের পরম নির্দেশ হল এক আনুষ্ঠানিক, অন্তঃসারশূন্য নীতি। তিনি লক্ষ করেন নি যে শ্রেণী সমাজে বিভিন্ন রূপের নৈতিকতা শ্রেণী সম্পর্ক দ্বারা

নির্ধারিত, এবং বিভিন্ন যুগ ও শ্রেণীদের মধ্যে পার্থক্যের বিমূর্তায়ন করতে গিয়ে তিনি ধরে নিয়েছেন যে একটা সাধারণ নৈতিক চৈতন্য যেন সর্ব কাল, সর্ব জাতি ও সর্ব শ্রেণীতে অন্তর্নিহিত।

বস্তুতপক্ষে, কাণ্টের এই নিয়মগুলির নির্দিষ্ট একটা শ্রেণী সারার্থ আছে। যেমন, মানুষকে শুধু উপায় নয়, লক্ষ্য হিশেবেও দেখার দাবিটা হল সামন্ততান্ত্রিক অধিকার বিলোপের যে দাবি, তার ভাবাদর্শীয় প্রতিফলন। বুর্জোয়া ভাবাদর্শীরা আইনী সমতাকে নিজেই নিজের লক্ষ্য বলে ঘোষণা করেছিলেন। আইনী সমতা লোককে অপর লোকের অধীনতা থেকে মুক্ত করে এই ধরে নিয়ে তাঁরা অর্থনৈতিক সম্পর্কগুলিকে উপেক্ষা করেন।

স্বতন্ত্র ব্যক্তির আচরণ বুঝি-বা হতে পারে সাধারণ নৈতিক আচরণের মানদণ্ড — এই নিয়মটি সমাজের শ্রেণীগত চরিত্র, শ্রেণী বৈরের ওপর প্রতিষ্ঠিত সমাজে নৈতিক নিয়মাদির বিভিন্ন মূল্যায়নকে উপেক্ষা করে। যে সমাজে মানুষ কর্তৃক মানুষকে শোষণের প্রাধান্য সেখানে শ্রেণী-ঊর্ধ্ব নৈতিকতা, সমুচ্চ 'নৈতিক' দাবির প্রচার পরিণত হয় তার বিপরীতে।

কাণ্টের মতে, রাষ্ট্র হল আধিকারিক আইনের অধীনস্থ বহু লোকের সম্মিলন, অর্থাৎ নিছক আইনী সংগঠন। রাষ্ট্রের ভিত্তিতে আছে ভাবকল্প, আইনের বিশুদ্ধ নীতি। রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য কাণ্ট দেখেছেন অধিকার ও ন্যায়ের ধারণার বিজয়ে, যা নাকি অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, শ্রেণী সংগ্রাম নির্বিশেষে 'বিশুদ্ধ বিচারবুদ্ধির' দাবি মানে।

রাষ্ট্রের উদ্ভবের প্রশ্নে কাণ্ট চুক্তি তত্ত্ব স্বীকার করেন যা ক্ষমতার জন্য বুর্জোয়াদের সংগ্রামের পর্বে বুর্জোয়া ভাবাদর্শীদের মধ্যে ব্যাপক প্রচলন লাভ করে। রাষ্ট্রের চুক্তিমূলক উদ্ভব বিষয়ে কাণ্টের তত্ত্ব যা রুসোর দৃষ্টিভঙ্গির খুবই কাছাকাছি, তদনুসারে লোকেরা তাদের স্বাভাবিক অবস্থার স্বাধীনতা ত্যাগ করছে গোষ্ঠীর সদস্য হিশেবে স্বাধীনতা অর্জনের জন্য। আইনের ওপর প্রতিষ্ঠিত বৈধ অবস্থার স্বাধীনতা অর্জন করে মানুষ বন্য প্রকৃতিকে, যা আইনে প্রতিষ্ঠিত নয় বর্জন করেছে।

মানব প্রকৃতিতে মন্দের আদিত্বের থিসিস সমর্থন করেন কাণ্ট। তা প্রতিপাদনের উদ্দেশ্যে রচিত তাঁর 'মানবপ্রকৃতিতে মন্দের আদিত্ব প্রসঙ্গে' (১৭৯২) লেখাটা। স্বাভাবিক, প্রাক্‌রাষ্ট্রীয় অবস্থায় মানব প্রকৃতিতে শুভের

প্রবণতা খুঁজেছিলেন যেসব দার্শনিক, তাঁদের সমালোচনা করেন তিনি। সভ্য মানুষদের মধ্যে কাণ্ট দেখেছেন আরো বেশি বদভ্যাস, এবং তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে নৈতিক প্রয়াস বা সমাজব্যবস্থার উন্নয়ন, কোনো কিছুতেই কু'য়ের এই আদি প্রবণতা জয় করতে মানুষ অক্ষম। এই বিভ্রান্তি প্রতিফলিত হয়েছে বৈপ্লবিক পথে সমাজের অসম্পূর্ণতা দূর করায় তাঁর অবিশ্বাসে।

কাণ্টের নৈরাশ্যবাদের সামাজিক ভিত্তি নিহিত জার্মান বার্গারদের পশ্চাৎপদতা ও দুর্বলতায়, সামন্ততান্ত্রিক জার্মানির রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদতায়, এমন একটা সামাজিক শ্রেণীর অবিদ্যমানতায়, যা পরারাজতন্ত্র ও সামন্ততন্ত্র কর্তৃক নিপীড়িত জার্মান জনগণকে নিজের চারপাশে জড়ো করে সংগ্রাম চালাতে পারত।

সামাজিক সংঘে বা নাগরিক অবস্থায় লোকেদের সম্মিলনকে কাণ্ট দেখেছিলেন নিছক আইনী অবস্থা হিশেবে। তিনি মনে করতেন, এরূপ সংঘের ভিত্তি হল স্বাধীনতা, সমতা, সমাজের প্রতিটি সভ্যের স্বাবলম্বিতার মতো কতকগুলি ধরে-নেয়া নীতি। এই নীতিগুলিকে তিনি বুঝতেন ফরাসি বুর্জোয়া ভাবাদর্শীদের ধারায়, যদিও পুরোপুরি সুসঙ্গতভাবে নয়। যেমন, সমতাকে আইনের চোখে সমাজের সমস্ত সভ্যের সমতা বলে ব্যাখ্যা করলেও তিনি এর ব্যতিক্রম করেছেন রাষ্ট্রপ্রধানের ক্ষেত্রে, 'যিনি নিজে বাধ্যতামূলক কোনো আইনের অধীনস্থ না হয়ে বাধ্য করার অধিকার রাখেন'*। এই কথায় তিনি জোর দিয়েছেন যে আইনী সমতার অর্থ কার্য-ক্ষেত্রে সমতা নয়। লোকেদের মধ্যে দৈহিক, আত্মিক ও সম্পত্তিগত দিক থেকে অসাম্য থেকেই যাচ্ছে। ধনী-দরিদ্রে ভাগাভাগিটা তাঁর কাছে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও ন্যায্য বলে মনে হয়। অথচ সেই সঙ্গে তিনি উত্তরাধিকার-সূত্রে পাওয়া সম্প্রদায়ভেদী বিশেষাধিকারে আপত্তি করেছেন এবং এই সূত্র অনুমোদন করেছেন যে সমাজের প্রতিটি সভ্যের তার গুণ, শ্রমশীলতা ও সাফল্য অনুযায়ী অধিষ্ঠান লাভের সুযোগ পাওয়া উচিত।

রাষ্ট্রক্ষমতার মতবাদে কাণ্ট রুসোর জনগণের সার্বভৌমত্বের ধারণা গ্রহণ করেন যদিও ক্ষমতা বিভাগের মঁতেস্ক্যু তত্ত্বে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ সংশোধন এনে তাতেও আপত্তি করেন নি। ক্ষমতার 'ভারসাম্যের' বদলে তিনি দাবি করেছেন কার্যনির্বাহী ক্ষমতার তুলনায় আইনপ্রণয়নী ক্ষমতার

অগ্রাধিকার। আইনপ্রণয়নী ক্ষমতা একই সঙ্গে কার্যনির্বাহী হতে পারে না, তা সার্বভৌমত্বের অধিকারী, জনগণের একক ইচ্ছার প্রকাশক এবং শাসককে তা ক্ষমতাচ্যুত করতে পারে।

রাষ্ট্রের শাসক কার্যনির্বাহী ক্ষমতার কাজ চালায়। সে নিয়োগ করে পদাধিকারীদের (কর্মকর্তা, মন্ত্রী), যাদের দায়িত্বে পড়ে রাজ্যশাসন, সে জারি করে অনুজ্ঞা ও নির্দেশ, কিন্তু আইন নয়। কাণ্ট মনে করেন, সরকারের যদি আইনপ্রণয়নী ক্ষমতাও থাকে, তাহলে তা পরিণত হবে স্বৈরতান্ত্রিকে।

বিচারসম্পর্কিত ক্ষমতা ন্যস্ত থাকবে কেবল বিচারকদের ওপর। জনগণের মধ্যে থেকে নির্বাচিত শপথগ্রহণকারী আদালতের মতো একটা বুর্জোয়া প্রতিষ্ঠান প্রবর্তনের কথা ভেবেছিলেন কাণ্ট। আদালতের সিদ্ধান্ত (রায়) হল সামাজিক ন্যায়ের একমাত্র দলিল। তা ঠিক হতে পারে, বেঠিকও হতে পারে। রাষ্ট্রের প্রধান বিচারকের ভূমিকা নিতে, 'অর্থাৎ নিজেকে এমন অবস্থায় ফেলতে যেখানে কাজ করা চলবে অধিকার অনুসারে নয়, সুতরাং নিজের সিদ্ধান্তকে আপীলের বিষয়বস্তু করে তুলতে' সে পারে না।*

কাণ্টের মতে, তিনটি ক্ষমতাই হল জনগণের ইচ্ছার সংযুক্ত অভিব্যক্তি। সবই তারা সমন্বিত করে নিজেদের ক্রিয়াকলাপ, পরস্পরের পরিপূরণ করে। তিনি লিখেছেন: 'আইনপ্রণেতার ইচ্ছা — ভর্ৎসনার ঊর্ধ্বে, সর্বোচ্চ শাসকের কার্যনির্বাহী সামর্থ্য অনতিক্রমণীয়, আর সর্বোচ্চ বিচারকের রায় অপরিবর্তনীয়।'**

জনগণের সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে কাণ্টের দৃষ্টিভঙ্গি সঙ্গতিপূর্ণ নয়। একদিকে, তাঁর মতে, আইনপ্রণয়নী ক্ষমতা হওয়া উচিত জনগণের অভিপ্রায়ের অভিব্যক্তি, অন্যদিকে, জনগণ সর্বোচ্চ ক্ষমতার কাছে বস্তুত অধিকারহীন। কেউ যদি 'বর্তমানে অধিষ্ঠিত ক্ষমতাকে প্রতিরোধ করার কথা ভেবে থাকে, তাহলে সে এই ক্ষমতার আইন অনুসারে, অর্থাৎ পূর্ণ অধিকারে দণ্ডনীয় হবে, সে হবে মৃত্যুদণ্ডিত অথবা নির্বাসিত।'*** মুহূর্তের জন্যও আইনের ক্রিয়াকে থামাবার প্রচেষ্টাকে কাণ্ট দেখেছেন অপরাধ বলে, যেমন অধিকারের ধারণাটা তেমনি ব্যবহারিক বিচারবুদ্ধিমার্গীয় নীতির তা

গুরুতর লঙ্ঘন। এই সিদ্ধান্তে তিনি এসেছেন: 'বর্তমানে বিদ্যমান ক্ষমতার উদ্ভব যা থেকেই হোক, তাকে মানতে হবে।'*

আর রাষ্ট্রের প্রভুর কথা ধরলে প্রজাদের ক্ষেত্রে তার কেবল অধিকার আছে, কোনো কর্তব্য নেই। ক্ষমতাধর সর্বদা নির্দোষ এমন কথা কান্ট ভাবেন নি, কিন্তু মনে করেন যে, আইন লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে প্রজাদের কেবল অভিযোগ করার অধিকার থাকে। শুধু তাই নয়। সর্বোচ্চ শাসক কর্তৃক সাংবিধানিক আইন লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের কোনো ক্ষমতার পক্ষ থেকে প্রতিরোধের সুযোগ দেয়া চলবে, এমন কোনো ধারা থাকা উচিত নয় সংবিধানে।

রাষ্ট্রের আইনপ্রণয়নী শীর্ষের বিরুদ্ধে জনগণের ন্যায়সঙ্গত প্রতিরোধ যে হতে পারে না তাতে সন্দেহ ছিল না কান্টের। কেবল সাধারণ ইচ্ছার প্রকাশক আইন মানায় যে বৈধ অবস্থা সম্ভব, তাঁর মতে, এটা তার বিরোধী। এবং তিনি এই আমোঘ সিদ্ধান্ত টেনেছেন: 'এমন কোনো অধিকার নেই যে সে তার ক্ষমতার অপব্যবহার করছে (tyrannis) এই অজুহাতে বিক্ষোভের (seditio), আরো কম — অভ্যুত্থানের (rebellio) এবং সর্বাধিক কম — একক ব্যক্তি (রাজা) হিশেবে তার ওপর হামলা ও তার প্রাণনাশের চেষ্টা করা চলে।'**

আইনপ্রণয়নী ক্ষমতার বিরুদ্ধে জনগণের প্রতিরোধকে কান্ট আইনবিরোধী কিছু একটা বলে গণ্য করেছেন, যা নাকি বৈধ রাষ্ট্রব্যবস্থাকে ধ্বংস করবে। এইভাবে, নিজের প্রাথমিক যাত্রাবিন্দুর বিপরীতে তিনি সার্বভৌমত্বের উৎস দেখেছেন জনগণের মধ্যে নয়, রাজার মধ্যে, রাষ্ট্র প্রধানকে বিচারের অধিকার জনগণের আছে এমন কথায় আপত্তি করেছেন, রাষ্ট্র প্রধান 'বেআইনী কাজ করতে পারে না।'***

প্রথম চার্লস ও ষোড়শ লুইয়ের প্রাণদণ্ডে তিনি আতংক বোধ করেন। তাঁর কাছে এটা হল অপরাধ, সমস্ত আইনী বোধ আর সার্বভৌম ও জনগণের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক নীতির জলাঞ্জলি। এ জনগণ 'তাদের অস্তিত্বের

জন্য সার্বভৌমের আইনপ্রণয়নের কাছে পুরোপুরি ঋণী হলেও হয়ে দাঁড়াচ্ছে তার ওপর আধিপত্যকারী।'*

কাণ্ট মনে করতেন যে রাষ্ট্রব্যবস্থার পরিবর্তন করা যেতে পারে কেবল সংস্কারের মাধ্যমে, তাও কেবল কার্যনির্বাহী ক্ষেত্রে, আইনপ্রণয়নী ক্ষমতায় নয়। কার্যনির্বাহী ক্ষমতার বৈধ প্রতিরোধ, যেমন, জনগণের ইচ্ছাপ্রকাশক পার্লামেণ্ট সদস্যদের পক্ষ থেকে মন্ত্রীদের বিরোধিতা করা সম্ভব বলে তিনি স্বীকার করেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই যোগ দেন যে কথাটা সক্রিয় কর্ম নিয়ে নয়, কার্যনির্বাহী ক্ষমতার অনুচিত কতকগুলি দাবির প্রতি নেতিবাচক মনোভাব নিয়ে।

কাণ্টের এইসব দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এসেছে বিপ্লব সম্পর্কে তাঁর মনোভাবও। বিপ্লবে তিনি আপত্তি করেছেন, সেই সঙ্গে এও বলেছেন যে বিপ্লব যদি নতুন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়, তাহলে নাগরিকেরা নতুন সরকারের অধীনতা মানতে বাধ্য। তাঁর মতে, বিপ্লব একটা অবৈধ উদ্যোগ আর রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করা অভ্যুত্থান অন্যায়। উচ্ছেদ হবার পরও রাজত্বের অধিকার রাজার থেকে যায়, সুতরাং 'সিংহাসন প্রত্যর্পণের দাবিদার হিশেবে গোপনে প্রস্তুত প্রতিবিপ্লব মারফত বা অন্য শক্তিদের সহায়তায় তা হাসিল করার' অধিকার তার আছে।**

রাষ্ট্রের শাসনরূপের শ্রেণীবিভাগ কাণ্ট করেছেন দুটি লক্ষণ দিয়ে: আইনপ্রণেতাদের সংখ্যা এবং ক্ষমতা বিভাগের নীতি রূপায়ণের চরিত্র দিয়ে। আইনপ্রণেতাদের সংখ্যা অনুসারে শাসনের রূপ হতে পারে স্বৈরতান্ত্রিক, অভিজাততান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক। স্বৈরতন্ত্র বলতে বোঝা হয়েছে পরারাজতন্ত্র। কাণ্ট মনে করেন সেটাই শাসনের সেরা রূপ, যদিও জনগণের পক্ষে তা সবচেয়ে বেশি বিপজ্জনক, কেননা স্বৈরাচারে অধঃপতিত হবার প্রবণতা থাকে তার। এর সুবিধা তিনি দেখেছেন এর সরলতায় (তাতে থাকে কেবল জনগণের সঙ্গে রাজার সম্পর্ক ও একজন মাত্র আইনপ্রণেতা)। বাধ্যতামূলক আইন দ্বারা জনগণের ঐক্যবিধান, একজন ব্যক্তির নিকট তাদের অধীনতায় কাণ্ট দেখেছেন রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রয়োজনীয় সরলীকরণ, অনুসরণীয় একটা বিজ্ঞ নীতিসূত্র। অবশ্য এখানে তিনি একটা শর্ত রেখেছেন যা থেকে দাঁড়ায় যে সব পরারাজতন্ত্রই সেরা রাষ্ট্রব্যবস্থা নয়, শুধু সেইটে সেরা

যখন 'রাজা ভালো', অর্থাৎ যখন তাঁর শাসনের ইচ্ছাই শুধু নয়, অন্তর্ভেদী দৃষ্টিক্ষমতাও থাকে; 'শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রব্যবস্থা সেইটে যার কল্যাণে সার্বভৌম হয়ে দাঁড়ান সেরা শাসক।'*

কাণ্ট এখানে 'আলোকপ্রাপ্ত' পরারাজতন্ত্রের পক্ষপাতী ভলটেয়ারের ভাবনা অনুসরণ করেছেন যিনি মনে করতেন যে শুভেচ্ছাসম্পন্ন 'আলোকপ্রাপ্ত' রাজা প্রয়োজনীয় সংস্কারের কর্মসূচি রূপায়িত করতে সক্ষম। সত্যকার আলোকপ্রাপ্তির আদর্শ বলে কাণ্ট গণ্য করেছেন দ্বিতীয় ফ্রিডরিখের নেতৃত্বে প্রাশিয়াকে, তিনি নাকি প্রথম রাজা যিনি শিক্ষালাভের প্রয়োজনীয়তা বুঝেছেন ও মেনেছেন। তিনি তাঁকে কল্পিত কতকগুলি গুণে ভূষিত করেছেন, যেমন, আইন অনুসারে প্রজাদের চালনা, রাষ্ট্রের কেবল প্রথম পদাধিকারী হওয়া, সোৎসাহে আদালতের স্বাধীনতা ও নিঃস্বার্থপরতা রক্ষার প্রয়াস। কাণ্টকে সবচেয়ে বেশি অভিভূত করেছে রাষ্ট্রে অনুমোদনীয় স্বাধীন চিন্তা ও সমালোচনার সীমারেখা প্রসঙ্গে দ্বিতীয় ফ্রিডরিখের বক্তব্য: 'যত খুশি, যা নিয়ে খুশি আলোচনা করো, কিন্তু অধীনে থাকো'। এতে কাণ্ট দেখতে পেয়েছেন নিজের মতামত প্রকাশ করার অধিকারের স্বীকৃতি এবং নাগরিক ও রাজনৈতিক বশ্যতার প্রয়োজনে স্বাধীনতার ওপর সীমারোপ, যা ছাড়া রাষ্ট্র টিকে থাকতে পারে না। প্রাশীয় রাজার রাষ্ট্রকে কাণ্ট বলেছেন আলোকপ্রাপ্তি যুগের অথবা 'ফ্রিডরিখের যুগের' রাষ্ট্র।

তবে দ্বিতীয় ফ্রিডরিখের রাষ্ট্র নিয়ে উচ্ছ্বাসটা পরম ও অকুণ্ঠ ছিল না। এ রাষ্ট্রের পুলিসি চরিত্র সম্পর্কে তাঁর সমালোচনা ছিল।

দ্বিতীয় ফ্রিডরিখের রাজতন্ত্র সম্পর্কে কাণ্টের বিচার কিছু পরিমাণে তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গির বিরোধী যে প্রতিনিধিত্বমূলক প্রজাতন্ত্রই রাষ্ট্রব্যবস্থার সর্বোচ্চ রূপ। তিনি মনে করতেন যে ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে শাসনের প্রণালী মিলে যাবে সত্যকার আইনী রাষ্ট্রব্যবস্থার ধারণার সঙ্গে, সেই হবে সমাজের ঐতিহাসিক বিকাশের অন্তিম লক্ষ্য। কাণ্টের মতে, আইনী রাষ্ট্রের ধারণা থেকে কোনো বিচ্যুতির কেবল একটা সাময়িক চরিত্রই থাকতে পারে। কেবল সেই ব্যবস্থারই সন্দেহাতীত শক্তি থাকে, যা ব্যবহারশাস্ত্রীয় আইনের সরাসরি দাবি মেটায়।

অভিজাততান্ত্রিক ধরনের শাসন কাণ্টের কাছে কম গ্রহণীয়, কেননা এখানে সম্ভ্রান্তরা হল আইনপ্রণেতা এবং দুই ধরনের সম্পর্ক এখানে দানা বাঁধে —

সম্ভ্রান্তদের নিজেদের মধ্যে সম্পর্ক, জনগণের সঙ্গে সম্ভ্রান্তদের সম্পর্ক।

এবং শেষত, শাসনের সবচেয়ে জটিল ও কম উপযুক্ত রূপ হল, কান্টের মতে, গণতন্ত্র। সবার ইচ্ছা ও সাধারণ ইচ্ছা সম্পর্কে রুসোর বক্তব্যের সঙ্গে তিনি একমত। কিন্তু সাধারণ ইচ্ছাকে রুসো যেখানে বুঝেছিলেন জনগণের সার্বভৌমত্ব ও গণতান্ত্রিক ক্ষমতার পক্ষ থেকে, সেখানে কান্টের কাছে গণতান্ত্রিক ধরনের শাসন গ্রহণীয় নয়, কেননা তা নাকি শক্তিশালী রাষ্ট্রক্ষমতা গড়তে, জনগণকে আইনের অধীনে আনতে পারে না। তিনি লিখেছেন, গণতান্ত্রিক রূপকে 'প্রথমে সকলের ইচ্ছাকে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে জাতিকে গঠন করার জন্য, তারপর নাগরিকদের ইচ্ছাকে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে মেল গঠনের জন্য, এবং শেষত মেলের শীর্ষে বসাতে হবে সার্বভৌমকে, তা নিজেই হল ঐক্যবদ্ধ ইচ্ছা।'*

শাসনের রূপগুলির শ্রেণীবিভাগ কান্ট করেছেন আরেকটা ভিত্তিতে — ক্ষমতা বিভাগ নীতির বাস্তবতা অনুসারে। এই ভিত্তিতে তিনি প্রজাতান্ত্রিক ও স্বৈরতান্ত্রিক রূপের মধ্যে বিভাগ অনুমান করেছেন। এক্ষেত্রে তিনি স্বৈরতন্ত্র ও অব্যবহিত গণতন্ত্রকে এক করে দেখেছেন, কেননা তাতে ক্ষমতার বিভাগ নেই আর নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রকে এক করে দেখেছেন প্রজাতন্ত্রের সঙ্গে।

কান্ট বুঝতেন যে রাষ্ট্রব্যবস্থা, শাসনের রূপগুলি সর্বদা অপরিবর্তিত থাকতে পারে না। কিন্তু একাধিকবার তিনি এই কথায় জোর দিয়েছেন যে পরিবর্তনটা জনগণের দ্বারা সংঘটিত হতে পারে না, কেননা হাঙ্গামা হল সর্ববিধ আইনের, সর্ববিধ আইনী সম্পর্কের উচ্ছেদ। তাঁর মতে, বিদ্যমান যে রাষ্ট্রব্যবস্থা আদি চুক্তির বিরোধী হয়ে দাঁড়িয়েছে, তাকে বদলাবার অধিকার দিতে হবে কেবল সার্বভৌমকেই।

কান্ট এই কথা থেকে এগিয়েছেন যে কোনো একটা রাষ্ট্ররূপ ততদিনই টিকে থাকতে পারে যতদিন তাতে লোকেরা অভ্যস্ত, যতদিন তা ঐতিহ্যের দিক থেকে আবশ্যক। কিন্তু তিনি মনে করতেন যে কেবল প্রজাতন্ত্রই আদি চুক্তির অর্থ ও মর্মের অনুসারী — তা-ই একমাত্র আইনী রাষ্ট্রব্যবস্থা, দৃঢ়তা যার বৈশিষ্ট্য। প্রজাতন্ত্রে আইন সর্বেসর্বা, পৃথক কোনো ব্যক্তির ওপর তা নির্ভর করে না। কান্ট এই দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন যে সত্যকার প্রজাতন্ত্র জনগণের প্রতিনিধিত্বমূলক ব্যবস্থা ছাড়া অন্যকিছু হতে

পারে না, যাতে জনগণের নামে সমস্ত নাগরিকদের ঐক্যবদ্ধ করে অধিকারপ্রাপ্ত প্রতিনিধিদের মারফত তাদের অধিকার সুনিশ্চিত হয়। ঠিক ঐক্যবদ্ধ জনগণই কেবল সার্বভৌমের প্রতিনিধি নয়, নিজেই তারা সার্বভৌম। এক-একজন পদাধিকারীর সমস্ত অধিকার সর্বোচ্চ ক্ষমতা থেকে আহৃত। প্রজাতন্ত্রকে কাণ্ট ব্যবহারিক বিচারবুদ্ধির আদর্শ বলে ঘোষণা করেছেন। কয়েক শত সামন্ততান্ত্রিক জার্মান রাজতন্ত্রের অস্তিত্বের পরিস্থিতিতে কাণ্টের এই ভাবনাটা প্রতিবাদ ও চ্যালেঞ্জের মতো শোনাবে যদিও সাংবিধানিক ধারায় পুনর্গঠিত হলে রাজতন্ত্রের সঙ্গে আপোস অনুমোদন করেছেন তিনি। সমস্ত সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও সেই পরিস্থিতিতে এ ভাবনাটা ছিল প্রগতিশীল বুর্জোয়া দাবি।

কাণ্ট ছিলেন দুর্বল জার্মান বুর্জোয়ার মনোভাবের প্রকাশক যারা জাতীয় পরিসরে তখনো সংহত হয়ে ওঠে নি। অচল হয়ে পড়া ব্যবস্থার যে সমালোচনা তিনি করেছেন তার চরিত্র ছিল আধখেঁচড়া; তার মধ্যে সামন্ততন্ত্রবিরোধী ধারা মিলেছিল প্রভুত্বকারী সামন্ততান্ত্রিক ভাবাদর্শের সাথে আপোসের প্রবণতার সঙ্গে।

আগে যা বলা হয়েছে, কাণ্টের রাষ্ট্রীয়-আইনী মতবাদের ভিত্তিতে ছিল রুসোর ভাবনা, যা এসেছে স্বকীয় ধরনের একটা প্রতিসরণের মধ্য দিয়ে। রাষ্ট্র বিষয়ে তাঁর তত্ত্বে গুরুত্বপূর্ণ স্থান নিয়েছে নাগরিক স্বাধীনতা, নাগরিক সমতা ও নাগরিক স্বাবলম্বনের বোধ। সমতা বলতে তিনি কেবল তাকেই নিজের ঊর্ধ্বে বলে গণ্য করার অধিকার বুঝিয়েছেন, যাকে আমরা যাতে বাধ্য হচ্ছি তাতে তাকেও বাধ্য করা যায়। স্বাবলম্বন বলতে উনি বুঝিয়েছেন অন্য কোনো ব্যক্তির ইচ্ছাধীনতা থেকে মুক্তি অথবা নিজের ব্যবহারশাস্ত্রীয় ক্রিয়াকলাপে স্বাধীন থাকার অধিকার। স্বাধীনতা ও সমতার নীতির সঙ্গে তিনি যুক্ত করেছেন সর্ববিধ পুরুষানুক্রমিক বিশেষ সুবিধার নাকচকে। কাণ্ট দাবি করেছেন পূর্বপুরুষদের কীর্তি উত্তরপুরুষে বর্তাতে পারে না এবং জনগণের সম্মিলিত অভিপ্রায় কোনো একটা বিশেষ সম্প্রদায়ের অধিকারে নেই, সার্বভৌম, অভিজাত সম্প্রদায় ও জনগণের মধ্যে সমাজের বিভাগকে কালক্রমে সার্বভৌম ও জনগণের মধ্যে বিভাগের কাছে হঠে যেতে হবে।

আইনপ্রণয়নী ক্রিয়াকলাপে জনগণের অংশগ্রহণ, ক্ষমতাকে আইনের অধীনতা মানা এবং বিচারকদের স্বাধীনতা নিয়ে কাণ্টের আইনী শৃঙ্খলার যে ধারণা তার দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি ইংলণ্ডের রাজনৈতিক ব্যবস্থার

সমালোচনা করেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন যে আইনপ্রণয়নী ক্ষমতা সেখানে কার্যত কার্যনির্বাহী ক্ষমতা থেকে পৃথক নয়। ব্রিটিশ নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের আদর্শায়ন থেকে মুক্ত থাকলেও কাণ্ট কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বুর্জোয়া গণতন্ত্র সম্পর্কে মোহ পোষণ করতেন।

সমতার ধারণা উপস্থিত করলেও কাণ্ট মোটেই তার ব্যবহারিক রূপায়ণ দাবি করেন নি। সম্পত্তিগত স্বাবলম্বন অনুসারে তিনি নাগরিকদের সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয়তে ভাগ করা আবশ্যক মনে করেছেন, রাজনৈতিক অধিকার দিতে চেয়েছেন কেবল প্রথমকে। অতি নরমপন্থী গণতন্ত্রের পক্ষপাতী তিনি। তাঁর মতে, সমাজের রাজনৈতিক জীবন থেকে বাদ দেয়া উচিত মজুরি-খাটা শ্রমিক, গোমস্তা, শিক্ষানবীশ, চাকর-বাকর, নারী, গৃহশিক্ষক, খাজনাদায়ী চাষি 'এবং সাধারণভাবেই যারা নিজেদের অস্তিত্ব (আহার, রক্ষণাবেক্ষণ) টিকিয়ে রাখে নিজের কাজ দিয়ে নয়, অন্যদের হুকুমে (রাষ্ট্রের হুকুম বাদে) এমন সমস্ত লোকেদেরই'। তাঁর মতে, সবাই এরা কেবল সমাজের সাহায্যকারী, যাদেরকে হুকুম করে ও রক্ষা করে অন্য ব্যক্তিরা, তাই কোনোরকম নাগরিক অবলম্বনের অধিকারী নয় তারা।

তবে কাণ্ট সতর্ক করে দেন যে নির্বাচনের অধিকার না থাকার অর্থ সাধারণভাবেই সমস্ত অধিকার না থাকা নয়, কেননা অন্যের ইচ্ছার ওপর নির্ভরতা ও অসাম্য 'লোক হিশেবে এই ব্যক্তিদের স্বাধীনতা ও সমতার বিরোধী নয়'*। জারি করা আইন স্বাধীনতার স্বাভাবিক নিয়মের বিরোধী হওয়া উচিত নয়।

কাণ্ট প্রচুর মন দিয়েছেন আন্তর্জাতিক আইন, রাষ্ট্রগুলির নিজেদের মধ্যে সম্পর্কের প্রশ্নে। বিদ্যমান বাস্তবতা থেকে এগিয়ে কাণ্ট এই মতে আসেন যে বহিঃসম্পর্কে রাষ্ট্রগুলি বেআইনী অবস্থায় রয়েছে, অবিরাম না হলেও এটা শত্রুতা ও যুদ্ধের অবস্থা, যেখানে আধিপত্য করে বলিষ্ঠের অধিকার। এ অবস্থার ধ্বংসাত্মক পরিণাম হ্রাস করার জন্য জার্মান দার্শনিক মনে করেছেন যে বহিরাক্রমণের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রকে সাহায্যের জন্য জাতিদের সংঘ গঠন আবশ্যক। এই সংঘকে তিনি এমন এক ফেডারেশন বলে দেখেছেন যার

অংশীরা সমানাধিকারী, কারো সার্বভৌমত্ব এ সংঘে সংকুচিত হবে না।

কাণ্ট মনে করতেন, যুদ্ধ ঘোষণার মতো প্রশ্ন রাজার বিশেষ অধিকারের মধ্যে পড়ে না। শুধু যুদ্ধ চালাবার জন্য নয়, যুদ্ধ ঘোষণার জন্যও প্রজাদের প্রতিনিধিদের মারফত তাদের স্বেচ্ছাসম্মতি আবশ্যক।

তিনি ছিলেন যুদ্ধ চালনার ধারাকে মানবিক করে তোলার পক্ষপাতী, যাতে তা শাস্তিদান, ধ্বংস অথবা অধীনস্থ করার উদ্দেশ্যে না চলে। প্রজাদেরকে গুপ্তচর, হত্যাকারী, বিষদাতা, মিথ্যা গুজব প্রচারক হিশেবে ব্যবহার করাকে তিনি বেআইনী বলে গণ্য করেছেন। মাল সরবরাহ ও ক্ষতিপূরণের ক্ষেত্রে তা জনগণকে লুণ্ঠনে পর্যবসিত করা অনুচিত, এক-একজন লোকের সম্পত্তি হরণ চলবে না, কেননা 'সেটা হবে দস্যুতা: পরাজিত হয়েছে জনগণ নয়, তারা যার ক্ষমতাধীনে সেই রাষ্ট্র এ যুদ্ধ চালিয়েছে জনগণের মাধ্যমে'। যুদ্ধের ব্যয়ভারের জন্য ক্ষতিপূরণ অথবা বন্দী বিনিময়ের ক্ষেত্রে মুক্তিপণ দাবি করার অধিকার নেই বিজয়ীর। কাণ্ট এই কথায় জোর দিয়েছেন যে পরাজিত রাষ্ট্র অথবা তার প্রজারা নিজেদের নাগরিক স্বাধীনতা হারায় না, রাষ্ট্র উপনিবেশের অবস্থায় এবং প্রজারা গোলামের অবস্থায় নেমে আসে না, কেননা সেক্ষেত্রে যুদ্ধ হবে শাস্তিদানমূলক যেটা তার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের বিরোধী। রাষ্ট্রগুলির শান্তির অধিকারকে, প্রতিবেশী দেশগুলি যখন যুদ্ধরত তখন শান্তিতে, নিরপেক্ষতায় থাকার অধিকারকে, চুক্তিকৃত শান্তির গ্যারাণ্টি দাবি করার অধিকারকে, 'বাইরের অথবা ভেতরের যেকোনো আক্রমণ থেকে মিলিতভাবে আত্মরক্ষার একসারি রাষ্ট্রের পারস্পরিক সংঘের (ফেডারেশনের)' অধিকারকে শ্রদ্ধা করার আহবান জানিয়েছেন তিনি*। 'ভেতরের আক্রমণ' বলতে উনি স্পষ্টতই গৃহযুদ্ধ, অত্যাচার ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে জনগণের অভ্যুত্থানকে বুঝিয়েছেন।

কাণ্ট মনে করতেন, জনগণকে স্বাভাবিক অবস্থা থেকে বার করে আনা দরকার আইনী অবস্থায়, যা রাষ্ট্রগুলির সংঘ গঠন মারফত হয়ে উঠবে বিশ্বের সত্যকার ক্রিয়াশীল অবস্থা।

'রীতিনীতির অধিবিদ্যা'য় কাণ্ট লিখেছেন যে আন্তর্জাতিক আইনের অন্তিম লক্ষ্য হিশেবে চিরস্থায়ী শান্তি — 'ভাবনাটা কার্যকর হবার নয়', কিন্তু শান্তি রক্ষার জন্য কতিপয় রাষ্ট্রের সংঘ মারফত আন্তর্জাতিক যোগাযোগের রাজনৈতিক নীতিগুলি মানবজাতিকে চিরস্থায়ী শান্তির

কাছাকাছি নিয়ে আসতে পারে। তবে তিনি সাবধান করে দিয়েছেন যে এক্ষেত্রে তিনি আমেরিকান স্টেটগুলির মতো একটা ফেডারেটিভ নয়, এমন সংঘের কথা ভাবছেন যাতে শান্তির পথে বিবাদ মীমাংসার জন্য রাষ্ট্রগুলির প্রতিনিধিদের নিয়ে নিয়মিত কংগ্রেস বসবে, আর ঐ উদ্দেশ্যটাই সভ্য জনগণকে সাজে। চিরস্থায়ী শান্তি স্থাপনের স্বার্থে কান্ট মনে করতেন এমন রাষ্ট্রব্যবস্থা গঠনে সহায়তা করা আবশ্যক যা ঐ উদ্দেশ্য সাধনে সবচেয়ে বেশি কার্যকর হবে।

যুদ্ধের বিধ্বংসী পরিণাম প্রসঙ্গে তিনি এই কথায় জোর দিয়েছেন যে অস্ত্রসজ্জার বোঝা শান্তিতে প্রায়ই যুদ্ধের চেয়েও বেশি কষ্ট ও ছারখার ঘটায়। ইউরোপীয় শক্তিদের মধ্যে ভারসাম্য স্থাপন করে সার্বত্রিক শান্তিকে তিনি নিছক একটা অসার কল্পনা বলে অভিহিত করেছেন, সেটা 'সুইফটের বাড়ির মতো, যা ভারসাম্যের সমস্ত নিয়ম এমন কঠোরভাবে মেনে গড়া হয়েছিল যে একটা চড়ুই তার ওপর বসতেই সেটা ভেঙে পড়ে'।* রাষ্ট্ররা অস্ত্রসজ্জিত হয়, কারণ বহিরাক্রমণ থেকে রক্ষা পাবার কোনো গ্যারাণ্টি নেই তাদের। এ ব্যাপারে কান্ট অন্য কোনো উপায় দেখতে পান নি আন্তর্জাতিক আইন ছাড়া, প্রতিটি রাষ্ট্রের পক্ষে যা পালনীয়। ফরাসি মঠাধ্যক্ষ সাঁ-পিয়েরে ইতিপূর্বে চিরস্থায়ী শান্তির যে প্রকল্প পেশ করেন, রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তারা তার সমালোচনা করলেও কান্ট বিশ্বাস করতেন আইনী নীতির বিজয়ে, মানবিক প্রকৃতিতে, যাতে অধিকার ও কর্তব্যের প্রতি শ্রদ্ধা সর্বদাই সজীব, ব্যবহারিক বিচারবুদ্ধির জয় হবে না — এটা মানতেন না তিনি।

চিরস্থায়ী শান্তির ভাবনা নিয়ে কান্ট ব্যস্ত থেকেছেন মোটামুটি অর্ধশতক। কান্টের সমগ্র দর্শনতন্ত্রের অচ্ছেদ্য অংশ এটা। কান্টের নীতিশাস্ত্র অসম্পূর্ণ থাকত তার উপসংহারসূচক শান্তির কর্মসূচি ছাড়া আর শান্তি ধারণার বনিয়াদী বক্তব্যগুলি নীতিশাস্ত্রীয় নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। তাঁর সংস্কৃতি বিষয়ক তত্ত্বে, রাষ্ট্র ও আইন বিষয়ক মতবাদে, অর্থাৎ তাঁর দর্শনতন্ত্রের যে সমস্ত দিকে তিনি মানুষ ও সমাজের কথা বলেছেন, সেখানেই যুদ্ধ নিবারণ, চিরস্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রশ্ন রেখেছেন।

চিরস্থায়ী শান্তির চিন্তাটা নতুন কিছু নয়। তবে চিরস্থায়ী শান্তি নিয়ে ভাবনার অনেক পরে দেখা দিয়েছে তা প্রতিষ্ঠার প্রকল্প। আমাদের

যতটা জানা আছে, এই ধরনের প্রথম প্রকল্প দিয়েছিলেন চেক রাজা গেওর্গি পদেব্রাদ, সেটা ১৫ শতকের ঘটনা। এরূপ প্রকল্পের মোট সংখ্যা শতাধিক। তবে চিরস্থায়ী শান্তির সবচেয়ে বিখ্যাত প্রকল্প হল ফরাসি মঠাধ্যক্ষ সাঁ-পিয়েরের এবং সে বিষয়ে কাণ্টের গ্রন্থ। ১৭১২ সালে সাঁ-পিয়ের লেখেন 'চিরস্থায়ী শান্তি রক্ষার নোট' এবং ১৭১৩-১৭১৭ সালে লেখেন তিন খণ্ডে চিরস্থায়ী শান্তির প্রকল্প। এখানে কথাটা ছিল ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির কনফেডারেশন গঠন নিয়ে, যাদের মধ্যে থাকবে চিরস্থায়ী শান্তির সম্পর্ক। সুতরাং, এরূপ সম্পর্ক প্রসারিত কেবল ইউরোপীয় মহাদেশে। এ প্রকল্প রূপায়ণে সাঁ-পিয়ের সমস্ত ভরসা রেখেছিলেন রাজাদের সচেতনতা ও শান্তিপ্রিয়তার ওপর। তাঁর প্রকল্প খুবই প্রসিদ্ধি লাভ করে। আঠারো শতকের প্রখ্যাত মনীষী ও লেখকদের চোখে তা না পড়ে পারে নি। তার ওপর মন্তব্য করেছেন লেইবনিৎস, রুসো, হলবাক, হের্ডার, কাণ্ট।

'বিশ্ব-নাগরিক পটে সাধারণ ইতিহাসের ধারণা' গ্রন্থেই (১৭৮৪) কাণ্ট রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে আইনের ভিত্তিতে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার প্রশ্ন উপস্থিত করেন নতুন ভাবে। যুদ্ধ তাঁর কাছে হয়ে উঠেছে অগ্রহণীয়, তার পরিণাম শোচনীয়। অন্যদিকে, রাষ্ট্রগুলিও আবার ভবিষ্যৎ গুরুত্বপূর্ণ আন্তঃরাষ্ট্রীয় সংঘের জন্য পরিপক্ক হয়ে উঠছে।

স্বাধীনতার দিকে জনগণের ক্রমিক, অগ্রগতিমূলক বিকাশের ধারণায় উপনীত হন কাণ্ট। শান্তি প্রতিষ্ঠার দিকে অবজেকটিভ নিয়মসিদ্ধতা, শান্তির নীতিতে জাতিসমূহের সংঘ গঠনের অনিবার্যতার কথা বলেন তিনি। তিনি মনে করেন, লোকে চাক বা না চাক, এ সংঘে যোগ দিতে তারা বাধ্য।

কাণ্টের মতে, শান্তি অর্জনে লোকেদের প্রবুদ্ধ করে সর্বাগ্রে নীতিশাস্ত্রীয় প্রেরণা, মানবজাতির নৈতিক প্রগতি, যা লক্ষ্যনিষ্ঠ বিকাশের সাধারণ ভাবনার ওপর প্রতিষ্ঠিত। জীবিত প্রাণীদের জীবন লক্ষ করে কাণ্ট মন্তব্য করেছেন, ওদের এমন কোনো অঙ্গ, এমন কোনো সামর্থ্য, এমন কোনো প্রবণতা নেই যা উদ্দেশ্যোপযোগী নয়। এ ব্যাপারে তিনি মানুষকেও ব্যতিক্রম বলে ধরেন নি, কিন্তু শেষোক্তের ঐতিহাসিক বিকাশের উদ্দেশ্যোপযোগিতা কার্যকর হয় কেবল তার বিচারবুদ্ধির কল্যাণে। প্রকৃতি মানুষকে বুভুক্ষা, প্লেগ, ক্ষমতাধরের অত্যাচার, পরস্পরের ওপর জুলুম, যুদ্ধের বর্বরতা ইত্যাদির ক্ষেত্রে কৃপা করে নি। কাণ্ট শিক্ষা দিয়েছেন, সামাজিক দুঃখদুর্দশা থেকে পরিত্রাণের জন্য যেমন আবশ্যক নাগরিক সমাজের প্রতিষ্ঠা, তেমনি পৃথক পৃথক এক-একটা রাষ্ট্রের প্রাণবত্তার জন্য প্রয়োজন

সমস্ত রাষ্ট্রের একটা ব্যবস্থারূপী বিশ্ব-নাগরিক অবস্থা, আইনসঙ্গত বহিঃরাজনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা।

ছারখার করা বহু বিধ্বংসী যুদ্ধের পর বিচারবুদ্ধি লোককে বলছে, যে-স্বাভাবিক অবস্থা আইন বলে কিছু জানে না, তা থেকে আইনী অবস্থায় উত্তরণ নিহিত জাতিসমূহের সংঘে যোগদানে। এখানে অতি ছোটো একটা রাষ্ট্রও নিজের নিরাপত্তা ও অধিকারের আশা করতে পারে নিজস্ব শক্তি বা নিজের ন্যায্য বিচারের জোরে নয়, একমাত্র জাতিদের এইরূপ মহাসংঘের কাছ থেকে। কাণ্ট মনে করতেন যে মানবজাতির এমনকি সুদূর ভবিষ্যৎ জীবন সম্পর্কে লোকে উদাসীন থাকতে পারে না, চিরস্থায়ী শান্তির তত্ত্ব নিয়ে তিনি খেটে যান অক্লান্তভাবে। ১৭৯৫ সালে তিনি প্রকাশ করলেন বিশেষ একটি গ্রন্থ — 'চিরস্থায়ী শান্তির দিকে', — 'প্রাথমিক' ও 'চূড়ান্ত' ধারা নিয়ে একটি কূটনৈতিক চুক্তি রূপে তা রচিত। রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে প্রথমে হওয়া চাই একটা প্রাথমিক চুক্তি, যা শান্তিপূর্ণ অবস্থার মৌল প্রতিবন্ধকগুলি দূর করবে। কাণ্ট মনে করতেন, প্রাথমিক শর্তগুলি কার্যে পরিণত হলে আন্তর্জাতিক আস্থা ফিরিয়ে আনা, চিরস্থায়ী শান্তির পথ খুলে দেওয়া সম্ভব। চূড়ান্ত চুক্তিতে রাষ্ট্রসমূহের ফেডারেশন রূপে জাতিসমূহের সংঘ প্রতিষ্ঠার কথা তিনি ভেবেছিলেন। এটা বিশ্বরাষ্ট্র নয়, কেননা তার কোনো সরকারি বাধ্যকরণী ক্ষমতা নেই, এটা সার্বভৌম রাষ্ট্রগুলির স্বেচ্ছামূলক সংঘ, শান্তির সংঘ, শান্তি চুক্তির সঙ্গে তার তফাৎ এই যে শান্তি চুক্তি একটা যুদ্ধ অবসানের জন্য চেষ্টিত আর শান্তি সংঘ সমস্ত যুদ্ধের অবসান করতে চায় বরাবরের জন্য।

যুদ্ধ নিবারণ, চিরস্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা বিষয়ে কাণ্টের ধ্যানধারণা সে পরিস্থিতিতে ছিল অসাধনীয়, তাহলেও এতে তার মূল্য হ্রাস পায় না। আগ্রাসনী যুদ্ধের বিরুদ্ধে, শান্তি ও জাতিতে জাতিতে মৈত্রীর সপক্ষে কাণ্টের বক্তব্যগুলি তাদের প্রগতিশীল ও মানবিক তাৎপর্য বহন করছে শান্তি সংগ্রামের বর্তমান পরিস্থিতিতেও।

কাণ্টের রচনায় অসাধারণ আকৃষ্ট হন বুর্জোয়া ভাবাদর্শী, দার্শনিক, ব্যবহারশাস্ত্রীরা। এই প্রসঙ্গে সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য ভিণ্ডেলবাণ্ড ও রিকার্টের নেতৃত্বে নয়া-কাণ্টপন্থীদের ফ্রেইবুর্গ ও মারবুর্গ (কোহেন, নাটোর্প প্রভৃতি) স্কুল।

ফ্রেইবর্গ স্কুলের প্রতিনিধিরা সমাজের বিকাশে অবজেকটিভ ঐতিহাসিক নিয়মবদ্ধতা অস্বীকার করেন। সমাজজীবনের বৈজ্ঞানিক অনুধাবনের স্থান নেয় পরস্পর বিচ্ছিন্ন আপতিক ঘটনার সরল বর্ণনা। এখানে প্রধান আঘাত হানা হয় ঐতিহাসিক বস্তুবাদের বিরুদ্ধে, যা মনুষ্য সমাজবিকাশের অবজেকটিভ নিয়মাদি নিয়ে ভাবিত। নয়া-কাণ্টপন্থী রিকার্ট এবং এই ধারার অন্যান্য প্রতিনিধি মার্কসবাদের প্রতি তাঁদের বিরূপতা প্রকাশ করেছেন একাধিক বার। 'অবজেকটিভ', 'নিরপেক্ষ' তাত্ত্বিকের দাবিদার রিকার্ট ইতিহাসের বস্তুবাদী বোধকে আক্রমণ করেছেন নাকি তথাকথিত বিশুদ্ধ যুক্তিবাদী দৃষ্টি থেকে।

এই স্কুলের অন্য নেতা ভিণ্ডেলবাণ্ড বিসমার্কের 'প্রবল ইচ্ছাশক্তি' ও 'বাস্তব রাজনীতির' গুণগান গেয়ে মার্কসবাদকে দেখিয়েছেন যৌথ দ্বারা ব্যক্তিকে দমন ও পীড়নের একটা ব্যবস্থা বলে।

মারবুর্গ স্কুলের নয়া-কাণ্টপন্থীরা 'নীতিশাস্ত্রীয় সমাজতন্ত্রের' তত্ত্ব হাজির করেন, শ্রেণী সংগ্রাম, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব, প্রলেতারীয় একনায়কত্বের মার্কসীয় মতবাদ অস্বীকার করে প্রচার করেন কাণ্টের পরম নির্দেশের মতবাদ। 'নীতিশাস্ত্রীয় সমাজতন্ত্র' হল লাসালপন্থীদের, লুই ব্লাঁপন্থীদের মতবাদ, ক. গ্রিউন ও হেসের 'সাঁচ্চা সমাজতন্ত্রের' ধারণা, কাণ্টের নীতিশাস্ত্রীয় মতবাদের সঙ্গে ল. ব্রেনটানো, ইউ. ভোলফ প্রভৃতির 'উদারনীতিকদের নবতম ভাবনার' এক জগাখিচুরি।

নয়া-কাণ্টপন্থীরা দেখাবার চেষ্টা করেছেন যে সমাজতন্ত্রের ভাবনা a priori প্রতিটি মানুষের প্রাণে তার শ্রেণীগত অবস্থা নির্বিশেষে নিহিত আছে আগে থেকেই। তাই প্রয়োজন বিপ্লব নয়, নৈতিক বিবর্তন, যা পেণছবে 'সমাজতন্ত্রে', যার ভিত্তি... গড়ে দেবে, প্রথমত, ঈশ্বরের ভাবকল্প, দ্বিতীয়ত, বুর্জোয়া রাষ্ট্র ও আইনের চিরন্তনতা।

শোধনবাদের প্রবর্তক এ. বার্নস্টাইন 'নীতিশাস্ত্রীয় সমাজতন্ত্রের' নামে মার্কসবাদকে সংশোধন করতে গিয়ে কাণ্টের অজ্ঞেয়বাদী অবস্থানে গিয়ে দাঁড়ান। 'সত্যকার বৈজ্ঞানিক দর্শনের স্রষ্টা' বলে কাণ্টকে উঁচুতে তুলে তিনি তাঁকে অভিহিত করেছেন 'তথাকথিত প্রকৃতিবৈজ্ঞানিক বস্তুবাদের প্রতিনিধিদের অনেকের চেয়ে অনেকবেশি কঠোর বাস্তববাদী'।*

বার্নস্টাইনপন্থীরা সমাজতন্ত্রকে একটা নীতিশাস্ত্রীয় আদর্শ বলে বর্ণনা করেছেন যা কখনো অর্জিত হবার নয়।

১৯০৪ সালে যখন কাণ্টের মৃত্যুদিনের শতবর্ষ পালিত হয়, তখন অধিকাংশ জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পত্রিকায় এমন প্রবন্ধাদি বেরয় যাতে কাণ্ট ও সমাজতন্ত্রের মধ্যে একটা 'সরাসরি যোগসূত্রের' উল্লেখ করা হয়। শুধু তাই নয়, তাঁকে বলা হয় সমাজতন্ত্রের 'প্রতিষ্ঠাতা' ও 'জনক'। যেমন, ফ্রাঙ্কফুর্টের *'Volksstimme'* পত্রিকা ঘোষণা করে যে কাণ্টের কাছে 'বর্তমান সমাজতান্ত্রিক ভাবনা বিজাতীয় ছিল না, তাই তাঁকে 'সমাজতন্ত্রের জনক' বলা হচ্ছে অকারণে নয়'।* সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক ভাবাদর্শীরা লিখলেন যে সমাজতন্ত্রের অন্তিম লক্ষ্য বৈজ্ঞানিকভাবে প্রতিপাদন করা যাবে কেবল 'সামাজিক আদর্শের প্রতি নীতিশাস্ত্রীয় দৃষ্টিভঙ্গি' নিয়ে, এবং 'পরম নির্দেশ সর্বদাই থেকে যাবে সমাজতন্ত্রের নৈতিক মৌল নিয়ম'।**

শোধনবাদীরাও দাবি করেছিলেন যে মার্কস ও কাণ্টের বিশ্ববীক্ষার মধ্যে নাকি কোনো আপোসহীন বিরোধ নেই, তাঁদের মধ্যে বৈপরীত্য নেই, তাঁরা কেবল পরস্পরকে 'পরিপূরণ' করেন। জার্মান দার্শনিক ফর্লাণ্ডার লিখেছেন: 'আমাদের ধ্বনি হওয়া উচিত নয় 'মার্কস থেকে পিছিয়ে কাণ্টের দিকে', হওয়া উচিত 'মার্কস ও কাণ্টকে নিয়ে সামনে'।***

দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের নেতা ও তত্ত্বকারেরা মার্কসবাদের নয়া-কাণ্টপন্থী সংশোধনের প্রতিবাদ প্রায় করেনই নি। যেমন, ১৮৯৮ সালে কাউটস্কি প্লেখানভকে লেখেন: '...খোলাখুলি আমার ঘোষণা করা উচিত যে নয়া-কাণ্টপন্থা আমায় বিক্ষুব্ধ করে সবচেয়ে কম... আমি মনে করি মার্কস ও এঙ্গেলসের অর্থনৈতিক ও ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ অন্তত নয়া-কাণ্টপন্থার সঙ্গে খাপ খায়।'****

মার্কসবাদের নয়া-কাণ্টপন্থী সংশোধনের বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্লেখানভের

অবদান বৃহৎ, যদিও কাণ্ট ও নয়া-কাণ্টপন্থীদের যে সমালোচনা তিনি করেছেন তা ত্রুটিমুক্ত নয়, যে দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন লেনিন। প্লেখানভের ভাবাদর্শীয় সংগ্রামকে সমর্থন ও বিকশিত করেছিলেন ফ. মেরিং, প. লাফার্গ, বুলগেরীয় মার্কসবাদী-বিপ্লবী দ. ব্লাগোয়েভ। তবে মার্কসবাদের নয়া-কাণ্টপন্থী সংশোধনকে চূর্ণ করার কর্তব্যটা সাধন করেন কেবল লেনিন।

বিগত দুই দশকে নয়া-কাণ্টপন্থার খানিকটা উজ্জীবন লক্ষ করা যাচ্ছে। এর সাক্ষ্য হল মস্ত একটা বিরতির পর ১৯৫৪ সালে নয়া-কাণ্টপন্থী 'কাণ্টীয় গবেষণা' পত্রিকার পুনঃপ্রকাশ। পশ্চিম জার্মানিতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে কাণ্টীয় সমাজ।

পশ্চিম ইউরোপ ও আমেরিকায় নয়া-কাণ্টপন্থী 'নীতিশাস্ত্রীয় সমাজতন্ত্রের' পুনরুত্থান ঘটছে। জার্মান বুর্জোয়া দার্শনিক ইউ. এবিনহাউজ 'অধিকারের ধারণা' প্রবন্ধে বলেন যে 'মানবজাতির অধিকার থেকে ব্যক্তিগত আইনের কাণ্টীয় নির্মিতি' হল প্রশ্নের সেরা সমাধান, আইনী প্রথা-প্রতিষ্ঠানের মর্মার্থ নিয়ে বিতর্ক তাতে বন্ধ হবে।*

পশ্চিম জার্মানির প্রফেসর ফ. ডেলেকাট বর্তমান সমাজজীবনের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাদির সমাধানে কাণ্টের ভাবধারায় চালিত হবার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি লিখেছেন: 'সম্পত্তির বৈধতার কাণ্টীয় নির্ণয়ে ধরে নেয়া হয় যে মার্কস যা বলতে চান, ব্যক্তিকে সেইরূপ স্বার্থপর ব্যক্তিতে পরিণত করার প্রতিবন্ধকতা এবং রাষ্ট্র ও সমাজকে নিবিড়ভাবে মিলিয়ে দেবার জন্য নীতিশাস্ত্রীয় ও রাজনৈতিক দিক থেকে ব্যবহারিক বিচারবুদ্ধিই যথেষ্ট।'** এখানে 'নীতিশাস্ত্রীয় সমাজতন্ত্রের' ধ্যানধারণা যে পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে দৃঢ় করতে বাধ্য সেটা প্রকাশ পাচ্ছে। এই প্রসঙ্গে 'ব্যক্তির নৈতিক আত্মোন্নতিকে' দেখা হয়েছে 'সমাজতন্ত্রের' একমাত্র পথ বলে।

বর্তমান পুঁজিবাদের অত্যধিকাংশ ভাবাদর্শীরা যেখানে কাণ্টের উত্তরাধিকার থেকে বেছে নিয়ে মহা মনীষীর সেইসব দৃষ্টিভঙ্গির গুণগান করেন যা কোনো না কোনো ভাবে অচল হয়ে যাওয়া বুর্জোয়া রাজনৈতিক-ব্যবহারশাস্ত্রীয় কাঠামোর সংরক্ষণ ও তার পক্ষে ওকালতির কাজে লাগে,

সেখানে মার্কসবাদী গবেষকরা একেবারেই ভিন্ন অবস্থান থেকে অগ্রসর হন কাণ্টের দৃষ্টিভঙ্গি অনুধাবনে।

কাণ্টের রাজনৈতিক-আইনী তত্ত্বের বহুসংখ্যক যেসব দিক তাদের সামাজিক-শ্রেণীগত অন্তর্বস্তুতে সত্যিই রক্ষণশীল ভূমিকা নিতে পারে (ও নিচ্ছে), সেগুলিকে একটুও চাপা না দিয়ে এই গবেষকরা তুলে ধরেন রাষ্ট্র ও আইন বিষয়ক একসারি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার বৈজ্ঞানিক উপলব্ধিতে রীতিমতো ইতিবাচক যে অবদান কাণ্ট যোগ করেছেন সেইটে। প্রতিক্রিয়াশীল গণতন্ত্রবিরোধী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য সাম্রাজ্যবাদের অন্তর্নিহিত প্রবণতার বিরুদ্ধে সংগ্রামে তাঁরা সঙ্গত কারণেই জোর দেন কর্তৃত্বমূলক-পুলিসি ব্যবস্থার যে সমালোচনা কাণ্ট করেছিলেন, তার গুরুত্বে।

সামাজিক চিন্তার বিখ্যাত ঐতিহাসিক মানফ্রেড বুর ও হার্ড ইর্লিট্স (গণতান্ত্রিক জার্মানি) সঠিকই বলেছেন: ফরাসি আলোকপ্রাপ্তির (রুসো) প্রভাবে থেকে এবং সাধারণ ইউরোপীয় আলোকপ্রাপ্ত আন্দোলনের সঙ্গে একমত হয়ে নিজের ব্যবহারিক দর্শনে কাণ্ট এই প্রশ্নে মনোনিবেশ করেন: মানবজাতি কি অবিরাম প্রগতি ও উত্তমের পথ ধরে চলেছে? এ প্রশ্নের তিনি উত্তর দেন মানববাদী ধারায় এবং কুণ্ঠাহীন ইতিবাচক অর্থে, তবে তাঁর ঘোষিত বুর্জোয়া দাবিগুলির রূপায়ণকে তিনি দেখেছিলেন সামাজিক সম্পর্কগুলির পরিবর্তনে নয়, একমাত্র আত্মিক অগ্রগতিতে। স্বাধীনতা, সমতা ও ন্যায়, মানবিক মর্যাদা, চিরস্থায়ী শান্তি ইত্যাদি বিষয়ে তিনি যেসব ভাবনা হাজির করেছিলেন ও তাত্ত্বিক দিক দিয়ে প্রতিপন্ন করেছিলেন উদীয়মান, ক্ষমতার দিকে আগুয়ান বুর্জোয়ার অবস্থান থেকে যা সুসিদ্ধ, তা তাঁর মানবজাতি বিষয়ক দর্শনের কাঠামোর মধ্যে সর্বদা রূপায়ণে সচেষ্ট ভাবনা হলেও পরিবর্তমান ঘটনাচক্রের দিকে কখনো তাদের অভিমুখ ছিল না। এগুলি হল নিতান্ত ধরে নেয়া গোছের ধ্বনি।

তাহলেও কাণ্ট কার্যত তাত্ত্বিক দর্শনের ভিত্তিতে বিকশিত ও অগ্রণী বুর্জোয়া ভাবধারাকে সূত্রবদ্ধ করেছিলেন সমগ্র মানবজাতির আরো অগ্রগতির অপরিবর্তনীয় মানবিক দাবির আকারে। লোকেদের উন্নত ভবিষ্যতের জন্য, সামাজিক সহবসতির সর্বাধিক মানবিক ও গণতান্ত্রিক রূপগুলির জন্য যোদ্ধাদের কাছে কাণ্ট তাই ছিলেন, আছেন এবং সর্বদা থাকবেন।



§ ১৩। গেওর্গ ভিলহেল্ম ফ্রিডরিখ হেগেল

গেওর্গ ভিলহেল্ম ফ্রিডরিখ হেগেল (১৭৭০-১৮৩১) একজন প্রতিভাবান দ্বন্দ্ববাদী-মনীষী, যাঁর সৃজনী কীর্তি দার্শনিক ও রাজনৈতিক-আইনী চিন্তার গোটা ইতিহাসে এক অসামান্য দিক্‌স্তম্ভ।

প্রথম স্বাধীন ধারণাগুলির আদি ঝলক থেকে শুরু করে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির সুসম্পূর্ণতাসূচক সৃষ্টিকর্ম অবধি হেগেলের কর্মজীবন অক্লান্ত অন্বেষা ও এক অখণ্ড বিশ্ববীক্ষার লক্ষ্যে গবেষণার সুসঙ্গতরূপে গভীরতাসাধন আর সম্পূর্ণীকরণে বিধৃত।

জিমনাসিয়ামে শিক্ষার পূর্বেই হেগেল প্রাচীন ইতিহাস ও সাহিত্যে আগ্রহী হয়ে ওঠেন এবং তাঁর মতামতে লক্ষিত হতে থাকে প্রাচীন গ্রীসের

খানিকটা আদর্শায়ন, এবং রাষ্ট্রকে লোকেদের সত্যকার নৈতিক মেল বলে দেখার প্লেটো- ও আরিস্টটলীয় চিন্তার দিকে ঝোঁক।

১৭৮৮-১৭৯৩ সালে হেগেল টিউবিনগেন বিশ্ববিদ্যালয়ে ঈশ্বরতত্ত্বের ছাত্র। হেগেলের বিশ্ববীক্ষার রূপলাভ এবং তাঁর পরবর্তী সমস্ত আত্মিক বিকাশের ওপর বিপুল প্রভাব ফেলে ফরাসি বিপ্লব। এ বিপ্লবের মূল ভাবনাকে মেনে নিলেও এবং নিজের সৃজনী বিবর্তনের আদি পর্বে সামন্ততন্ত্রবিরোধী, স্বৈরতন্ত্রবিরোধী, বুর্জোয়া বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তার ধারণার সঙ্গে একমত হলেও জ্যাকোবিন সন্ত্রাসে আপত্তি করেন তিনি, রবেস্পিয়ারের পক্ষপাতীদের তীব্র সমালোচনা করেন।

সে সময়, যা দেখা যায় তাঁর টিউবিনগেনকালীন 'জনগণের ধর্ম'এর* অংশবিশেষে, হেগেলের চিন্তা বিকশিত হচ্ছিল প্রাক্‌খিস্টীয় প্রাচীন নগর-রাষ্ট্রের নৈতিক অখণ্ডতা আর ব্যক্তিগত অধিকার ও মানুষের স্বাধীনতা বিষয়ে ফরাসি বিপ্লবের ধারণার একটা সংশ্লেষ ঘটাবার দিকে।

বিশ্ববিদ্যালয় শেষ করার পর সে সময় খ্রিস্ট ধর্ম সম্পর্কে সন্দিহান হেগেল ধর্মীয় পদ প্রত্যাখ্যান করেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজের আশায় কিছুকাল বার্ণে (১৭৯৩-১৭৯৬) এবং মেন তীরের ফ্রাঙ্কফুর্টে (১৭৯৭-১৮০০) গৃহশিক্ষকের কাজ নেন।

এই বছরগুলোয় হেগেলের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির চরিত্র ছিল সুস্পষ্ট সামন্ততন্ত্রবিরোধী। সাবেকী, অচল হয়ে পড়া ব্যবস্থাকে তরুণ হেগেল প্রায়ই প্রকাশ্যে আক্রমণ করেছেন (যেমন, দৃষ্টান্তস্বরূপ, বার্ণের অভিজাততান্ত্রিক সংবিধানের ওপর মন্তব্যে, কিংবা আরো সুনির্দিষ্ট রূপে ভিউর্টেমবার্গের রাষ্ট্রব্যবস্থার সমালোচনায়),** যা এসেছে বৈপ্লবিক-সমালোচনামূলক ও বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক অবস্থান থেকে।

১৮০১ সালে হেগেল তাঁর থিসিস ('গ্রহগুলির কক্ষপথ প্রসঙ্গে') সমর্থন করেন এবং ইয়েন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করতে থাকেন (১৮০০-১৮০৬)।

সেখানে দর্শনের ওপর পাঠভাষণ দেবার সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিক বিধির একটা কোর্সেও অধ্যাপনা চালিয়ে যান। ১৭৯৮-১৮০২ সালে হেগেল বিস্তৃত একটা রাজনৈতিক-আইনী বিষয়বস্তু, 'জার্মানির সংবিধান'* নিয়ে মাঝে মাঝে খেটেছেন, লেখাটা সমাপ্ত ও তাঁর জীবদ্দশায় প্রকাশিত হয় নি। খণ্ড-বিখণ্ড জার্মানির ব্যাপার-স্যাপারের ওপর সমালোচনী আলোকপাত করে হেগেল কেন্দ্রীভূত জার্মান রাইখের পুনরুদয়ের প্রয়োজনীয়তা প্রতিপন্ন করেছেন, যার থাকবে একক রাজনীতি, ক্ষমতা ও আইনপ্রণয়ন। জার্মানিতে সংবিধান ও বুর্জোয়া প্রতিনিধিত্বমূলক ব্যবস্থা প্রবর্তনের পক্ষে দাঁড়িয়েছেন হেগেল। 'স্বাভাবিক বিধির বৈজ্ঞানিক ভাষ্যের প্রণালী, ব্যবহারিক দর্শনে তার স্থান এবং জারি করা আইন বিষয়ক বিদ্যার সঙ্গে তার সম্পর্ক প্রসঙ্গে'** রচনায় হেগেল আলোচনা করেছেন আইন সম্পর্কে তাঁর বিকাশমান ধারণার অনেক গুরুত্বপূর্ণ কথা নিয়ে। স্বাভাবিক বিধির বৈজ্ঞানিক ভাষ্যের তিনটি প্রণালীর (আভিজ্ঞতিক, বিধিগত ও পরম) মধ্যে পার্থক্য করে তিনি প্রথম দুটি ধরনের সমালোচনা করেছেন পরম প্রণালীর অবস্থান থেকে। হেগেল তাঁর অবস্থানের অর্থ বোঝাতে গিয়ে বলেছেন, পরম ও সত্যকার নৈতিকতা হল সাধারণ ও আঙ্গিক একটা অখণ্ডতা, জনগণের মর্মাত্মা, আর স্বতন্ত্র এক-একজন ব্যক্তি, তার নৈতিকতা ও অধিকার বাস্তব অর্থ লাভ করে কেবল নৈতিক সমগ্রতার অংশ হিশেবে।

ইয়েন পর্বের অন্য একটা রচনায় ('নৈতিকতার তন্ত্র')*** হেগেল নৈতিকতাকে বর্ণনা করেছেন বিমূর্ত ব্যক্তিত্ব, নীতিসূত্র ও পরিবারের সংশ্লেষ বলে। হেগেলের ১৮০৫-১৮০৬ সালের ভাষণগুলি গ্রথিত হয়েছে 'ইয়েনের বাস্তব দর্শন'এ****। এতে তিনি তাঁর দর্শনতন্ত্রের প্রথম একটা ধারণা দেন, যাতে রাজনৈতিক-আইনী সমস্যাদিকে তুলে আনা হয়েছে আত্মার দর্শনের ক্ষেত্রে এবং আলোচিত হয়েছে সাবজেকটিভ আত্মা (ইচ্ছার সমস্যা), বাস্তবিক আত্মা (চুক্তি, অপরাধ ও শাস্তি, আইনের প্রশ্ন) ও সংবিধান সংক্রান্ত বিভাগে। ১৮০৭ সালে প্রকাশিত হয় 'আত্মার প্রতীতিতত্ত্ব'। এতে তিনি

আলোচনা করেন, বিকাশমান চৈতন্যের বিভিন্ন স্তর নিয়ে, বোধের দার্শনিক তাৎপর্যকে দ্বান্দ্বিক বিশ্লেষণের বিশেষ একটা সাধিত্র বলে প্রতিপন্ন করেন।

১৮০৭ সালের মার্চ থেকে ১৮০৮ সালের অক্টোবর অবধি হেগেল থাকেন বাম্বের্গে, 'বাম্বের্গ গেজেট' নামক দৈনিক পত্রিকার সম্পাদনা করেন। সম্পাদনা কর্মের গুরুভার এবং সেন্সর কর্তাদের সঙ্গে খটাখটিতে হেগেল ক্লিষ্ট হন, নুরেমবার্গে চলে আসেন তিনি এবং সেখানে ১৮০৮-১৮১৬ সাল অবধি জিমনাসিয়ামের রেক্টর ও আচার্য-অধ্যাপকের পদে থাকেন।

ইয়েন পর্বের শেষ দিকেই নেপোলিয়নের ব্যক্তিত্ব এবং ঐতিহাসিক দিক থেকে প্রগতিশীল তাঁর ব্যবস্থাগুলিতে হেগেল খুবই উচ্ছ্বসিত হন এবং তাঁকে অভিহিত করেন রাষ্ট্রীয় আইনের মহাগুরু, 'বিশ্ব অধ্যাত্মা' ইত্যাদি বলে।* জার্মানির আধাসামন্ততান্ত্রিক অবস্থাকে বুর্জোয়া অধিকার ও স্বাধীনতা, সাংবিধানিক-প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠানাদির প্রেরণায় প্রগতিশীল পুনর্গঠনের ভরসা তিনি পেয়েছিলেন নেপোলিয়ন এবং তাঁর সংস্কারমূলক ক্রিয়াকলাপে।

নুরেমবার্গ পর্বে হেগেল প্রকাশ করেন 'যুক্তিবিদ্যার বিজ্ঞান'। তাতে 'আত্মার প্রতীতিতত্ত্ব'এর সিদ্ধান্তাদি ব্যবহার করে প্রজ্ঞানের পরম প্রণালী—বোধ আলোচিত হয়েছে। তাঁর মতে, এই পথেই দর্শন হয়ে ওঠে অবজেকটিভ, প্রমাণসিদ্ধ বিদ্যা। নিজের পদ্ধতিকে দুরানুমানিক আখ্যা দিয়ে হেগেল তাকে ঐক্যের মধ্যে বিপরীতের, ইতির মধ্যে নেতির দ্বান্দ্বিক উপলব্ধি বলে দেখিয়েছেন। 'যুক্তিবিদ্যার বিজ্ঞান'এ কেবল দার্শনিক হেগেল নয়, সামাজিক-রাজনৈতিক, নৈতিক ও ঐতিহাসিক সমস্যাদির গবেষক হেগেলেরও মতামতের সারসংক্ষেপ দেয়া হয়েছে!

অখণ্ড দর্শনতন্ত্রের অঙ্গ হিশেবে রাজনৈতিক-আইনী বিষয়বস্তুর ওপর হেগেল আলোকপাত করেছেন 'দর্শন বিষয়ে প্রাথমিক নিরীক্ষা' গ্রন্থে। এতে তিনি অধিকার ও স্বাধীনতাকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন একটা ব্যাপক ক্ষেত্র নিয়ে। হেগেলের সহানুভূতি আইন দ্বারা অবশ্য-অবশ্যঁ সীমিত বংশগত রাজতন্ত্রের দিকে, যাকে তিনি স্বৈরতন্ত্রের বিপরীতে রেখেছেন।

নেপোলিয়নের পতনকে হেগেল দেখেছেন একটা বিশ্ব-ঐতিহাসিক ট্র্যাজেডি বলে। 'কসাক, বাশকির, প্রাশীয় দেশপ্রেমিক' এবং 'যতসব অপূর্ব

মুক্তিদাতাদের'* বিজয়ের প্রতি তিনি নেন নেতিবাচক মনোভাব। জার্মান জাতীয় বিরোধিতা — ছাত্রদের আন্দোলনকে (বুর্শেনশাফট) তিনি দেখেছেন খুবই সমালোচনার চোখে।

১৮১৬ সালের অক্টোবর থেকে হেগেল গেইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে আচার্য-অধ্যাপক। এই সময় (১৮১৭) তিনি প্রকাশ করেন 'ভিউর্টেমবার্গ রাজ্যের সম্প্রদায় সভার রিপোর্ট'। এতে তিনি বংশগত, সংবিধান দ্বারা বিধিবদ্ধ, সম্প্রদায়গত প্রতিনিধিত্বমূলকতায় সীমাবদ্ধ রাজতন্ত্র সমর্থন করেছেন।** গেইডেলবার্গ পর্বে প্রকাশিত হয় হেগেলের 'দর্শন বিদ্যার বিশ্বকোষ' (১৮১৭), তার তৃতীয় অংশ, 'আত্মার দর্শন'এ প্রায় পরিসমাপ্ত আকারে আছে হেগেলের আইনের দর্শনের মৌল বক্তব্যগুলি।

১৮১৮ সালের অক্টোবর থেকে মৃত্যু অবধি (১৮৩১ সালের ১৪ নভেম্বর) হেগেল বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য-অধ্যাপক। এই পর্বে তাঁর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির রক্ষণশীল দিকগুলি বৃদ্ধি পায়, তবে তাঁর সমকালীন জার্মানির বুর্জোয়া পুনর্গঠনের দৃঢ়বিশ্বাসী পক্ষপাতী থেকেই যান তিনি। বার্লিনে হেগেলের সৃষ্টিকর্ম ওঠে তুঙ্গবিন্দুতে। ১৮২০ সালের অক্টোবরের গোড়ায় বেরয় 'আইনের দর্শন' — রাজনৈতিক মতবাদের গোটা ইতিহাসের মধ্যে অসামান্য একটি রচনা।

বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে হেগেল যে ভাষণগুলি পাঠ করেন (ইতিহাসের দর্শন, দর্শনের ইতিহাস, ধর্মের ইতিহাস প্রভৃতি), সেগুলি কেবল তাঁর মৃত্যুর পরেই প্রকাশিত হয় তাঁর শিষ্যদের দ্বারা। এই রচনাগুলির মধ্যে রাষ্ট্রিক ও আইনী সমস্যাদির দৃষ্টিকোণ থেকে সর্বাধিক আগ্রহোদ্দীপক হল 'ইতিহাসের দর্শন,' যা স্বাধীনতার চেতনায় বিশ্ব-ঐতিহাসিক প্রগতির ওপর আলোকপাত করেছে।

হেগেলের জীবদ্দশায় প্রকাশিত শেষ রচনা 'সংস্কারের ব্রিটিশ বিল'।*** এতে তিনি পরিষ্কার রক্ষণশীল অবস্থান থেকে ইংলন্ডের সংস্কার বিলের বিরোধিতা করেছেনী, তাঁর মতে, ওতে নাকি জনগণের ভোটাধিকার বড়ো বেশি বাড়ানো হয়েছে।

তবে বার্লিন পর্বে হেগেলের রচনা শুধুই যে রক্ষণশীল তা নয়। সংকুচিত রূপে হলেও তাতে আছে দ্বান্দ্বিকতা, পরিবর্তন, সমালোচনা ও নবায়নের প্রেরণা।

রাষ্ট্র, আইন, সমাজ বিষয়ে হেগেল তাঁর মতবাদ প্রণালীবদ্ধ রূপে সংরচিত করেছেন আইনের দর্শনে, যা হল অবজেকটিভ অধ্যাত্মার দার্শনিক বিশ্লেষণ। দ্বান্দ্বিকভাবে বিকাশমান অধ্যাত্মার তিনটি মৌল ধাপ হল — সাবজেকটিভ অধ্যাত্মা (নৃবিদ্যা, প্রতীতিবিদ্যা, মনোবিদ্যা), অবজেকটিভ অধ্যাত্মা (আইন, নীতিশাস্ত্র, নৈতিকতা) এবং পরম অধ্যাত্মা (শিল্পকলা, ধর্ম, দর্শন)। অতএব হেগেলীয় রাজনৈতিক-আইনী মতবাদের বিষয়বস্তু (সমাজ, রাষ্ট্র, আইন) পড়ছে অবজেকটিভ অধ্যাত্মার ধাপে, তাহলেও হেগেলের মতবাদে তার ওপর আলোকপাত ও তার মূল্যায়ন করা হয়েছে দার্শনিক ধারায়, অর্থাৎ পরম অধ্যাত্মার অবস্থান থেকে। 'আইনের দর্শন'এ তিনি বলেছেন যে 'আইন বিষয়ক বিজ্ঞান হল দর্শনের অঙ্গ। সুতরাং তাকে ধারণা থেকে বিকশিত করতে হবে ভাবকল্প, যা হল বিষয়টার চৈতন্য, কিংবা, যা একই কথা, বিষয়টার নিজেরই অন্তর্নিহিত বিকাশকে পর্যবেক্ষণ করতে হবে'*।

অবজেকটিভ অধ্যাত্মার ক্ষেত্রের দিকে দার্শনিক অভিগমনে ধরে নেয়া হয় 'যুক্তিবিদ্যার বিজ্ঞান'এ রচিত হেগেলীয় দ্বন্দ্বতত্ত্বের নীতি, মডেল ও নিয়মের প্রয়োগ, কেননা আইনের দর্শন সমেত 'বিশেষিত দার্শনিক বিদ্যাগুলির', হেগেলের মতে, গবেষণার নিজস্ব বিশেষ পদ্ধতি নেই। তাছাড়া, আইন ধারণাটার রূপলাভকেই হেগেল ব্যাখ্যা করেছেন আইনের আসল দর্শনের বাইরে এবং তার আগে। অবজেকটিভ অধ্যাত্মার দর্শন শুরু করার সময়েই হেগেল তাঁর হাতে রেখেছেন সাবজেকটিভ অধ্যাত্মার দ্বান্দ্বিক বিকাশের গতিপথে প্রস্তুত আইনের ধারণার সিদ্ধান্তগুলি। সাবজেকটিভ অধ্যাত্মা থেকে অবজেকটিভ অধ্যাত্মায় উৎক্রমণেই সূচিত হয় স্বাধীনতা ও আইনের বোধেও উৎক্রমণ। অবজেকটিভ অধ্যাত্মার ক্ষেত্রে স্বাধীনতা প্রথম বাস্তব, বিদ্যমান অস্তিত্বের রূপ লাভ করে। অধ্যাত্মা তার সাবজেকটিভ রূপ থেকে বহির্গত হয়ে তার স্বাধীনতার বাহ্যিক বাস্তবতাকে জানে ও

অবজেকটিভ করে তোলে — অধ্যাত্মার অবজেকটিভিটি প্রবেশ করে নিজের অধিকারে। আইনের দর্শনে হেগেল আইনের ধারণাটার বাস্তবতায় পরিণতির আকারে অবজেকটিভ দিক থেকে স্বাধীন অধ্যাত্মাকে উন্ঘাটনের রূপগুলির ওপরেই আলোকপাত করেছেন। হেগেলের মতে, বাস্তবতায় বোধের রূপায়ণ যেহেতু ভাবকল্প (আইডিয়া), তাই আইনের দর্শনের বিষয়বস্তু হল আইনের ভাবকল্প — আইনের বোধ ও তার বাস্তবায়ন। আইনের ভাবকল্প, যেটাই হল স্বাধীনতা, সেটা হেগেলের মতবাদে অবারিত হয় আইনের জগতে, এবং অবজেকটিভ অধ্যাত্মার ক্ষেত্রটা হয়ে দাঁড়ায় আদর্শ আইনী বাস্তবতা।

হেগেলের অবজেকটিভ ভাববাদের (চিন্তা ও অস্তিত্ব, বাস্তবতা ও বিচারবুদ্ধির অভিন্নতা) মৌল দার্শনিক নীতি অনুসারে আইনের দর্শনে অবজেকটিভ অধ্যাত্মার যে জগৎ, তার প্রজ্ঞান মিলে যায় তার নির্মিতি, পুনর্গঠনের সঙ্গে। বাস্তবে আইনের ধারণাটার রূপায়ণকে হেগেল ব্যাখ্যা করেছেন এই ধারণাটার মূর্তায়নের একটা দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়া, তার বিমূর্ত রূপ থেকে ক্রমেই তার মূর্তনির্দিষ্ট রূপের দিকে গতি বলে। ধারণার এরূপ আত্মগভীরতাসাধনের গতিপথে আইনের বোধের বিমূর্ত রূপগুলি উদ্‌ঘাটিত করে তাদের অসিদ্ধি ও কৃত্রিমতা এবং পরবর্তী, বেশি মূর্ত রূপে 'বিলীন হয়'। আইন এই যে সাধারণভাবে বিদ্যমান অস্তিত্ব, যা হল স্বাধীন ইচ্ছার বিদ্যমান অস্তিত্ব, তার দ্বান্দ্বিকতা মিলে যায় স্বাধীনতা রূপায়ণের রাজত্ব হিশেবে আইনব্যবস্থার দার্শনিক নির্মিতির সঙ্গে। হেগেলের মতে, ইচ্ছার সারার্থ ও সংজ্ঞা হল স্বাধীনতা। স্বাধীনতাই হল ইচ্ছা। ব্যাপারটা এইভাবেই চলছে, কেননা হেগেলীয় দর্শনে মনন ও ইচ্ছা পরস্পর থেকে পৃথক দুটি সামর্থ্য নয়, একই মনন সামর্থ্যের পৃথক দুটি উপায় — তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক।

হেগেলীয় আইনের দর্শনে 'আইন' কথটা নিম্নোক্ত তিনটি মৌল তাৎপর্য ধরে: ১) আইন মানে স্বাধীনতা ('আইনের আইডিয়া'), ২) আইন মানে স্বাধীনতার নির্দিষ্ট একটা পর্যায় ও রূপ ('বিশেষ আইন'), ৩) আইন মানে বিধান ('জারি করা আইন')।

১। অবজেকটিভ অধ্যাত্মার ধাপে, যেখানে সমস্ত বিকাশ নির্ধারিত হয় স্বাধীনতার আইডিয়া দিয়ে, সেখানে 'স্বাধীনতা' আর 'আইন' একই অর্থ প্রকাশ করে; এই দিক থেকে হেগেলের আইনের দর্শনকে বলা যায়

'স্বাধীনতার দর্শন'। 'স্বাধীনতা' ও 'আইনের' মধ্যে সম্পর্কের মধ্যস্থতা করে স্বাধীন ইচ্ছার দ্বান্দ্বিকতা।

২। রূপায়িত স্বাধীনতার রাজত্ব হিশেবে আইনব্যবস্থা হল 'বিশেষ আইনের' সোপানশ্রেণী (তার বিমূর্ত রূপ থেকে মূর্ত রূপ অবধি)। স্বাধীনতার আইডিয়ার আত্মগভীরতাসাধনের (সুতরাং, আইনের বোধটার মূর্তায়নের) প্রতিটি ধাপ হল স্বাধীনতার (স্বাধীন ইচ্ছার) নির্দিষ্ট, এক-একটা বিদ্যমান অস্তিত্ব, তার মানে, তা 'বিশেষ আইন'। বিমূর্ত আইন, নৈতিকতা, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রও এইরূপ বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত। এই 'বিশেষ আইন' দেয়া হয়েছে ইতিহাস ও পরম্পরার দিক থেকে একই কালে (অবজেকটিভ অধ্যাত্মার একই গঠনের পরিসীমার মধ্যে); এগুলি সীমাবদ্ধ, সমন্বিত, আবার পরস্পর সংঘর্ষেও আসতে পারে। পরবর্তী 'বিশেষ আইন' যা তার পূর্ববর্তী, বেশি বিমূর্তকে দ্বান্দ্বিকভাবে 'অপসারিত' করে, তা-ই হল 'বিশেষ আইনের' ভিত্তি ও সত্যসার। মূর্ত 'বিশেষ আইন' বিমূর্তের চেয়ে অগ্রগণ্য। 'বিশেষ আইন' সোপানশ্রেণীর শীর্ষে আছে রাষ্ট্রের আইন। বাস্তবতায় সমস্ত ধাপের (ব্যক্তি, তার বিবেক, অপরাধী, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র) 'বিশেষ আইন' যেহেতু প্রদত্ত একইকালে, সুতরাং প্রকৃত অথবা সম্ভাব্য সংঘাতের মধ্যে, তাই হেগেলের ছক অনুসারে চূড়ান্ত সত্য কেবল উচ্চতন ধাপের আইন।

৩) বিধানরূপে আইন (জারি করা আইন) হল 'বিশেষ আইনগুলির' একটা। আইন কথাটার তাঁর নিজস্ব ব্যাপক এবং বহু ক্ষেত্রে বেশ যথেচ্ছ প্রয়োগ থেকে সর্বস্বীকৃত অর্থে চলে আসার উল্লেখ প্রসঙ্গে হেগেল লিখেছেন: 'আইন নিজে যা, সেটা রাখা হয়েছে তার অবজেকটিভ ক্ষেত্রে বিদ্যমান অস্তিত্বে, অর্থাৎ তাকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে চিন্তার দ্বারা চেতনা লাভের জন্য এবং যেটা আইন বলে গণ্য, যা বিধান বলে বিদিত, সেভাবেও তাকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে; এই নির্দিষ্টকরণের কল্যাণে আইন হল সাধারণভাবে জারি করা আইন।'*

আইন নিজে যা, বিধানপ্রণয়ন মারফৎ তাকে বিধানে পরিণত করায় আইন পায় একটা সর্বসাধারণ ও সত্যকার সুনির্দিষ্ট রূপ। আইনপ্রণয়নের বিষয় হতে পারে কেবল মানবিক সম্পর্কের বাহ্য দিকগুলি, কিন্তু তাদের অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রটা নয়।

বিধান ও আইনের মধ্যে পার্থক্য করলেও তাঁর নির্মিতিতে হেগেল তাদের মধ্যে বৈপরীত্য বাদ দিতে চেয়েছেন। 'স্বাভাবিক বা দার্শনিক বিধির পার্থক্যকে তাদের মধ্যে বৈপরীত্য ও বিরোধে পরিণত করাকে' তিনি একটা প্রকান্ড বোধভ্রান্তি বলে গণ্য করেছেন।*

স্বাভাবিক বিধির বিভিন্ন মতবাদ (সফিস্ট, প্লেটো, আরিস্টটল, হবস, রুসো, কান্ট, ফিখ্‌টে) তথা আইনের ঐতিহাসিক স্কুলের প্রতিনিধিদের (হুগো, সাভিনি) ধারণা থেকে আইনের হেগেলীয় ধারণার বেশ পার্থক্য থাকলেও তিনিও বিধান ও আইনের মধ্যে সংঘাত এড়াতে পারেন নি। সাধারণ আকারে হেগেলীয় ধারণায়ও বিধান হল আইনের পূর্ববর্তী; আইন যা তার সবটায় নয়, শুধু নির্দিষ্ট একটা ধাপের আইনকে সূত্রবদ্ধ করা হয়েছে বিধান বলে, আইনপ্রণয়নের প্রক্রিয়ায় আইনের অন্তর্বস্তু বিকৃত হতে পারে; বিধানরূপে প্রদত্ত সবকিছুও আবার আইন নয়, কেননা জারি করা আইনের মধ্যে কেবল আইনসঙ্গতটাই বৈধ ও ন্যায়সম্মত। তাই বিধানের কাছে আইন হল একটা স্বকীয় ধরনের নিম্ন আদালত ও মূল্যায়নমূলক ক্ষেত্র। তবে আইনের হেগেলীয় দর্শনে কথাটা বিধান ও আইনের বৈপরীত্য নিয়ে নয়, কেবল আইনের একই বোধের মূর্তায়নের বিভিন্ন ধাপে তার সংজ্ঞার অভ্যন্তরীণ পার্থক্য নিয়ে। এইভাবে আইনের হেগেলীয় দর্শনতন্ত্রে বিধান ও আইনের পার্থক্যসূচক স্বাভাবিক বিধির নীতি থাকলেও এ তন্ত্র রচিত হয়েছে নীতিটার পরিব্যাপ্তি নয়, তার অপসারণ ও অলীকতা প্রদর্শনের পটে।

আইন বিষয়ে হেগেলের ধারণার কতকগুলি বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট হবে হেগেল যাকে বলেছেন আইন বিষয়ে ঐতিহাসিক মনোভঙ্গি তার সঙ্গে তুলনায়। জারি করা আইনের মধ্যে ঐতিহাসিক দিকটা প্রকটিত করায় মঁতেস্ক্যর অবদান মেনে নিয়ে হেগেল বলেছেন যে আইনে প্রতিফলিত হয় নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর জাতীয় চরিত্র, তার ঐতিহাসিক বিকাশের পর্যায়, তার জীবনের স্বাভাবিক পরিস্থিতি প্রভৃতি। কিন্তু হেগেল সেই সঙ্গে মন্তব্য করেছেন যে নিছক ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ (এবং তুলনামূলক-ঐতিহাসিক প্রজ্ঞান) নিরীক্ষার দার্শনিক (বোধমূলক) পদ্ধতি থেকে পৃথক এবং তার বাইরেকার বিষয়। আইন ও রাষ্ট্রের ঐতিহাসিক বিকাশের কোনো একটা অবস্থাচক্র তাদের মর্মার্থের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত নয়। ঐতিহাসিক বিষয়বস্তু আপনা

থেকে দার্শনিক প্রজ্ঞা নয়, হেগেলের ধারণায় তা দার্শনিক তাৎপর্য অর্জন করে কেবল তখন, যখন তা উদ্‌ঘাটিত হয় দার্শনিক বোধের বিকাশের একটা দিক হিশেবে। এই অবস্থান থেকে হেগেল আইনের ঐতিহাসিক স্কুলের তত্ত্বকারদের তীব্র সমালোচনা করেছেন, বলেছেন যে তাদের মধ্যে বিচারবুদ্ধির দৃষ্টিকোণ নেই, ইতিবাচক, ঐতিহাসিক তথ্যের সর্বোচ্চ প্রামাণিকতা অস্বীকার করেছেন তিনি। হেগেলের মতে, সাধারণ আইনকে আইনপ্রণয়ন ও কোডবদ্ধকরণের বিপরীতে দাঁড় করানো অসিদ্ধ। আইনপ্রণয়নের সুবিন্যাস ও কোডবন্ধনে হেগেল যে উচ্চ মূল্য দিয়েছেন তার কারণ: তিনি এগুলিকে কেবল ব্যবহারশাস্ত্রীয় টেকনিকাল ব্যাপার বলে দেখেন নি, গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক-রাজনৈতিক ব্যাপার বলেই গণ্য করেছেন। কথাটা প্রধানত ছিল সামন্ততান্ত্রিক-আইনী বিভিন্নতা অতিক্রমণ, আইনের সামন্ততান্ত্রিক থেকে বুর্জোয়া রূপে উত্তরণ নিয়ে। বিশেষ তীব্র সমালোচনা হেগেল করেছেন ফন গালেরকে যাঁর মতবাদে বিধানের চরম ঐতিহাসিক-আইনী সমালোচনার সঙ্গে মিলেছিল রাজবংশ পুনঃপ্রতিষ্ঠার অর্থে স্বাভাবিক-আইনী মতবাদের ভাষ্য।

মানবিক সম্পর্ক ও প্রতিষ্ঠানে স্বাধীনতার অবজেকটিভ আকারলাভের রূপগুলির ওপর আলোকপাতে হেগেল এগিয়েছেন যুক্তিবাদ ও ইতিহাসবাদের দ্বান্দ্বিক ঐক্য থেকে। এই অবস্থান অনুসারে, স্বাভাবিক-আইনী মতবাদের প্রতিনিধিদের দৃষ্টিভঙ্গি ঐতিহাসিক নির্দিষ্টতা বর্জিত, এ দৃষ্টিভঙ্গি বিমূর্ত ও ইউটোপীয়। হেগেলের মতে, আইনের ঐতিহাসিক স্কুলের ইতিহাসবাদও অসিদ্ধ, তা যুক্তিবাদবিরোধী, বিচারবোধবিরোধী। হেগেলীয় দর্শনের আওতায় যুক্তিবাদ ইতিহাসসিদ্ধ, ঐতিহাসিকতা যুক্তিসিদ্ধ। তাঁর মতে, আইনের দার্শনিক বোধের দ্বান্দ্বিকতাই কেবল অবজেকটিভ অধ্যাত্মার ক্ষেত্রে যৌক্তিক ও ঐতিহাসিকের ঐক্যের যথোচিত বৈজ্ঞানিক অভিব্যক্তি।

স্বাধীন ইচ্ছার তিনটি প্রধান রূপ ও তদনুযায়ী আইন বিষয়ক বোধের তিনটি প্রধান ধাপ হল: বিমূর্ত আইন, নৈতিকতা, সদ্বুদ্ধি।

বিমূর্ত আইন হল আইনের বোধের বিমূর্ত থেকে মূর্তের দিকে গতির প্রথম পর্যায়। এ হল বিমূর্ত স্বাধীন ব্যক্তিসত্তার আইন। হেগেলীয় দর্শনে

বিমূর্ত আইনের অর্থ এই যে সাধারণভাবেই আইনের ভিত্তিতে থাকে এক-একজন স্বতন্ত্র মানুষের (ব্যক্তির, ব্যক্তিসত্তার) স্বাধীনতা। হেগেলের মতে, ব্যক্তিসত্তায় সাধারণভাবে ধরে নেওয়া হয় আইনসামর্থ্য। বিমূর্ত আইন হল আইন ও স্বাধীনতার পরবর্তী সমস্ত মূর্ততর নির্দিষ্টতার বিমূর্তায়ন ও নিরাভরণ সম্ভাবনা। বিমূর্ত আইন তাই কেবল স্বাধীনতা ও আইনের চেতনা, আইনবোধ, আইনসামর্থ্যের চেতনা। আইন বিষয়ক বোধের বিমূর্ত দিক হিশেবে এই চেতনা তার মধ্যে বিমূর্তভাবে অন্তর্নিহিত আইন ও স্বাধীনতার নির্দিষ্টতার রূপায়ণ ও অবজেকটিভকরণের লক্ষ্যে দ্বান্দ্বিকভাবে নিবদ্ধ। এই পর্যায়ে প্রণীত বিধান তখনো আত্মপ্রকাশ করে নি, তার তুল্যমূল্য ধরে এই আনুষ্ঠানিক আইনী অনুশাসন: 'ব্যক্তি হও এবং ব্যক্তি হিশেবে অন্যদের মান্য করো'।*

এই পর্যায়ে স্বাধীন ও আইনভোগী ব্যক্তিসত্তাদের নিজেদের মধ্যে সম্পর্কেও থাকে অনুশাসন। হেগেলের মতে, ব্যক্তিসত্তার স্বাধীনতা তার রূপায়ণ লাভ করে ব্যক্তিগত মালিকানার অধিকারে। লোকেদের আনুষ্ঠানিক, আইনী সমতার এই যুক্তি দিয়েছেন হেগেল: লোকেরা সমান ঠিক স্বাধীন ব্যক্তিসত্তা হিশেবেই, তাদের আইনসামর্থ্য বলে সমান, ব্যক্তিগত মালিকানায় একইরকম তাদের অধিকারে, কিন্তু সম্পত্তির আয়তনে তারা সমান নয়। এই অবস্থান থেকে তিনি সমালোচনা করেছেন যেমন প্লেটোর আদর্শ রাষ্ট্রের প্রকল্প, তেমনি কার্যক্ষেত্রে সমতার বিভিন্ন ধরনের অন্যান্য দাবিকেও। স্বাধীনতা ও আইন সম্পর্কে তাঁর যে বোধ, সেটাকে তিনি চালিত করেছেন দাসত্ব এবং ভূমিদাস প্রথার বিরুদ্ধেও। ব্যক্তিকে স্বাধীনতা, আইনসামর্থ্য, নৈতিকতা, ধর্মীয়তা থেকে অপসারণ অন্যায় এবং তা জয় করতে হবে। হেগেল স্বীকার করেছেন: 'প্রকৃতিগতভাবেই স্বীয় স্বাধীনতা অর্জনের পরম অধিকার আছে দাসের'।**

হেগেলের মতে, বিচারবুদ্ধি রূপায়ণের অপরিহার্য একটা দিক হল এমন চুক্তি যাতে অংশ নিচ্ছে পরস্পরবিরোধী স্বাধীন ব্যক্তিরা, ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকেরা। চুক্তির বিষয়বস্তু হতে পারবে কেবল বাহ্যিক কতকগুলি পৃথক পৃথক বস্তু, যা তার অধিকারী স্বেচ্ছায় ছেড়ে দিতে রাজি। তাই বিবাহকে চুক্তি বলে গণ্য করা সম্পর্কে কাণ্টের মতে এবং রাষ্ট্রের চুক্তি

তত্ত্বের বিভিন্ন ভাষ্যে তিনি আপত্তি করেছেন। চুক্তি ঘটে বিভিন্ন ব্যক্তির স্বেচ্ছাক্রমে। যে সর্বজনীনতা নীতিসূত্র ও রাষ্ট্রে নিহিত, সেটা রাষ্ট্রে ঐক্যবদ্ধ ব্যক্তিদের স্বেচ্ছার ফল নয়। 'এই চুক্তি-সম্পর্ক তথা সাধারণভাবেই ব্যক্তিগত মালিকানার সম্পর্ককে রাষ্ট্রীয় সম্পর্কের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলায় রাষ্ট্রিক আইনে প্রচণ্ড বিভ্রান্তি ঘটেছে এবং বাস্তব জীবনে প্রচণ্ড গোলযোগ দেখা দিয়েছে'।*

বিমূর্ত আইন বিষয়ক মতবাদের পরবর্তী ধাপ হল অন্যায় (সরল অন্যায়, প্রতারণা, বাধ্যকরণ এবং অপরাধ) বিষয়ে হেগেলীয় বিচার।

অপরাধ হল আইনকে আইন হিশেবেই সজ্ঞানে ভঙ্গ করা, সুতরাং, হেগেলের মতে, শাস্তি শুধু ভঙ্গ করা আইন পুনঃপ্রতিষ্ঠার উপায়ই নয়, খোদ অপরাধীরও আইন, যা তার কর্মে — স্বাধীন ব্যক্তিসত্তার আচরণে নিহিত। শাস্তি মারফৎ অপরাধের 'অপসারণ' পৌঁছয় আইনের ধারণাকে মূর্তায়নের হেগেলীয় ছক অনুসারে নীতিসূত্রে। এই ধাপে, যখন বিমূর্ত আইনের ব্যক্তিসত্তা (পার্সন) স্বাধীন ইচ্ছার কর্তা হয়, তখনই কর্তার আচরণ প্রথম উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের তাৎপর্য লাভ করে। সাবজেকটিভ স্বাধীনতার দাবিটা এইজন্য যাতে লোককে বিচার করা হয় তার আত্মনির্ধারণ দিয়ে। কেবল আচরণের মধ্যেই সাবজেকটিভ ইচ্ছা অবজেকটিভ রূপ পায়, সুতরাং বিধানের আওতায় আসে; খোদ নৈতিক ইচ্ছা এমনিতে শাস্তিযোগ্য নয়।

বিমূর্ত আইন ও নৈতিকতা হল দুটি একমুখী দিক, যা তাদের মূর্ততা ও বাস্তবতা লাভ করে নীতিসূত্রে, যখন বাস্তব জগতে পরিবার, নাগরিক সমাজ ও রাষ্ট্র রূপে স্বাধীনতার বোধ অবজেকটিভ আকার লাভ করে।

নাগরিক সমাজ ও রাজনৈতিক রাষ্ট্রের মধ্যে পার্থক্য করেছেন হেগেল। এই প্রশ্নে তাঁর মত তার সবকিছু স্বকীয়তা সত্ত্বেও পূর্ববর্তী ভাবনার যথেষ্ট প্রভাবাধীন। সর্বোপরী সমাজ প্রসঙ্গে রাষ্ট্রের অগ্রাধিকার এবং তাদের সম্পর্কের চরিত্র বিষয়ে হেগেলের ধারণার উপর চূড়ান্ত প্রভাব ফেলেছে নগর রাষ্ট্রের (পলিস) নৈতিক সমগ্রতার বস্তুত্ব বিষয়ে প্লেটোর ধারণা

(হেগেলের কাছে এটা হল নৈতিক দেহসত্তার, রাষ্ট্রের মূর্ত সমগ্রতা) এবং আরিস্টটলের এই বক্তব্য যে, অংশের তুলনায় সমগ্রের মতো ব্যক্তির তুলনায় রাষ্ট্র অগ্রাধিকারী এবং আদানপ্রদানের সুসম্পূর্ণ রূপ হিশেবে পরিবার ও বসতির তুলনায় রাষ্ট্রই প্রথম স্থানে।

প্লেটো ও আরিস্টটল থেকে আসা এই দৃষ্টিভঙ্গি হেগেলের কাছে মিলেছে রুসো থেকে পাওয়া এই বক্তব্য যে ইচ্ছা হল রাষ্ট্রের নীতি। হেগেলের মতে, রাষ্ট্রে নিহিত সাধারণ ইচ্ছা হল অগ্রস্থানীয় নৈতিক সমগ্র, সে সমগ্রের অন্যান্য দিকের (ব্যক্তিসত্তা পরিবার, সমাজ) তুলনায়। জীবনের বিশেষ সম্পর্ক হিশেবে নাগরিক সমাজকে দেখায় হেগেলের ওপর তাঁর সমকালীন বুর্জোয়া অর্থশাস্ত্রজ্ঞ অ্যা. স্মিথ, ড. রিকার্ডো, জ. ব. সেইয়ের প্রভাব লক্ষণীয়।

নাগরিক সমাজ বলতে মূলত ধরা হচ্ছে বুর্জোয়া সমাজকে। তিনি লিখেছেন: 'নাগরিক সমাজ কিন্তু গড়ে উঠেছে কেবল সাম্প্রতিক জগতে, কেবল তা-ই ভাবের প্রতিটি নির্ধারণকে তার নিজস্বতা প্রদান করতে পারে।'* নাগরিক সমাজ হল ভিন্ন ভিন্ন লোকের বিশেষ, ব্যক্তিগত লক্ষ্য ও স্বার্থ সাধনের ক্ষেত্র। আইনের ধারণার বিকাশের দিক থেকে এটা হল একটা আবশ্যিক পর্যায়, কেননা এখানে প্রদর্শিত হচ্ছে বিশেষ ও সাধারণের মধ্যে পরস্পরসম্পর্ক ও পারস্পরিক শর্তবদ্ধতা। ভাবের সুবিকাশপ্রাপ্তির অর্থ, হেগেলের মতে, এমন ঐক্য অর্জন যাতে সুবুদ্ধির অন্তর্গত বিপরীতগুলি (যথা, বিশেষ ও সাধারণ, ব্যক্তিমানুষ ও সমগ্রের স্বাধীনতা) স্বীকৃত ও পরিণত হয়েছে তাদের পরাক্রমে। সেটা ছিল না প্রাচীন কালের রাষ্ট্রে বা প্লেটোর আদর্শ রাষ্ট্রেও, যেখানে বিশেষের স্বাধীন বিকাশকে (স্বতন্ত্র ব্যক্তির স্বাধীনতা) দেখা হয়েছে নীতিভ্রংশ এবং সমগ্রের — রাষ্ট্রের বিনাশের অগ্রদূত হিশেবে।

হেগেলের ছকে, নাগরিক সমাজের পর্যায়ে সত্যকার স্বাধীনতা তখনো অর্জিত হয় নি, কেননা ব্যক্তিগত স্বার্থ-সংঘর্ষের ভৌতশক্তি সীমিত হচ্ছে সাধারণের প্রয়োজনীয় ক্ষমতার দ্বারা সুবিবেচনায় নয়, আপতিকতায়। হেগেল মন্তব্য করেছেন: 'এইসব বৈপরীত্য ও তাদের সংজড়নে নাগরিক সমাজ আমাদের দেয় যেমন অসাধারণ বিলাস আর প্রাচুর্যের ছবি, তেমনি

দারিদ্র্য এবং উভয়ের পক্ষেই সাধারণ দৈহিক ও নৈতিক অধঃপতনের ছবিও'।*

নাগরিক সমাজকে হেগেল বর্ণনা করেছেন বিপরীত স্বার্থে বিদীর্ণ, বৈর সমাজ, সবার সঙ্গে সবার যুদ্ধ বলে। তাঁর মতে, নাগরিক সমাজের তিনটি প্রধান দিক হল: চাহিদার ব্যবস্থা, ন্যায়বিচার, পুলিস আর কর্পোরেশন।

নাগরিক সমাজের কাঠামোয় হেগেল তিনটি সম্প্রদায়কে চিহ্নিত করেছেন: ১) ভারার্থক (ভূস্বামী -- অভিজাত ও কৃষকেরা); ২) শিল্প-গত (কলওয়ালা, ব্যবসায়ী, কারিগর); ৩) সাধারণ (রাজপুরুষ)। সামাজিক-অর্থনৈতিক সমস্যাবলি আলোচনায় হেগেল স্বীকার করেন যে নাগরিক সমাজের অসাধারণ সমৃদ্ধি সত্ত্বেও অসাধারণ দারিদ্র্য এবং ইতরের উদ্ভব ঠেকাতে তা অক্ষম, ইতর বলতে তিনি বুঝিয়েছেন অধিবাসীদের একাংশের নিঃস্বীভবন। হেগেলের বিশ্লেষণ দেখায় যে নাগরিক সমাজ নিজের অভ্যন্তরীণ সম্ভাবনা দিয়ে দারিদ্র্য সমস্যার সমাধান করতে পারে না, দারিদ্র্যের দ্বান্দ্বিকতা সে সমাজকে নিজের পরিসীমার বাইরে যেতে বাধ্য করে — আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে নতুন সম্ভাবনার সন্ধানে এবং উপনিবেশীকরণে। উপনিবেশীকরণের বর্তমান রূপ, যার পরিণাম পশ্চাৎপদ জাতি ও দেশগুলির গোলামি, তাতে হেগেলের নীতিগত আপত্তি আছে। তিনি লিখেছেন: 'উপনিবেশের মুক্তিদান হবে প্রভু দেশেদের পক্ষে একটা মহত্তম শুভকর্ম, যেমন দাসেদের মুক্তিদান হয়েছিল দাসমালিকদের পক্ষে একটা মহত্তম শুভকর্ম।'**

নাগরিক সমাজ বিষয়ক অধ্যায়ে হেগেল জারি করা আইন, ন্যায়বিচার এবং পুলিসের ক্রিয়াকলাপ নিয়েও আলোচনা করেছেন, যদিও আইনের বোধের মূর্তায়ন নীতি অনুসারে এ প্রসঙ্গগুলির আলোচিত হওয়া উচিত ছিল 'আইনের দর্শন'এর সেই অংশে যেখানে রাষ্ট্রের কথা এসেছে। উক্ত সমস্যাগুলির উপর আলোকপাতে স্থানের এরূপ অদল-বদলকে হেগেল যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন তা একটা সরাসরি সামাজিক-রাজনৈতিক তাৎপর্য লাভ করে। হেগেল এই থেকে এগিয়েছেন যে নাগরিক সমাজের ক্ষেত্রে সম্পত্তিকে বাস্তবে সক্রিয় রাখার ব্যাপারটা থাকে, তার শক্তিকে সমর্থন

পেতে হবে বিধান, আদালত ও পুলিসের পক্ষ থেকে সম্পত্তি রক্ষায়। ব্যক্তিগত লক্ষ্যের ভৌতশক্তির মধ্যে ঐ প্রতিষ্ঠানগুলি নির্দিষ্ট ব্যবস্থার সাধারণ স্বার্থ রক্ষায় আহূত।

বিধানের প্রকাশ্য ঘোষণা, প্রকাশ্য বিচার এবং শপথগ্রহীতাদের আদালতের প্রয়োজনীয়তা প্রতিপন্ন করেছেন হেগেল। সর্বত্রবিরাজমান পুলিসী রাষ্ট্রের সমালোচনা করলেও তিনি কিন্তু ব্যক্তিগত ব্যাপারে পুলিসী হস্তক্ষেপের পরিষ্কার কোনো সীমারেখা টানেন নি। আইনপ্রণয়ন, আদালত ও পুলিস যে সর্বোচ্চ স্বার্থ রক্ষা করবে, হেগেলের দার্শনিক ছকে, তা নাগরিক সমাজের সীমা ছাড়িয়ে চলে যাচ্ছে রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে।

হেগেলের ধারণা অনুসারে সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্কটা কাণ্ডজ্ঞান আর বিচারবুদ্ধির মধ্যে সম্পর্কের মতো: সমাজ হল 'কাণ্ডজ্ঞানের রাষ্ট্র' আর সত্যকার রাষ্ট্র হবে বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন।* তাই দার্শনিক-যুক্তিবাদী প্রেক্ষিতে হেগেল সমাজকে দেখেছেন রাষ্ট্রের একটা দিক হিশেবে, রাষ্ট্রে যা 'অন্তর্ধান করছে'।

হেগেলের মতে, নাগরিক সমাজের বিকাশেই ধরে নেওয়া হয় তার ভিত্তিস্বরূপ রাষ্ট্রের অস্তিত্ব। কিন্তু 'রাষ্ট্র — এই ধারণাটার বৈজ্ঞানিক প্রমাণসিদ্ধি' হল এইখানে যে বোধের অন্তর্নিহিত গতিতে, পরিবার ও নাগরিক সমাজের বিকাশে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয় তাদের একক সংশ্লেষ হিশেবে, আর তা ফল হিশেবে প্রকাশ পেলেও প্রকৃতপক্ষে সেটাই তাদের আসল ভিত্তি। তিনি লিখেছেন: 'সুতরাং আসলে রাষ্ট্র সাধারণভাবে বরং প্রথমটা যার আওতায় পরিবার বিকশিত হয় নাগরিক সমাজে এবং খোদ রাষ্ট্ররূপ ভাবসত্তাটাই নিজেকে বিভক্ত করে এই দুটি দিকে।'** শেষত, রাষ্ট্রে বিশেষ ও সাধারণের অভিন্নতা অর্জিত হয়, আঙ্গিক সমগ্র হিশেবে নৈতিকতা তার অবজেকটিভ সত্তা ও বাস্তবতা লাভ করে।

সমগ্রভাবে, সমাজ ও রাষ্ট্রের সম্পর্ককে হেগেল ভাববাদের অবস্থান থেকে রহস্যায়িত করে তুললেও মৌল এই সমস্যার দার্শনিক পর্যালোচনায় তাঁর অবদানের উল্লেখ করা উচিত। হেগেলের চোখে, নাগরিক সমাজ হল লোকেদের সর্বজনীন আনুষ্ঠানিক সমতা ও ব্যক্তিগত মালিকানার প্রভুত্বের মধ্যে নিহিত শ্রমের মাধ্যমে মিটমাট করে নেওয়া চাহিদার একটা ব্যবস্থা।

এই ধরনের যে সমাজ প্রাচীন কালে এবং মধ্যযুগে ছিল না, তার গঠন বুর্জোয়া ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠার সঙ্গে জড়িত। আধুনিক সামাজিক-অর্থনৈতিক বিকাশের এই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটা হেগেল লক্ষ করেছিলেন এবং রাষ্ট্র, আইন, রাজনীতির সমস্যায় প্রযোজ্য রূপে দার্শনিক দিক থেকে তাতে আলোকপাত করেন। নাগরিক সমাজের যে বিশ্লেষণ তিনি করেছেন (চাহিদার ব্যবস্থায় শ্রমের ভূমিকা, সামাজিক-অর্থনৈতিক বিরোধ, ঐশ্বর্য ও দারিদ্র্যের মেরুপ্রান্তিকতা, সমাজের ব্যক্তিমালিকী চরিত্র, ব্যক্তিগত মালিকানা রক্ষায় আইনপ্রণয়ন, বিচারালয়, সাধারণী ক্ষমতার ভূমিকা ইত্যাদি) তা অতি সারগর্ভ। হেগেলের তাত্ত্বিক অবদানের মধ্যে পড়ে সামাজিক-অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্র, নাগরিক সমাজ ও রাজনৈতিক রাষ্ট্রের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ আর সম্পর্কপাত (শুধু পার্থক্য নয়), এইসব যোগাযোগ ও সম্পর্কপাতে প্রয়োজনীয়, নিয়মসঙ্গত, দ্বান্দ্বিক চরিত্র বিষয়ে সমস্যার অতি যথার্থ নীতিগত উপস্থাপন।

হেগেলের মতে, রাষ্ট্র হল বিচারবুদ্ধি, স্বাধীনতা ও আইনের ভাবসত্তা, কেননা ভাবসত্তা বাহ্যিক, বিদ্যমান অস্তিত্বের ধারণার রূপায়ণও। তিনি লিখেছেন: 'রাষ্ট্রের অস্তিত্ব হল বিশ্বে ঈশ্বরের শোভাযাত্রা'। তার ভিত্তি হল ইচ্ছা রূপে নিষ্পন্ন বিচারবুদ্ধির শক্তি।'* হেগেল যদিও খারাপ, দুষ্ট রাষ্ট্রের সম্ভাবনা স্বীকার করেন, যা মাত্র বিদ্যমানই, কিন্তু অভ্যন্তরীণ আবশ্যিকতা ও বিচারবুদ্ধি বর্জিত, তাহলেও রাষ্ট্রের, অর্থাৎ সত্যিকারের বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন রাষ্ট্রের ভাবসত্তা থেকে তাঁর আইনের দর্শনের চৌহদ্দির বাইরেই সে খারাপ রাষ্ট্র থেকে যাচ্ছে।

হেগেলের মতে, রাষ্ট্রের ভাবসত্তা আবির্ভূত হয় তিনভাবে: ১) স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের আকারে সরাসরি বাস্তবতা রূপে; এখানে কথাটা হচ্ছে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা, অভ্যন্তরীণ রাষ্ট্রীয় আইন নিয়ে; ২) রাষ্ট্রীয় বৈদেশিক আইন হিশেবে রাষ্ট্রসমূহের সম্পর্কের মধ্যে, এবং ৩) বিশ্ব-ইতিহাসে।

মূর্ত স্বাধীনতার বাস্তবতা হিশেবে রাষ্ট্র হল স্বতন্ত্র রাষ্ট্র, সঠিক অর্থে রাজনৈতিক রাষ্ট্র এবং তার ব্যবস্থা। রাষ্ট্রের সংগঠন এবং তার আঙ্গিক জীবনের

প্রক্রিয়া হিশেবে রাজনৈতিক ব্যবস্থা রূপায়িত হয়, হেগেলের মতে, বিভিন্ন ক্ষমতার কাজ মারফত। তিনটে ক্ষমতার মধ্যে পার্থক্য করেছেন তিনি — আইনপ্রণয়নী, কার্যনির্বাহক এবং খাস রাজকীয়। এই দিক থেকে তাঁর পূর্বসূরী লক ও মঁতেস্কার মতো তিনিও ক্ষমতার বিভাগকে কাজে লাগিয়েছেন রাজনৈতিক আদর্শ হিশেবে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রকে সুসিদ্ধ করার জন্য।

লক ও মঁতেস্ক্য থেকে ভিন্ন মত পোষণ করে এবং ফরাসি বিপ্লবের সময় ক্ষমতার বিভাগ প্রয়োগ করতে যাওয়াকে সমালোচনা করে হেগেল মনে করেন ক্ষমতাগুলিকে স্বাধীন ভাবা ও তাদের মধ্যে সীমারেখা টানার দৃষ্টিভঙ্গি ভ্রান্ত, কেননা এভাবে দেখলে প্রতিটি ক্ষমতার পক্ষ থেকে অপরের প্রতি শত্রুতা, তাদের পারস্পরিক আশংকা ও বিরোধ ধরে নিতে হয়। বিভিন্ন ক্ষমতার পারস্পারিক ভারসাম্য নয়, তাদের জীবন্ত আঙ্গিক ঐক্যের পক্ষ নিয়েছেন তিনি। ক্ষমতার এই রূপ ঐক্যকে হেগেল বলেছেন আদর্শাবস্থা। এর অর্থ বিভিন্ন ক্ষমতা উদ্ভূত হচ্ছে সমগ্রের শক্তি থেকে এবং সেগুলি হল তার 'প্রবহমান অঙ্গ'।* একই যুক্তিতে বিভিন্ন ক্ষমতা ও রাষ্ট্রে কাজের ব্যক্তিগত অধিকারে থাকা উচিত নয়, যা ঘটেছিল সামন্ততন্ত্রে। সমগ্রের আধিপত্যে, রাষ্ট্রীয় এককের নিকট বিভিন্ন ক্ষমতার অধীনতাই হল, হেগেলের মতে, রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ সার্বভৌমত্বের মূলকথা।

জনসাধারণের সার্বভৌমত্বের গণতান্ত্রিক ধারণাকে সমালোচনা করেন হেগেল এবং বংশানুক্রমিক নিয়মতান্ত্রিক রাজার সার্বভৌমত্বকে প্রতিষ্ঠিত করতে চান। রাজার কী এক্তিয়ার সেটা ব্যাখ্যা করে হেগেল মন্তব্য করেছেন সুগঠিত রাজতন্ত্রে রাষ্ট্রীয় কাজের সমস্ত অবজেকটিভ দিক নির্ধারিত হচ্ছে বিধান দ্বারা, রাজার পক্ষে বাকি থাকছে কেবল তাঁর সাবজেকটিভ 'আমি চাই'-টুকু যোগ করা।

সরকারি ক্ষমতা সম্পর্কে হেগেল বলেছেন যে 'সে ক্ষমতা বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্র ও পৃথক ঘটনাকে সাধারণীর তলে নিয়ে আসে'।** সরকারি ক্ষমতার মধ্যে হেগেল আদালতি ও পুলিসি ক্ষমতাকেও ধরেছেন, তার কাজ হল রাজার সিদ্ধান্ত পালন, বিদ্যমান বিধান ও প্রতিষ্ঠানগুলিকে সমর্থন। সরকারের সদস্যদের ও আমলাতন্ত্রের রাষ্ট্রীয় কর্মচারীদের হেগেল বলেছেন

মধ্য সম্প্রদায়ের প্রধান অংশ, যাতে কেন্দ্রীভূত হয়েছে রাষ্ট্রীয় চেতনা ও জ্ঞান। রাজপুরুষদের প্রশংসা করেন হেগেল, মনে করেন যে 'আইনানুগত্য ও বুদ্ধিমত্তার দিক থেকে' তারা হল রাষ্ট্রের প্রধান নির্ভরস্থল।*

আইনপ্রণয়নী ক্ষমতা, হেগেলের মতে, সাধারণটাকে নির্ণয় ও প্রবর্তন করে। আইনপ্রণয়নী ক্ষমতার পক্ষ থেকে রাষ্ট্রব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের বিরোধিতা করে হেগেল বলেছেন যে বিদ্যমান ব্যবস্থার নবীকরণ চলা উচিত শান্তিতে, অলক্ষ্যে, ক্রমে ক্রমে, ঘুর পথে, সে ব্যবস্থার ভিত্তিগুলিরই অনুসরণক্রমে। এইসব ভাব রূপায়ণের অধীনস্থ হল আইনপ্রণয়নী ক্ষমতার হেগেলীয় নির্মিতি যাতে সম্প্রদায়ভেদী উপাদানের সঙ্গে সঙ্গে থাকছে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের অধিকার সহ রাজকীয় দিক এবং পরামর্শমূলক দিক হিশেবে সরকারি ক্ষমতা। আইনপ্রণয়নী ক্ষমতার সম্প্রদায়মূলক উপাদান হল দুই কক্ষে সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব। পিয়ার কক্ষ (লর্ড সভা) গঠিত হবে বংশধরের নীতি অনুসারে এবং তাতে থাকবে জ্যেষ্ঠাধিকারে আবদ্ধ সম্পত্তির মালিকেরা। প্রতিনিধি কক্ষ গঠিত হচ্ছে নাগরিক সমাজের বাকি অংশ নিয়ে এবং তারা আসবে কর্পোরেশন, সমাজ, কোম্পানি ইত্যাদি থেকে, অণুবিভক্ত হয়ে নয়, ব্যক্তিগত ভোটের মাধ্যমে নয়। প্রতিনিধিরা এতে নির্বাচিত হচ্ছে না, তাদের মূলত বেছে নেওয়া হচ্ছে। কর্পোরেশন এবং নাগরিক সমাজের অন্যান্য সংগঠিত চক্র সম্প্রদায় সভায় নিজেদের প্রতিনিধি পাঠায় 'প্রেরণের সহজ উপায়ে' এবং 'নির্বাচনাদি হয় সাধারণভাবেই অনাবশ্যক, নয় তা পরিণত হয় মতামত ও মর্জির অকিঞ্চিৎকর খেলায়'।**

সম্প্রদায় সভার কক্ষে প্রকাশ্য বিতর্কের নীতি, মুদ্রণ ও প্রকাশ্য সংবাদের স্বাধীনতা সমর্থন করেন হেগেল। সেই সঙ্গে তিনি মনে করেন যে সম্প্রদায় সভার প্রকাশ্য বিতর্কে যেখানে থাকে প্রজ্ঞা, সেখানে জনমতের ক্ষেত্রে সাধারণ রাষ্ট্রীয় ব্যাপার নিয়ে নিজস্ব মত প্রকাশের সাবজেকটিভ স্বাধীনতার চরিত্র আঙ্গিক নয়, তা ভৌত ও আপতিক। সমগ্রভাবে 'নিজের রাজনৈতিক আদর্শ — নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের নির্মিতিতে হেগেল তাঁর সময়কার জার্মানির আধাসামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থাকে ওপর থেকে ক্রমে ক্রমে শান্তিপূর্ণ উপায়ে বুর্জোয়া ব্যবস্থায় পরিবর্তন সম্ভব বলে আশা করেন। নিয়মতান্ত্রিক

রাজতন্ত্রের রূপে প্রাজ্ঞ রাষ্ট্র নির্মাণের হেগেলীয় ভাবনা আর তার রূপায়ণের মধ্যে রীতিমতো পার্থক্য আছে। নিষ্পাপ সত্য বলে হেগেল যেটা উপস্থিত করতে চাইছেন, দেখা যাচ্ছে সেটা একটা নির্দিষ্ট, আসলে নরমপন্থী বুর্জোয়া, রাজনৈতিক-আইনী অবস্থান, যার ঐতিহাসিক ভাবে মূর্ত দিকটাকে বোধের দ্বান্দ্বিক বিকাশ এবং সমগ্রের প্রাজ্ঞ ও নৈতিক ভাববাদী, রহস্যময়-দূরানুমানিক নির্মাণের গতিপথে পরম করে তোলা হয়েছে*।

হেগেলের আইনের দর্শনের রাজনৈতিক বিষয়বস্তুর মূল্যায়ন সম্পূর্ণ করতে হলে মনে রাখতে হবে তার দুটো দিকের কথা: যেমন হেগেলীয় মতবাদের মূর্ত-নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক বিষয়বস্তু (ঠিক কী রাজনৈতিক-আইনী দৃষ্টিভঙ্গি তাতে বিকশিত হয়েছে, বিদ্যমান সামাজিক ও রাষ্ট্রিক-আইনী ব্যবস্থার সঙ্গে তার কী সম্পর্ক, বিকাশের কী কী স্বার্থ ও প্রবণতা তাতে প্রতিফলিত ইত্যাদি), তেমনি তাঁর দার্শনিক-পদ্ধতিমূলক, নিজস্ব তাত্ত্বিক দিকটার ভূমিকা ও তাৎপর্য (মূর্ত-নির্দিষ্ট রাজনৈতিক-আইনী দৃষ্টিগুলিকে কিভাবে প্রতিপন্ন করা হয়েছে, কী ধারণায় তা রূপায়িত, যাত্রাবিন্দু হিশেবে কী নীতি রাখা হয়েছে তার ভিত্তিতে, রাজনৈতিক চিন্তার পরবর্তী ইতিহাসে হেগেলের তাত্ত্বিক মডেল ও নির্মিতিগুলির উপর কী চাপ পড়েছে, ইত্যাদি)। এই প্রসঙ্গে হেগেলের আইনী দর্শনের রাজনৈতিক বিষয়বস্তুর গঠনে দুটি আপেক্ষিকভাবে স্বাধীন উপাদানের মধ্যে পার্থক্য করা আবশ্যক: ক) মূর্ত-নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক এবং খ) তাত্ত্বিক — রাজনীতির ক্ষেত্রে হেগেলীয় দ্বন্দ্বতত্ত্ব প্রয়োগের ফলে, হেগেলীয় রাজনৈতিক দ্বান্দ্বিকতার নির্মিতি থেকে রাজনীতির পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ যেসব বক্তব্য এসেছে তাদের সামূহিকতা।

হেগেলীয় মতবাদের মূর্ত-নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক দিকটার কথা ধরলে এটা উল্লেখ করা উচিত যে আধাসামন্ততান্ত্রিক জার্মানির পরিস্থিতিতে হেগেল ইতিহাসের দিক থেকে একটা প্রগতিশীল অবস্থান নেন, বুর্জোয়া পুনর্গঠনের প্রয়োজনীয়তা প্রতিপাদন করেন, নরমপন্থী বুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গিগুলির বিকাশ ঘটান, তিনি ছিলেন নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র ও আইনী ব্যবস্থা, বুর্জোয়া অধিকার ও স্বাধীনতা, ব্যক্তিগত মালিকানা এবং চুক্তির স্বাধীনতা, আদালতের বুর্জোয়া সংস্কার ইত্যাদির পক্ষপাতী। তবে মনে রাখা আবশ্যক যে হেগেলীয় মতবাদের কাঠামোর মধ্যে অনুরূপ

দৃষ্টিগুলি তাদের সত্যকার অর্থ পায় কেবল রাজনৈতিক দ্বান্দ্বিকতা, এবং এ মতবাদে তাত্ত্বিক নির্মিতিগুলি যে ভূমিকা নেয়, তার প্রসঙ্গপটে।

হেগেলীয় রাজনৈতিক দ্বান্দ্বিকতার নির্মিতিগুলির — বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন বাস্তবতার ধারণা, সমগ্রের বিমূর্ত দিকের তুলনায় মূর্তনির্দিষ্টের (সর্বজনীন ও অখন্ড) প্রাধান্য, সমস্ত অবজেকটিভ-আত্মিক বিকাশের সত্য ও লক্ষ্য হিশেবে রাষ্ট্রের ব্যাখ্যা, আইনের দ্বান্দ্বিক সোপানশ্রেণীতে স্বাধীনতার রূপায়ণ ইত্যাদির যে একটা যৌক্তিক ভাবনার যাত্রাবিন্দু আছে তাই নয়, নতুন, পরিপূরক দায়িত্বও তা বহন করে, রাজনৈতিক-আইনী, নীতিশাস্ত্রীয় তাৎপর্য আছে তাদের (প্রকাশ্য বা সংগুপ্ত)। তাই হেগেলের আইনী দর্শনের বিষয়বস্তুর মূল্যায়নে এইটে উপেক্ষা করা অনুচিত যে তার তাত্ত্বিক নির্মিতিগুলি অগণতান্ত্রিকতা, অনুদারনৈতিকতা, বশ্যতাধর্মিতায় বিদ্যমান ব্যবস্থার ঐতিহাসিক দিক থেকে প্রগতিশীল দিকগুলির, সমালোচনামূলক বৈপরীত্য উপস্থাপনের অভাব ইত্যাদিতে চিহ্নিত।

হেগেলের মতে, রাষ্ট্রের ভাবসত্তার সর্বোচ্চ দিক হল সার্বভৌমত্বের আদর্শরূপিতা। রাষ্ট্রসমূহ পরস্পরের ক্ষেত্রে স্বাধীন, স্বাবলম্বী, স্বতন্ত্র সত্তা। রাষ্ট্রের সার, তার সার্বভৌমত্ব দেখা দেয় সমস্ত একক, বিশেষ ও প্রান্তিকের উপর, এক-একজন ব্যক্তি ও তাদের সমিতির জীবন, সম্পত্তি ও অধিকারের উপর আদর্শ সমগ্রের পরম ক্ষমতায়। সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে কথাটা হল স্বাধীন ও নৈতিক সমগ্র হিশেবে রাষ্ট্রের বাস্তবতা নিয়ে। হেগেলের মতে, এখানেই রয়েছে 'যুদ্ধের নৈতিক দিক, যাকে একটা চূড়ান্ত অভিশাপ বা বাইরের একটা আপতিক ঘটনা বলে দেখা উচিত নয়...*।

হেগেল সতর্ক করে দিয়েছেন যে যুদ্ধের আবশ্যিক ও নৈতিক দিক সম্পর্কে তিনি যে মত পোষণ করেন, সেটা কেবল দার্শনিক ভাবনা, সত্যকার যুদ্ধকে আরো মূর্ত-নির্দিষ্ট রূপে বিচার করা উচিত। যুদ্ধের কল্যাণে সমগ্রের যে আদর্শরূপিতা উদ্‌ঘাটিত ও রক্ষিত হয়, সেটা সেই আদর্শরূপিতা যার দরুন অভ্যন্তরীণ রাষ্ট্রক্ষমতা স্বাবলম্বী না হওয়ায় হয় কেবল রাষ্ট্রীয়

সমগ্রের একটা আঙ্গিক দিক: উভয় ক্ষেত্রেই কথাটা হচ্ছে রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব নিয়ে (বাইরের ও ভেতরের)। বাইরের সার্বভৌমত্ব সাফল্যের সঙ্গে রক্ষা করলে যেক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ সার্বভৌমত্ব সুদৃঢ় হয়, সেক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ সার্বভৌমত্বের দুর্বলতায় অন্য জাতির হানার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামের সাফল্য কমে। হেগেলের মতে, রাষ্ট্রের স্বাধীনতার গ্যারাণ্টি হল তার সশস্ত্র শক্তি যার বিকশিত অবস্থা হল স্থায়ী সৈন্যবাহিনী। আন্তঃরাষ্ট্রিক সম্পর্কের ক্ষেত্রটাকে হেগেল বলেছেন বহিঃরাষ্ট্রিক আইন উদয়ের ক্ষেত্র। তাঁর মতে, আন্তর্জাতিক আইন রাষ্ট্রাভ্যন্তরীণ আইনের (প্রণীত, জারি করা) মতো সত্যকার আইন নয়, বাধ্যবাধকতা মাত্র। এই বাধ্যবাধকতা বাস্তবে কী দাঁড়াবে তা নির্ভর করে বিভিন্ন রাষ্ট্রের সার্বভৌম ইচ্ছার ওপর, তাদের ঊর্ধ্বে, কথাটার চলিত অর্থে, কোনো সর্বোচ্চ আইন ও বিচারক নেই। পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কে রাষ্ট্রগুলি স্বাভাবিক অবস্থায় আছে ধরে নিলেও হেগেল আন্তর্জাতিক আইনের নীতিটাকে, সুতরাং রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে আইনী, চুক্তিবদ্ধ সম্পর্কের সম্ভাবনাকে অস্বীকার করেন নি। রাষ্ট্রসমূহের উচিত পরস্পরকে স্বাধীন ও সার্বভৌম বলে মেনে নেওয়া, অন্যের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করা, পরস্পরের স্বাধীনতাকে মান্য করা ইত্যাদি। তিনি লিখেছেন: 'এমনিতেই জাতিদের মধ্যে যা স্বীকৃতি পাওয়া উচিত, চাপিয়ে দেওয়া সন্ধি থেকে যেটা তার তফাৎ তেমন সাধারণ আইন হিশেবে আন্তর্জাতিক আইনের নীতি হল এই যে, যে-সন্ধির ভিত্তিতে পরস্পরের সম্পর্কের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রদের দায়িত্ব নিবদ্ধ হয়েছে তা মেনে চলতে হবে'।* রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে বিবাদ, যদি তাদের সার্বভৌম ইচ্ছা সম্মতিতে না আসে, তবে তা মিটতে পারে কেবল যুদ্ধ মারফত। রাষ্ট্রসমূহের সংঘ দ্বারা সমর্থিত চিরস্থায়ী শান্তির যে কথা কাণ্ট বলেছেন, ঐ অবস্থান থেকে তার সমালোচনা করেছেন হেগেল। সেই সঙ্গে তিনি স্বীকার করেন যে যুদ্ধ বলাত্মক ও অন্যায় একটা অবস্থা হলেও তাতে কতকগুলি নৈতিক-আইনী নীতি সক্রিয় থাকে, যেমন, রাষ্ট্রদের পারস্পরিক স্বীকৃতি, যুদ্ধের সাময়িক চরিত্র এবং শান্তির সম্ভাবনা। তিনি লিখেছেন: 'যুদ্ধ আদৌ অভ্যন্তরীণ প্রতিষ্ঠান এবং শান্তিপূর্ণ, পারিবারিক ও ব্যক্তিগত জীবনের বিরুদ্ধে চালানো হয় না, ব্যক্তি মানুষের বিরুদ্ধে চালানো হয়

না'* তার অনুমোদনে তিনি উল্লেখ করেছেন যে আগেকার কালের চেয়ে বর্তমানে যুদ্ধ চালানো হয় অনেক মানবিক রীতিতে।

বিভিন্ন সার্বভৌম ইচ্ছার মধ্যে সংঘাতে এবং তাদের সম্পর্কপাতের দ্বান্দ্বিকতার মাধ্যমে, হেগেলের মতে, দেখা দেয় সাধারণ বিশ্ব প্রেরণা, যা পৃথক পৃথক রাষ্ট্রের চেয়ে সর্বোচ্চ অধিকার ধরে ও তাদের বিচার করে। এইভাবে বিশ্ব ইতিহাস হল বিশ্ব বিচারক।

স্বাধীনতার চিন্তায় প্রগতি হিশেবে বিশ্ব ইতিহাস হল মূলত সার্বভৌম রাষ্ট্রদের (নৈতিক সারের) ইতিহাস, রাষ্ট্রিক গঠনে প্রগতির ইতিহাস। এই কারণে, হেগেলের মতে, বিশ্ব ইতিহাস পর্যবসিত চারটি বিশ্ব-ঐতিহাসিক রাজত্বে: প্রাচ্য, গ্রীক, রোমক এবং জার্মানিক। তদনুসারে রাষ্ট্রগুলির রূপ হল: প্রাচ্য দিব্য শাসনতন্ত্র (একজনের স্বাধীনতা), গণতন্ত্র অথবা অভিজাততন্ত্র (কতিপয়ের স্বাধীনতা), নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র (সকলের স্বাধীনতা)। 'প্রাচ্য জানত ও জানে যে কেবল একজনই স্বাধীন, গ্রীক ও রোমক জগৎ জানে যে কতিপয় লোক স্বাধীন, জার্মান জগৎ জানে যে সবাই স্বাধীন।'**

বিশ্ব প্রেরণার দায়িত্ব পালিত হয় ইতিহাসের সেই স্তরে প্রভুত্বকারী জাতির দ্বারা, যারা একবারই বিশ্ব ইতিহাসের যুগ রচনার সুযোগ পায়। 'বিশ্ব প্রেরণার বিকাশ পর্যায়ের বাহক হবার এই পরম আইনের কাছে বর্তমানে অন্যান্য জাতির প্রেরণা অধিকারহীন, যাদের যুগ বিগত তাদের মতোই তারা আর বিশ্ব ইতিহাসে গণ্য নয়।'***

রিফর্মেশন থেকে শুরু করে গোটা নবকালকে হেগেল মনে করেন জার্মান জাতির যুগ এবং তা বলতে তিনি কেবল জার্মানদের নয়, সাধারণভাবে উত্তর-পশ্চিম ইউরোপের জাতিদের বুঝিয়েছেন। রাশিয়া সমেত স্লাভ জনগণ তথা উত্তর আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রগুলি, হেগেলের মূল্যায়নে, বিশ্ব ইতিহাসে তখনো আত্মপ্রকাশ করে উঠতে পারে নি। বিশ্ব ইতিহাস এবং স্বাধীনতার প্রগতিতে বিভিন্ন রাষ্ট্রের স্থান সম্পর্কে হেগেলের যা দৃষ্টিভঙ্গি, তাতে তিনি অবশ্য জার্মান জনগণকে উঁচুতে তুলেছেন এবং নিজের ছকের সুবিধার জন্য প্রাশিয়া এবং অন্যান্য জার্মান রাষ্ট্রের বুর্জোয়া

পরিপক্কতার স্তরকে বাড়িয়ে ধরেছেন। তাহলেও তাঁর 'আইনের দর্শন' বা 'ইতিহাসের দর্শন' কোথাও এমন কথা বলা হয় নি যে তাঁর সমকালীন প্রাশিয়াই বুঝি বিশ্ব ইতিহাসের শেষ, সমাপ্তি পর্যায়। হেগেলের দ্বন্দ্বতত্ত্ব অনুসারে স্বাধীনতার চেতনায় বিশ্ব-ঐতিহাসিক অগ্রগতি এগিয়েই চলেছে।

রাজনৈতিক-আইনী চিন্তার পরবর্তী ইতিহাসে বিপুল প্রভাব ফেলেছে হেগেলের রাজনৈতিক মতবাদ। মার্কসবাদের প্রতিষ্ঠাতারা যে কথায় জোর দিয়েছেন, হেগেলীয় দর্শন যেমন রক্ষণশীল, প্রতিক্রিয়াশীল, তেমনি সমালোচনামূলক, বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিষ্ঠার বিপুল পরিসর জুগিয়েছে। এটা অতি স্পষ্ট করে প্রকাশ পায় দার্শনিকের মৃত্যুর পরেকার প্রথম দশকেই, যখন হেগেলপন্থীরা ভাগ হয়ে যায় বাম ও দক্ষিণ অংশে।

হেগেলীয় ভাবধারা কাজে লাগিয়ে নবীন হেগেলপন্থীরা (আ. রুগে, ব্রুনো ও এডগার বাউয়ার, ম. হেস, ক. কেপপেন প্রভৃতি) যেক্ষেত্রে ধর্ম ও তৎকালীন জার্মান রাষ্ট্রব্যবস্থার সমালোচনা করেছেন, সেক্ষেত্রে দক্ষিণপন্থী হেগেলবাদীরা (গ. গাবলের, ক. গেশেল, হ. হিনরিক্স, ক. ডাউব প্রভৃতি) খুবই রক্ষণশীল অবস্থান নেন। নিজেদের মানসিক বিকাশের গোড়ায় (আনুমানিক ৩০-এর দশকের শেষ থেকে ১৮৪৪ সাল অবধি) কার্ল মার্কস ও ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস ছিলেন নবীন হেগেলপন্থীদের অবস্থানে, হেগেলীয় মতবাদের প্রগতিশীল ভাবধারাগুলিকে তাঁরা বৈপ্লবিক-গণতান্ত্রিক অবস্থান থেকে ব্যাখ্যা করেন। পরে তাঁরা বস্তুবাদী ও কমিউনিস্ট অবস্থানে চলে যাওয়ার পথে যেমন হেগেলের অবজেকটিভ ভাববাদ, তেমনি তাঁর রাজনৈতিক মতবাদের সীমাবদ্ধ বুর্জোয়া চরিত্র, তার রক্ষণশীল ও প্রতিক্রিয়াশীল দিকের আমূল নীতিগত সমালোচনা করেন। এই সমালোচনার সাথে সাথে মার্কস ও এঙ্গেলস এবং পরবর্তী কালে লেনিনও দার্শনিক ও রাজনৈতিক চিন্তার ইতিহাসে হেগেলের নামের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে যা জড়িত, সেই সব প্রগতিশীল, যুক্তিবাদী দ্বান্দ্বিক দিকগুলিতে একাধিক বার জোর দিয়েছেন।*

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে জার্মানিতে সমগ্রভাবেই হেগেলীয় দর্শন এবং বিশেষ করে তাঁর আইনের দর্শন সম্পর্কে আগ্রহ কমে যেতে থাকে। হেগেলের রাজনৈতিক মতবাদের মূলত উদারনৈতিক সমালোচনা প্রাধান্য লাভ করে। হেগেলকে 'রিফর্মেশনের সরকারি দার্শনিক' এবং তাঁর দর্শনকে 'প্রুশীয় দর্শন' বলে উদারনীতিক র. হেইম যে আক্রমণ করেন, তা ব্যাপক প্রচার লাভ করে। 'হেগেল ও তাঁর কাল' রচনায় (১৮৫৭) র. হেইম লেখেন: 'আমার যা মনে হয় হেগেলীয় ভূমিকার অর্থে সবকিছু বাস্তবের প্রজ্ঞা বিষয়ে চমৎকার উক্তির তুলনায় হবস আর ফিলমার, গালের আর স্টালের মতবাদ এক অর্থে অনেক বেশি স্বাধীন।'*

হেগেলের আইনের দর্শনের ধারণা এই সময় প্রভাব বিস্তার করে সর্বাগ্রে উদারনৈতিকতা ও গণতান্ত্রিকতার বিরোধীদের মধ্যে, রাজতন্ত্র, কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র, অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক দৃঢ়তা ও বহিঃসম্প্রসারণে সমর্থ শক্তিশালী জাতীয় রাষ্ট্রের যারা পক্ষপাতী, তাদের মধ্যেই, অর্থাৎ জার্মান যুঙ্কার ও বুর্জোয়াদের 'জাতীয় রাষ্ট্র' মনোভাবাপন্ন ভাবাদর্শীদের মধ্যে। আইনের হেগেলপন্থী দার্শনিক আ. লাসন, হেগেলীয় মনোভাবাপন্ন আন্তর্জাতিক-ব্যবহারশাস্ত্রী ক. পিউটার, হ. ওপেনহেইম, আ. হেফটার প্রভৃতি, তথা 'রাজনৈতিক ঐতিহাসিকদের' প্রতিনিধি (ই. ড্রয়জেন, ম. ডুঙ্কার) আর বিসমার্কের সমকালীন ব্যবহারিক রাজনীতিকদের (ক. রোসলার প্রভৃতি) প্রয়াসে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে জার্মান সাহিত্য ও আচরণে হেগেলের আইনের দর্শনের গুরুবাদী-প্রতিক্রিয়াশীল ব্যাখ্যার পাকাপোক্ত ঐতিহ্য গড়ে উঠতে থাকে।

অন্যান্য দেশে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে হেগেলীয় মতবাদের সঙ্গে মূলত পরিচয় এবং তার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধির একটা পর্যায় লক্ষিত হয়।

রাশিয়ায় হেগেলীয় মতবাদের প্রতি যথেষ্ট আগ্রহ দেখা যায়, ৩০-৪০-এর দশকেই তাতে আকৃষ্ট হন স্তানকেভিচ, বাকুনিন, বেলিনস্কি, গের্ৎসেন,

ওগারেভ প্রভৃতি রুশ বুদ্ধিজীবীদের প্রতিনিধিরা। হেগেলের ভাষণের শ্রোতা ছিলেন ব. ইস্কিকিউল, প. গ. রেদকিন, ক. আ. নেভোলিন, ই. ভ. কিরেয়েভস্কি প্রভৃতি।

রাশিয়ায় হেগেলীয় দর্শনের প্রতি বৈপ্লবিক-গণতান্ত্রিক মনোভাব গ্রহণ এবং দ্বন্দ্বতত্ত্বকে বস্তুবাদের সঙ্গে মেলাবার যে প্রয়াস দেখা যায়, তার উৎসমূলে ছিলেন গের্ৎসেন ও চের্নিশেভস্কি। এদেশে হেগেলের আইনের দর্শনের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ অথবা তাঁর ভাবধারা ব্যবহারের ক্ষেত্রে ক. আ. নেভোলিন, প. গ. রেদকিন, ব. ন. চিচেরিন, প. ই. নভ্‌গোরোদৎসেভ, আ. গ্রাদোভস্কি প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। চিচেরিন ও নভগোরোদৎসেভ হেগেলের আইনের দর্শনের যে উদারনৈতিক-ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী ব্যাখ্যা দেন, সেটা ছিল সে সময়ে হেগেলীয় মতবাদের প্রতি সমস্ত মনোভাবের মধ্যে বিশিষ্ট ঘটনা।

হেগেলীয় মতবাদের প্রতি আগ্রহ দেখা দেয়, তাঁর রচনার প্রথম অনুবাদ এবং তাঁকে নিয়ে গ্রন্থ প্রকাশ হতে থাকে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ফ্রান্স, ইতালি, ইংলণ্ড, পোল্যাণ্ড এবং ইউরোপের অন্যান্য দেশে এবং আমেরিকায়। ইতালিতে হেগেলের প্রভাব হয় যথেষ্ট গভীর, সেখানে এমনকি স্বাধীন একটা ধারাই দেখা দেয় — নিয়াপলিটান হেগেলবাদ (ব. স্‌পাভেনতা, ফ. দে সাংকতিস প্রভৃতি), যা সে সময়কার ইতালির আত্মিক জীবনে একটা প্রগতিশীল প্রভাব ফেলে।

উনিশ শতকের যে ইংরেজ হেগেলপন্থীরা আইনের দর্শনের সমস্যাদি নিয়ে খাটেন (ট. গ্রিন, ফ. ব্র্যাডলি, ব. বজানকেট) তাঁরা রাষ্ট্রকে নৈতিক অখণ্ড হিশেবে দেখার হেগেলীয় ভাবনাকে গ্রহণ করেন এবং সমগ্রভাবে রাষ্ট্রের বিশ্বজনীন-পরম, ব্যক্তি-ঊর্ধ্ব ধারণাকে বিকশিত করেন।

হেগেলের মতবাদ উদারনীতিবিরোধী বলে যে মত প্রচলিত ছিল তার বিপরীতে উনিশ শতকের আমেরিকান হেগেলপন্থীরা ('ওহাইওর হেগেলপন্থী' গ্রুপ — প. কাউফমান, ম. কনভেই, আ. ভিলিখ প্রভৃতি) সমগ্রভাবেই তাকে উদারনৈতিক বলে ব্যাখ্যা করেন এবং তাঁর মতবাদে ব্যক্তির স্বাধীনতার সারমূলকতায় জোর দেন।

স্কাণ্ডিনাভিয়া ও হল্যাণ্ডে হেগেলীয় ভাবধারার যথেষ্ট প্রচার হয়। হেগেলবাদের ইতিহাসের দিক থেকে এখানে উল্লেখযোগ্য হলেন ডেনমার্কের স. কিয়েরকেগর এবং হল্যাণ্ডের গ. বলান্দ। স. কিয়েরকেগরকে প্রায়ই বলা হয় 'হেগেলবিরোধী হেগেলিয়ান', হেগেলীয় দ্বন্দ্বতত্ত্বের একাধিক ভাবনার

প্রভাব পড়ে তাঁর ওপর। নিজের অস্তিবাদী রচনায় তিনি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের অবস্থান থেকে তীব্র সমালোচনা করেন হেগেলের বিষয়মুখিতা ও সুজনপ্রণালীর। বিশ শতকে অস্তিবাদের পুনরুদয়ে দেখা দিয়েছে ও বেশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে 'হেগেল — কিয়েরকেগর', 'হেগেল — মার্কস — কিয়েরকেগর' প্রসঙ্গ, যার রাজনৈতিক তাৎপর্যও আছে।

উনিশ শতকের ৯০-এর দশকে হেগেলপন্থী হয়ে গ. বলান্দ যেমন হল্যান্ডে হেগেলবাদ প্রচারে তেমনি সমগ্রভাবে ইউরোপীয় নয়া-হেগেলবাদের প্রতিষ্ঠায় প্রচুর প্রভাব ফেলেন।

বিশ শতকের গোড়ায় প্রায়ই শোনা গেছে যে হেগেলপন্থার 'নবীকরণ', 'আসল' হেগেলে প্রত্যাবর্তন, কাণ্ট থেকে হেগেলে উত্তরণ, অথবা অন্ততপক্ষে নয়া-হেগেলপন্থা দিয়ে নয়া-কাণ্টপন্থার পরিপূরণের প্রয়োজন।

হেগেলের উত্তরাধিকারের প্রতি নয়া-হেগেলপন্থী মনোভাব গ্রহণে বিশিষ্ট স্থান নিয়েছে ভাববাদী জার্মান দার্শনিক ভ. ডিলটেইর গ্রন্থ 'তরুণ হেগেলের ইতিহাস' (১৯০৫), তাঁর ছাত্র হ. নল কর্তৃক প্রকাশিত হেগেলের আদি রচনাদি (১৯০৭), ব. ক্রোচের গ্রন্থ 'হেগেলীয় দর্শনে জীবন্ত ও মৃত' (১৯০৭)। ১০-২০-এর দশকে 'হেগেলের রেনেসাঁস' প্রবল হতে থাকে পশ্চিম ইউরোপে, বিশেষ করে জার্মানি ও ইতালিতে, যেখানে রাজনৈতিক পরিস্থিতি প্রতিক্রিয়াশীল, অগণতান্ত্রিক ভাবধারার যতরকম তাত্ত্বিক সন্ধানকে বেগবান করেছিল। ৩০-এর দশক নাগাদ নয়া-হেগেলপন্থা তার শীর্ষে পৌঁছয়, ১৯৩০ সালের এপ্রিলে হেগে প্রথম কংগ্রেসে গঠিত হয় 'আন্তর্জাতিক হেগেলীয় সংঘ'। হেগের এবং পরে বার্লিন ও রোমের কংগ্রেসে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয় আইনের হেগেলীয় দর্শনের সমস্যায়। হেগেলের রাজনৈতিক-আইনী মতবাদের নয়া-হেগেলীয় ভাষ্যের প্রধান প্রধান দিকগুলি উপস্থিত করেন প্রধানত জার্মান নয়া-হেগেলপন্থীরা (ই. প্লেঙ্গে, হ. লাসন, এ. গির্শ, ইউ. বিন্ডার, ক. লারেনট্‌স, ভ. শ্মিড্‌ট্, ভ. শেনফেল্ড, ট. গায়েরিঙ্গ প্রভৃতি)। জার্মান নয়া-হেগেলপন্থীরা হেগেলের নজির দিয়ে '১৯১৪ সালের ভাবনার' তাত্ত্বিক যুক্তি দিতে চান আর কাইজার জার্মানির পতনের পর ভাইমার প্রজাতন্ত্রের বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলির বিরোধিতা করেন, শক্তিশালী রাষ্ট্র ও আগ্রাসী রাজনীতির পক্ষে যান। হিটলারের রাইখকে তাঁরা অভিনন্দিত করেন সত্যকার 'নৈতিক রাষ্ট্র' বলে, যুদ্ধের জয়গান করেন তাঁরা এবং সর্বোপায়ে চেষ্টা করেন হেগেলীয় আইনী দর্শনের উদারনীতিবিরোধী ও দক্ষিণপন্থী একসারি ভাবনার

ভাষ্যকে ফ্যাসিস্ট জার্মানির অভ্যন্তরীণ- ও বহিঃরাজনৈতিক ধারণার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে।

ইতালীয় নয়া-হেগেলবাদীদের মধ্যে হেগেলের মতবাদের ফ্যাসিস্ট অর্থে ব্যাখ্যায় বিশেষ স্থান নেন দ. জেন্তিলে, যাঁর কাছে ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্র হল স্বাধীনতার রূপায়ণ এবং ব্যক্তির স্বাধীনতাকে তিনি ঠেলে দেন সর্বগ্রাসী রাষ্ট্রের অধীনতায়। সেইসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে নাৎসি জার্মানি বা ফ্যাসিস্ট ইতালিতে নয়া-হেগেলপন্থা সরকারি মতবাদ বা 'রাষ্ট্রীয় দর্শন' হয়ে ওঠে নি। এই প্রসঙ্গে হেগেলীয় উত্তরাধিকারের প্রতি আ. রোজেনবার্গের মতো বিশিষ্ট নাৎসি ভাবাদর্শীর সমালোচনামূলক মনোভাব উল্লেখযোগ্য। হেগেলীয় মতবাদকে তিনি নস্যাৎ করেছেন 'ক্ষমতা সম্পর্কে বিজাতীয় মতবাদের পরাকাষ্ঠা' বলে, যা ফরাসি প্রভাবাধীন, তাছাড়া তাকে কাজে লাগিয়েছেন মার্কস। নিজের বাক্‌চাতুর্যের লক্ষ্যেই তিনি সমালোচনা করেছেন হেগেলের আমলাতন্ত্রী রাষ্ট্র ও 'জনগণের' প্রতি অবজ্ঞাকে। নিজেদের ব্যাখ্যায় নয়া-হেগেলপন্থীরা স্বভাবতই হেগেলের আইনী দর্শনের যে দিকগুলো তাঁদের কাছে ভাবাদর্শ হিশেবে অগ্রহণীয়, তা এড়িয়ে গেছেন, সে সম্পর্কে চুপ করে থেকেছেন কিংবা সরাসরি তার অপব্যাখ্যা দিয়েছেন।

দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পরেকার নতুন ঐতিহাসিক ও সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে এবং নয়া-হেগেলপন্থার অশ্রদ্ধেয় হবার অভিজ্ঞতা সামনে থাকায় হেগেলের দিকে এগুবার নতুন পথের সন্ধান গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। সব মিলিয়ে হেগেলের পুনর্মূল্যায়নের সাম্প্রতিক প্রয়াসের প্রধান দিক হল রাজনৈতিক হেগেল-চর্চা (অন্ততপক্ষে যা ভাবাদর্শ- ও রাজনীতিমুখী)।

পশ্চিম ইউরোপের সমগ্র যুদ্ধোত্তর হেগেল-চর্চার একটা কেন্দ্রীয় সমস্যা হল আইনের হেগেলীয় দর্শনের রাজনৈতিক বিষয়বস্তুর চরিত্রের মূল্যায়ন। এই সমস্যাবলি যেমন হেগেলীয় মতবাদের পৃথক পৃথক প্রসঙ্গ (ব্যক্তিসত্তা ও রাষ্ট্র; প্রাশিয়া, ফরাসি বিপ্লব, রেস্টোরেশন সম্পর্কে হেগেলের মনোভাব; যুদ্ধ সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদি) এবং হেগেলপন্থার ইতিহাস নিয়ে (হেগেলীয় স্কুল ও তার রাজনৈতিক ভূমিকার চরিত্রবর্ণনা, মার্কসবাদী-লেনিনবাদী ভাবাদর্শের উপর হেগেলীয় ভাবনার প্রভাব, ফ্যাসিস্ট লক্ষ্যে নয়া-হেগেলপন্থী কর্তৃক হেগেলীয় প্রস্তাবের অপব্যবহার প্রভৃতি), তেমনি বিশ্বব্যাপী পটেও (দ্বান্দ্বিকতা ও রাজনীতি, তত্ত্ব ও প্রয়োগ, ইতিহাস ও প্রগতির ধারণা প্রভৃতি) উত্থাপিত ও আলোচিত হয়।

জাতীয়-সমাজতন্ত্র ও ফ্যাসিজমের সমর্থনে হেগেলীয় মতবাদের

নয়া-হেগেলপন্থী ব্যাখ্যা, যা হেগেলীয় নির্মিতি ও ভাবধারাকে গণতন্ত্রবিরোধী ও উদারনীতিবিরোধী অর্থে ব্যবহারের সম্ভাবনার ওপর নতুন আলোকপাত করেছে, যুদ্ধোত্তর কালে তা হেগেলের বিরুদ্ধে নতুন এক পশলা উদারনৈতিক আক্রমণের উপলক্ষ, যাত্রাবিন্দু ও মালমশলা জুগিয়েছে।

সর্বগ্রাসিতাবাদী মনস্বী বলে হেগেলের চিত্রণ বেশ ছড়িয়েছে অ্যাঙ্গলো-স্যাকসন সাহিত্যে; পশ্চিম জার্মান সমেত অনেক ইউরোপীয় হেগেলবিদ এরূপ ভাষ্য দিয়ে থাকেন। তা দেখা যায় ক. পপ্পার, ব. রাসেল, ই. ফেটচার, ইয়া. গোমেস, এ. টোপিচ, ক. আহাম, ভ. থাইমার প্রভৃতির গ্রন্থে।

সমস্ত তারতম্য ও বহুমুখিতা সত্ত্বেও সমগ্রভাবে সর্বগ্রাসবাদী (কিংবা সর্বগ্রাসিতামুখী মনস্বী, প্রাক্‌সর্বগ্রাসবাদী, বিশ শতকের সর্বগ্রাসী ধ্যানধারণা ও ব্যবস্থার আত্মিক প্রস্তুতির পুরোহিত ইত্যাদি) বলে হেগেলকে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে তাঁর মতবাদের এই মূল্যায়ন থেকে যে তা প্রতিক্রিয়াশীল ও উদারনীতিবিরোধী তত্ত্ব, যা, এই ব্যাখ্যাতাদের মতে, বিশ শতকের উদারনীতিবিরোধী ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবিরোধী ভাবাদর্শ ও রাজনৈতিক আচরণ রূপী সর্বগ্রাসবাদের অনুরূপ বা সমধর্মী। আইনের হেগেলীয় দর্শনের এইরূপ একপেশে ব্যাখ্যার অনেকগুলির চরিত্রই সুস্পষ্টরূপে কমিউনিস্ট-বিরোধী। তাতে সোভিয়েত বাস্তবতাকে দেখা হয় রাষ্ট্র বিষয়ে হেগেলের ভাবনার সর্বগ্রাসী রূপায়ণ বলে (ই. ফেটচার প্রভৃতি) কিংবা আইনের হেগেলীয় দর্শনকে দেখা হয় সর্বগ্রাসিতার ভাবাদর্শ ও প্রয়োগের তাত্ত্বিক যাত্রাবিন্দু বলে, যার মধ্যে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকেও ফেলা হয় (ইয়া. বারিওন, ক. পপ্পার, ভ. থাইমার প্রভৃতি)।

উক্ত লেখকদের বিপরীতে বুর্জোয়া — 'সর্বগ্রাসবিরোধী', 'কর্তৃত্ববাদবিরোধী' — রাষ্ট্রের প্রেরণায় হেগেলীয় মতবাদের সদর্থক পুনর্ব্যাখ্যার পক্ষপাতীরা সে মতবাদে ইতরবিশেষ ঘটান, তার উদারনৈতিকীকরণের, অথবা এমনকি আধুনিক সামাজিক-রাজনৈতিক তত্ত্বের কাছাকাছি এনে ফেলার দিকে মনোযোগ দেন। হেগেলীয় মতবাদের অনুরূপ সাম্প্রতিক ধারার প্রতিনিধি হলেন গ. মার্কুজে, ট. আদর্নো, জ. পেলচিনস্কি, হ. মুলার, ম. রিদেল, ভ. মাইহোফার, হ. ল্যুবে, জ. ইপলিট প্রভৃতি। তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গিতে কথাটা হল হেগেলীয় মতবাদের নতুন ব্যাখ্যা ও পুনর্মূল্যায়ন নিয়ে, হেগেলের 'পুনঃপ্রতিষ্ঠা' এবং তাঁর 'পুনঃপ্রতিষ্ঠিত' ভাবনা নিয়ে। এরূপ 'পুনঃপ্রতিষ্ঠায়' হেগেলের রাজনৈতিক মতবাদে

সত্যিই যে-সব প্রতিক্রিয়াশীল, উদারনীতিবিরোধী ধারণা আছে তা প্রায়ই উপেক্ষিত হয়।

এটা তাৎপর্যপূর্ণ যে হেগেলের প্রতি মনোভাবে আধুনিক বুর্জোয়া হেগেলবিদদের মধ্যে মতান্তর থাকলেও একই রকম উৎসাহে তারা ঐ প্রসঙ্গটি কাজে লাগায় বুর্জোয়া ব্যবস্থার সমর্থন, কমিউনিস্ট ভাবাদর্শ ও বাস্তবতার সমালোচনার জন্য।

আইনের হেগেলীয় দর্শনে যথেষ্ট মন দেওয়া হয়েছে মার্কসবাদী (তথা সোভিয়েত) লেখক, যেমন দার্শনিক, তেমনি ব্যবহারশাস্ত্রীদের রচনায়।

মার্কসবাদী লেখকদের পক্ষ থেকে আইনের হেগেলীয় দর্শন নিয়ে গবেষণার বর্তমান পর্যায়ের বৈশিষ্ট্য হল আলোকপাতের পরিধি প্রসার, হেগেলীয় মতবাদের নতুন দিকের প্রতি দৃষ্টিপাত, তার পদ্ধতিমূলক সমস্যাদির প্রতি গভীর আগ্রহ, হেগেলপন্থার ইতিহাস এবং হেগেলীয় মতবাদের আধুনিক ব্যাখ্যা নিয়ে বিস্তারিত বিশ্লেষণ, হেগেলীয় প্রশ্নাবলি নিয়ে আন্তর্জাতিক কংগ্রেস ও ফোরামে সক্রিয় অংশগ্রহণ।

উপসংহার

রাষ্ট্র, আইন, রাজনীতি নিয়ে যে দুটি বিপরীত ও আপোসহীন — সমাজতান্ত্রিক ও বুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গি আছে, বর্তমানে রাজনৈতিক মতবাদের ইতিহাস হল তাদের মধ্যে ভাবাদর্শীয় সংগ্রামের একটা ক্ষেত্র। যে সব অবস্থাচক্র এই সমস্যাবলিকে জরুরি করে তোলে তাতে বিশেষ ভূমিকা নেয় একদিকে, নির্দিষ্ট রাজনৈতিক-আইনী দৃষ্টিভঙ্গির প্রবর্তনে বা বিকাশে মনীষীর অবদান, অন্যদিকে, তাঁর সমকালীন মূর্ত-নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে তাঁর ভাবনার আত্মীকরণ, রাজনৈতিক তত্ত্বে ও জীবন্ত রাজনৈতিক বাস্তবতায় পরবর্তী কালের প্রচারক বা সমালোচকগণ কর্তৃক সেগুলি ব্যবহারের চরিত্র ও ব্যাপকতা।

সামাজিক চিন্তা ও সংস্কৃতির ইতিহাসের সবিশেষ জরুরি সমস্যাগুলির বিশ্লেষণে দার্শনিক ও সমাজবিদ, অর্থনীতিবিদ ও মনোবিদ, ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিকও যথেষ্ট ব্যাপকভাবে এইরূপ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেন — উপযুক্ত পরিবর্তন সহ। ব্যবহারশাস্ত্রীয় সাহিত্যে এরূপ দৃষ্টিভঙ্গি অপেক্ষাকৃত নতুন এবং আমাদের বইটি হল অতীতের রাজনৈতিক মতবাদের প্রসঙ্গে ইতিহাস ও বর্তমানের সম্পর্ক নিয়ে ভাবনার ও কার্যকরী ব্যাখ্যার একটা প্রয়াস।

পরিবর্তমান সমস্যা ও সামাজিক কর্মসাধনের প্রেক্ষিতে রাজনৈতিক চিন্তার বহুযুগীয় রচনা অধ্যয়নেব প্রয়াসে মার্কসবাদী গবেষকরা 'মাকিয়াভেলিবাদ' (সংগ্রাম ও ষড়যন্ত্রে সমূহ মত্ততা, স্বার্থ ও রিপুর সংঘাত) অথবা 'ইউটোপিয়াবাদ' ('মর্ত্যকে অমরতায় উন্নীত করার প্রয়াস', 'অন্তর্জীবনের উচ্চতা এবং চিন্তার প্রশান্ত সুস্পষ্টতা', যা আসছে কিন্তু সামাজিক-রাজনৈতিক জীবনের জরুরি সমস্যাগুলি থেকে সাধারণ বিচ্ছিন্নতার ফলে) ধরনের পরিভাষায় যা বোঝানো হয় তাকে রাজনৈতিক চিন্তা ও বাস্তবতার সংকীর্ণ ও ভাসাভাসা ব্যাখ্যা বলে অগ্রাহ্য করেন। ভাব ও দৃষ্টিভঙ্গির সংগ্রামকে পরম করে তোলা, সামাজিক চিন্তার ইতিহাসকে সনাতনপন্থা ও ধর্মদ্রোহের মধ্যে সংগ্রামের প্রক্রিয়া বলে দেখানো, ভাবধারার বিকাশে ধারাবাহিকতার এই দিকটাও মনে না রাখা, যে দৃষ্টিভঙ্গির সংগ্রাম

প্রক্রিয়া হল ভাবধারার সমাজজীবনের মাত্র একটা দিক — এগুলিও অগ্রহণীয়।

ঐতিহাসিক গতি ও আমাদের যুগের সঙ্গে সম্পর্কের প্রেক্ষিতে পুস্তকে রাজনৈতিক মতবাদের বিশ্লেষণ করা হয়েছে দুটি গুরুত্বপূর্ণ ও অপ্রচলিত দিক থেকে — গবেষণার সাধারণ তাত্ত্বিক ও পদ্ধতিগত সমস্যাগুলিকে বিশেষভাবে তুলে ধরে এবং মানবজাতির স্মৃতিতে অতীতের বড়ো বড়ো যে-সব মনীষী ছাপ ফেলেছেন তাঁদের বেছে নিয়ে। রাজনৈতিক চিন্তার বৈজ্ঞানিক অধ্যয়নের বিশেষত্ব, বর্তমান কালের সঙ্গে যোগাযোগে রাজনৈতিক চিন্তার ইতিহাসের সম্পর্কপাত, তাদের ক্রিয়ায় প্রজ্ঞানমূলক ও ভাবাদর্শীয় দিক ইত্যাদি — এসব প্রশ্নের উপস্থাপন হল ক্লাসিক লেখকদের নিয়ে বিভাগের একধরনের ভূমিকাস্বরূপ। রাজনৈতিক চিন্তার মনীষীকে ভাগ করা হয়েছে 'তিনটি গ্রুপে' — প্রাচীন জগৎ, মধ্যযুগ এবং আধুনিক কাল, তাদের প্রত্যেকটি সম্পর্কেই আছে অবতরণিকামূলক মন্তব্য এবং আলোচ্য পর্বের রাজনৈতিক চিন্তার মূল ধারার সাধারণ চরিত্রের বর্ণনা।

রাজনৈতিক চিন্তার ক্লাসিকদের নির্বাচিত ঐতিহাসিক-বৈজ্ঞানিক 'পোর্ট্রেটের' সংখ্যা যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে, শুধু বর্তমানে নয়, অতীতেও তাঁদের রচনা সম্পর্কে মতামত ও ব্যাখ্যার স্বাভাবিক প্রাচুর্য সত্ত্বেও, সেটা পুরোপুরি সঙ্গত। এতে উদ্ঘাটিত করা সম্ভব হয়েছে রাজনৈতিক মতবাদের মূল উপাদান ও তার উদ্ভবের শর্ত — তার জন্মগ্রহণ ও রূপলাভের মূর্ত-নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক পরিস্থিতি, পূর্ববর্তী মতবাদগুলির সঙ্গে তার যোগসম্পর্ক, কোনো একটা তাত্ত্বিক নির্মিতির মৌলিকতার প্রশ্ন, আমাদের কাল অবধি পরবর্তী মনীষীদের পক্ষ থেকে তা আত্মস্থ বা ব্যাখ্যা করার পদ্ধতি।

ইতিহাস ও বর্তমান কালের মধ্যে সত্যকার সম্পর্ক যথোচিত উদ্ঘাটিত হয় বস্তুবাদী দ্বান্দ্বিকতার অবস্থান থেকে। মার্কসবাদী বিশ্লেষণে বিভিন্ন যুগের আত্মিক সংস্কৃতির যে প্রতিতুলনা করা হয় তাতে দেখা যায় যে তাদের কোনোটাই স্বতঃস্পষ্ট ও স্বতঃধার্য নয়। তাতে এও দেখা যায় যে সবিশেষ মূর্ত-নির্দিষ্ট ও স্বতন্ত্র কিছু-একটা হিশেবে রাজনৈতিক-তাত্ত্বিক জ্ঞানের প্রতিটি 'গঠনতন্ত্র' বিদ্যমান থাকে কেবল তার স্বকীয় পূর্বশর্তের কল্যাণে, বিবর্তিত হয় কেবল তারই বৈশিষ্ট্যসূচক চালক বিষয়গুলির প্রভাবে, থাকে তার ক্রিয়াকলাপের নিজস্ব দিগন্ত, নিজ চিন্তার সীমা

ইত্যাদি। প্রধান কথা হল এই যে এই ধরনের প্রতিতুলনা প্রমাণ করে যে গুণগতভাবে বিভিন্ন বহু তত্ত্ব, আদর্শ, পদ্ধতিগত প্রকরণের অস্তিত্ব সম্ভব ও অনিবার্য, যেগুলি মোটেই আনুষ্ঠানিক-যৌক্তিক প্রতিপাদনের দিক থেকে নিজেদের মধ্যে সম্পর্কিত এবং 'অপরিণত — পরিণত', এমন একটা সুবিধাজনক একমাত্রিক মাপকাঠিতে পরিমেয় নয়।

'ইতিহাস — বর্তমান কাল' (রাজনৈতিক চিন্তার ক্ষেত্রে কিভাবে তা দেখা দিয়েছে) এই তুলনাটা যখন বিচার করা যায়, তখন প্রথমেই রাষ্ট্র ও আইন সম্পর্ক বিভিন্ন কালে বিদ্যমান মতবাদগুলির সামাজিক সমতুল, শ্রেণীগত কাজ (ভূমিকা), অভিমুখের তুলনা ও বিশ্লেষণ করা হয়। সেইভাবেই এগুনো উচিত, কেননা রাজনৈতিক-তাত্ত্বিক জ্ঞানের প্রকৃতি ফুটে উঠতে থাকে ঠিক উল্লিখিত লক্ষণগুলির মাধ্যমে।

কিন্তু এই মতবাদগুলিই হল তাত্ত্বিক জ্ঞান, অর্থাৎ কিছু একটা আত্মিক উৎপাদনের প্রজ্ঞানমূলক ক্রিয়াকলাপের একটা ফল। সুতরাং তাদের জ্ঞানতাত্ত্বিক নির্ধারণেও সেগুলিকে অবশ্যই পরস্পর তুলনীয় হতে হবে। এইরূপ প্রতিতুলনায় আলোকিত ও 'বিধৃত' হয় বিশ্ববীক্ষাগত কাজ, পদ্ধতিগত অবস্থান, নতুন জ্ঞান লাভের উপায় ইত্যাদি, যেগুলি বিভিন্ন যুগের রাজনৈতিক-তাত্ত্বিক জ্ঞানকে তার নিছক সমাজতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের চেয়ে কম 'অনন্য' করে না।

খুবই বোঝা যায় যে উদ্ভবের স্থান, কাল, তথা মনীষীর রচনার সারগর্ভ দিকটাও তাঁর ভাবধারার উত্তরাধিকারের কোনো একটা দিকের বিশ্লেষণের ওপর নিজের সীমারোপ করে। প্লেটো ও হেগেলের সামাজিক-রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির বিশ্বব্যাপকতা, পরবর্তী রাজনৈতিক চিন্তার বিকাশে তাঁদের বহুমুখী প্রভাব দাবি করে যে তাঁদের ওপর আলোকপাত করতে হবে, ধরা যাক, লুথার বা মাকিয়াভেলির তুলনায় ভিন্নভাবে। প্লেটো ও আরিস্টটলের রাজনৈতিক চিন্তা যেভাবে তাঁদের পূর্ববর্তীদের উপর নির্ভর করেছিল, বুর্জোয়া আদর্শে আদি প্রবক্তাদের দৃষ্টিভঙ্গি কিন্তু সেভাবে করে নি, যাঁদের ভেতর বিরোধাত্মক প্রবণতা লক্ষণীয়: ভবিষ্যতের যবনিকাটা সামান্য তুলেই একই সময়ে উপযুক্ত আদর্শ ও রাজনৈতিক রূপের সন্ধানে তাঁরা পেছনের দিকে তাকান। টমাস মুর আর মাকিয়াভেলি, মঁতেস্ক্য আর রুসোর দৃষ্টিভঙ্গি এরূপ প্রবণতায় আকীর্ণ। শেষত, এক-একজন মনীষী যে-সব রাজনৈতিক ও আইনী ভাবনা নিয়ে খেটেছেন তার ভাণ্ডারও একরকম নয়।

রাজনৈতিক চিন্তার ক্ল্যাসিকদের উত্তরাধিকারের সঙ্গে পরিচয়ের 'পোর্ট্রেটমূলক' অভিগমনটাই একমাত্র ও সর্বথাপ্রযোজ্য পন্থা নয়। এই উত্তরাধিকার আয়ত্ত করা যায় আলাদা আলাদা সমস্যার উপস্থাপন ও বিচারের ইতিহাস অনুধাবন করেও। আইন ও বিধান, ব্যক্তিত্ব ও রাষ্ট্র, রাষ্ট্র ও গণতন্ত্রের রূপ, রাজনৈতিক ও আইনী সংস্কৃতির মতো সমস্যাও তার মধ্যে পড়ে। রাজনৈতিক আদর্শ, কিংবা, ধরা যাক, পদ্ধতির ধরনে যাঁদের মিল আছে, এমন কতিপয় মনীষীর রচনার তুলনামূলক অধ্যয়নেও বেশ তাত্ত্বিক-প্রজ্ঞানিক ফললাভ হয়।

রাজনৈতিক মতবাদের ইতিহাস হল যেন রাষ্ট্র ও আইনের সাধারণ তত্ত্বের যে কোর্স তার ঐতিহাসিক অংশটা এবং রাষ্ট্র, আইন ও রাজনীতির ক্ষেত্রে তাত্ত্বিক চিন্তাভাবনার হিতকর একটা পাঠ। বিভিন্ন মনীষী শুধু প্রতিষ্ঠানের শারীরস্থান নয়, তাদের কাজের গুপ্ত যন্ত্রব্যবস্থাটা জানবার জন্যও যে শিক্ষাপ্রদ প্রচেষ্টা করেছেন তার মূর্ত-নির্দিষ্ট দৃষ্টান্ত দিয়ে, ব্যবহারশাস্ত্রীয় চরিত্রের চতুরতার প্রমাণ ও কুতর্ক উপস্থিত করার কায়দার দিকে পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এই গ্রন্থের লেখকেরা চেষ্টা করেছেন বিজ্ঞানী ও তরুণ শিক্ষার্থীদের ভাবাদর্শীয়-তাত্ত্বিক প্রস্তুতিতে যথাসাধ্য অবদান যোগ করতে, এবং সেটা যেমন রাষ্ট্র ও রাজনীতির বিষয়বস্তু নিয়ে স্বাধীন বিচারের অভ্যাস শিক্ষাদানের মধ্য দিয়ে, তেমনি তাদের সত্যকার অথবা কল্পিত পূর্ববর্তী ভাবধারার সাহায্য নিয়ে বর্তমান বুর্জোয়া ভাবাদর্শীদের পক্ষ থেকে রাজনৈতিক বাস্তবতা ব্যাখ্যার যে চেষ্টা হয় তার ভাবাদর্শীয় অস্ত্রাগার ও পদ্ধতির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েও।

আরো একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা আছে। ব্যাপারটা হল এই যে অতীতের রাজনৈতিক মতবাদ বিষয়ক বিজ্ঞানের বিকাশ যে মানে উঠেছে নির্দিষ্ট পরিমাণে শুধু সেইটে নয়, এই গ্রন্থে ব্যবহারশাস্ত্রের অন্য কতকগুলি শাখার মানু ও চাহিদাও প্রতিফলিত হয়েছে। আধুনিক রাষ্ট্রবিদ্যার একটা আপেক্ষিক স্বায়ত্তাধীন ক্ষেত্র হিশেবে রাজনীতি অধ্যয়নের ক্রমবর্ধমান আগ্রহের কথা মনে রেখে লেখকেরা কোনো মনীষীর রাজনৈতিক মতবাদের সাধারণ গঠন থেকে এই দিকটা যতটা সম্ভব তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন — সর্বাগ্রে, আরিস্টটল, মাকিয়াভেলি, হবসের ক্ষেত্রে, যাঁদের রচনায় যেমন রাষ্ট্র চলার মূর্ত-নির্দিষ্ট যন্ত্রব্যবস্থাটায় বিশেষ মন দেওয়া হয়েছিল, এবং আইনবিদ্যার কাছে যা চিরাচরিত নয়, তেমন সমস্যাতেও, যথা রাজনৈতিক শাসনতন্ত্র, ক্ষমতার জন্য সংগ্রামে সামাজিক শক্তিগুলির সহসম্পর্ক এবং

এই সংগ্রামের মূর্ত-নির্দিষ্ট ফল, আইনী কর্তব্য থেকে তফাৎ করে রাজনৈতিক কর্তব্য, রাজনৈতিক শিক্ষাদান, নীতিসূত্র ও রাজনীতি, ইত্যাদি। তা করতে গিয়ে লেখকেরা রাজনৈতিক সমস্যাবলি সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গির গোটা ইতিহাসে লক্ষিত প্রবণতাগুলির সমষ্টি দিতে চান নি, কেননা সেটা তাঁদের গবেষণার গণ্ডির বাইরে পড়ে। উনিশ শতকের রাজনৈতিক চিন্তা নিয়ে যে বইটার জন্য তাঁরা খাটছেন, তাতে সাম্প্রতিকতম রাজনৈতিক তত্ত্বের ভাবাদর্শীয় চরিত্রায়ণ প্রসঙ্গে উল্লিখিত সমস্যাবলি আরো বিশদে আলোচিত হবে।

রাজনৈতিক মতবাদের ইতিহাস হল রাষ্ট্র, আইন, রাজনীতি সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি ও জ্ঞান বিকাশের ইতিহাস, আর সেইসঙ্গে তার সমালোচনামূলক ব্যাখ্যাও। রাজনৈতিক-আইনী দৃষ্টিভঙ্গিগুলির উদ্ভব, সারার্থ ও পরবর্তী ব্যাখ্যা নিয়ে গবেষণায় রাষ্ট্র ও আইনের সাধারণ তত্ত্বগুলির অবয়বলাভের জটিল ও বিরোধাকীর্ণ প্রক্রিয়াকে এ ইতিহাস ফুটিয়ে তোলে, তাদের পরবর্তী বিকাশের সম্ভবত অপ্রত্যক্ষ, কিন্তু আবশ্যিক পূর্বশর্ত গড়ে দেয়। অতীতের রাজনৈতিক মতবাদগুলির বিভিন্ন ভাষ্যের সঙ্গে জড়িত ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা, রাষ্ট্র ও আইন সম্পর্কে ঐতিহাসিক জ্ঞানের উপযোগ এবং সেইহেতু তাদের ঐতিহাসিক ভবিতব্য সম্পর্কে বিভিন্ন মনোভাব। রাজনৈতিক চিন্তার ক্ল্যাসিকদের মূল্যায়নে ঠিক এইখান দিয়েই গেছে মার্কসবাদী ও বুর্জোয়া গবেষকদের মধ্যে ভেদরেখা।

গবেষণার এক-একটা দিকের সমস্ত অভিনবত্ব এবং আধুনিক কাল, সহধর্মী বিদ্যা ইত্যাদির সঙ্গে তাদের পরস্পর সম্পর্কে রাজনৈতিক-আইনী চিন্তার বিকাশ বিষয়ক বিজ্ঞানের অবস্থা এবং মানকে যথাসম্ভব প্রতিফলিত করার সাধারণ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও লেখকেরা এ কথা মনে করেন না যে তাঁরা যে-সব প্রশ্ন তুলেছেন তার চূড়ান্ত সমাধান দিয়েছেন এবং তাঁদের উত্থাপিত সাধারণ সমস্যাগুলিই চূড়ান্ত। রাজনৈতিক মতবাদের ইতিহাস যে পরিমাণে একটা বিকাশমান জ্ঞান, সেই পরিমাণে তাতে স্বভাবতই ও সঙ্গত কারণে অন্যান্য কিছু ছাড়াও ধরে নেওয়া হয় যে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান বৃদ্ধি, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশ, সর্বাগ্রে বর্তমান যুগের ভাবাদর্শীয়-রাজনৈতিক জীবনের পরিবর্তমান প্রয়োজনের প্রভাবে সমস্যাবলি ও সামাজিক কর্মচালনায় যে অগ্রগতি ঘটছে, তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা ও সিদ্ধান্ত তাতে থাকবে।

টীকা

[১] **অ্যানাব্যাপটিস্ট** — পুনর্দীক্ষিত — সংস্কারের পর্বে একটি খ্রিস্টিয়ান ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সদস্য; মালিকানার উচ্ছেদ করে সাধারণ সম্পত্তির দাবি করত।

পৃঃ ১৩

[২] **লেভেলার (বৈষম্যনাশক)** — ইংলণ্ডে ১৭শ শতকের বিপ্লবে র‍্যাডিকেল-গণতান্ত্রিক ধারা; প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ও সর্বজনীন ভোটাধিকার আদায় করে; সমমাত্রিক ব্যক্তিগত মালিকানার পক্ষপাতী।

পৃঃ ১৩

[৩] **টেওক্র্যাসি** (দিব্য শাসনতন্ত্র) — এমন শাসনতন্ত্র, যেখানে রাজনৈতিক ক্ষমতা থাকবে যাজকদের, গির্জার হাতে। পৃঃ ২১

[৪] **রিসর্জিমেন্টো** — ১৮শ শতকের শেষ থেকে ১৮৭০ সাল অবধি ইতালীয় জনগণের জাতীয় মুক্তি আন্দোলন। পৃঃ ৪৩

[৫] **প্যানথেইজম** (সর্বেশ্বরবাদ) — দার্শনিক মতবাদ, তাতে ধরা হয় ঈশ্বর অশরীরী, তার অবস্থান প্রকৃতির বাইরে নয়, তার সঙ্গে অভিন্ন।

পৃঃ ৮৮

[৬] **পিউরিটান** — প্রটেস্টান্ট, ইংলণ্ডের গির্জা সংস্কারে অসন্তুষ্ট; পিউরিটানবাদ হয়ে দাঁড়ায় ইংলণ্ডে পরারাজতন্ত্রের রাজনৈতিক বিরোধিতা ও সেখানকার বুর্জোয়া বিপ্লবের ভাবাদর্শীয় পতাকা।

পৃঃ ১০২

[৭] **চার্টিজ়্ম** — ১৯শ শতকের ৩০-৪০ দশকে ইংলণ্ডে বৃহৎ বুর্জোয়া ও ভূস্বামী অভিজাতদের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের আন্দোলন। পৃঃ ১১২

[৮] **হুইগ** — ব্রিটিশ রাজনৈতিক পার্টি। পরারাজতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠায় অসম্মত, বনেদি অভিজাতকুল এবং বৃহৎ বাণিজ্যিক ও অর্থপতি বুর্জোয়াদের স্বার্থের প্রতিনিধিত্বকারী একটি গ্রুপ হিশেবে ১৭শ শতকের ৭০-এর দশকে তার আবির্ভাব।

পৃঃ ১১৪

[৯] **টোরি** — ব্রিটিশ রাজনৈতিক পার্টি, রক্ষণশীল পার্টির অগ্রদূত। ১৭শ শতকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত স্ট্যুয়ার্ট রাজবংশের অনুগামীদের জড়ো করে ৭০-এর দশকের শেষ ও ৮০-র দশকের গোড়ায় তার উদ্ভব। তাদের 'টোরি' নাম দেয় তার রাজনৈতিক প্রতিপক্ষীয়রা।

পৃঃ ১১৪

নামের সূচি

মার্কস (Marx), **কার্ল** (১৮১৮-১৮৮৩) — বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের প্রতিষ্ঠাতা, আন্তর্জাতিক প্রলেতারিয়েতের নেতা, প্রতিভাবান মনীষী। জন্ম ট্রিব শহরে (প্রাশিয়া), আইনজীবী পরিবারে। বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনের অনুষদ শেষ করেন। ইতিহাস ও দর্শনে বিপুল আগ্রহ দেখান। ১৮৪২ সালে 'রাইন পত্রিকা'র সম্পাদক, যার পাতায় তখনকার প্রাশিয়ায় এবং গোটা জার্মানিতে যে সামাজিক, রাজনৈতিক ও আত্মিক পীড়ন চলছিল, তার বিরুদ্ধে প্রচণ্ড সংগ্রাম চালানো হয়। পত্রিকা বন্ধ হয়ে যাবার পর প্যারিসে আসেন, তারপর লণ্ডনে। এঙ্গেলসের সঙ্গে একত্রে বৈপ্লবিক তত্ত্ব সৃষ্টি এবং কমিউনিস্ট পার্টি সংগঠনে বিপুল কাজ করেন। 'কমিউনিস্ট পার্টির ইসতেহার' তাঁরা রচনা করেন, যাতে মার্কসবাদের মূল ভাবনা এবং প্রলেতারিয়েতের সংগ্রামের অন্তিম লক্ষ্যের কথা ঘোষিত হয়। মার্কস ছিলেন ১ম আন্তর্জাতিকের সংগঠক ও নেতা। একই সময়ে তিনি খাটেন তাঁর মূল গ্রন্থ 'পুঁজি' নিয়ে। আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে একটা বিরাট ঘটনা হয়ে দাঁড়ায় 'পুঁজি'র ১ম খণ্ডের প্রকাশ। মার্কসের অর্থনৈতিক মতবাদে অর্থশাস্ত্রে বিপ্লব সূচিত হয়, পুঁজিবাদী পীড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রামে তা হয়ে দাঁড়ায় প্রলেতারিয়েতের পরাক্রান্ত মানসিক অস্ত্র। — ১০, ৩৬, ৪১, ৪৮-৫০, ৬০, ৯৮, ১০৩, ১০৬, ১৪২, ১৫২, ১৬৬, ১৮৩, ২২৩, ২৪২, ২৪৩, ২৬৭, ২৭০, ২৭১

এঙ্গেলস (Engels), **ফ্রিডরিখ** (১৮২০-১৮৯৫) — বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, ক. মার্কসের বন্ধু ও সহযোদ্ধা। জন্ম বার্মেনে (প্রাশিয়া), কলওয়ালা, সুতাকল মালিকের পরিবারে। মেহনতিদের দারিদ্র্যে সহানুভূতি বোধ করতেন। ১৮৪২ সালে ইংলণ্ডে আসেন, সেখানে 'এর্মেন অ্যাণ্ড এঙ্গেলস' ফার্মের বাণিজ্য দপ্তরে কাজ শুরু করেন। ইংরেজ শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থা গভীরভাবে পর্যালোচনা করে তিনি 'রাইন পত্রিকা' ও

অন্যান্য প্রকাশনায় পুঁজিবাদের পরিস্থিতিতে প্রলেতারিয়েতের নিঃস্বীভবন নিয়ে কতিপয় প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। ১৮৪৪ সালে মার্কসের সঙ্গে সাক্ষাতের পর শুরু হয় বৈপ্লবিক তত্ত্ব সংরচন ও কমিউনিস্ট পার্টি গঠন নিয়ে একত্র কার্যকলাপের দীর্ঘ পর্ব। ১৮৪৮ সালে তাঁরা লেখেন 'কমিউনিস্ট পার্টির ইসতেহার' — মার্কসবাদের প্রথম কর্মসূচিগত দলিল। এঙ্গেলসের প্রভাবে মার্কস অর্থশাস্ত্র নিয়ে গবেষণা শুরু করেন এবং তাতে পুরো একটা বিপ্লব ঘটান। মার্কসের মৃত্যুর পর এঙ্গেলস ইউরোপীয় সমাজতন্ত্রীদের উপদেশক ও নেতার কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন। — ১২, ৩৬, ৪৯, ১১২, ১৪৫, ১৬১, ১৭০, ১৮০, ২২২, ২৬৭

লেনিন (উলিয়ানভ), ভ্লাদিমির ইলিচ (১৮৭০-১৯২৪) — অসাধারণ এক মানবিক প্রতিভা, সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির স্রষ্টা, সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা। জন্ম সিম্বির্স্ক (বর্তমানে উলিয়ানোভস্ক) শহরে, স্কুল পরিদর্শকের পরিবারে। ১৮৮৭ সালে কাজান বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগে প্রবেশ করেন। ছাত্রদের মধ্যে বৈপ্লবিক কাজকর্মের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কৃত হন। বাইরের ছাত্র হিশেবে পিটার্সবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইনের ডিগ্রি পান। ১৮৯৩ সালে পিটার্সবুর্গে চলে আসেন এবং সেখানকার মার্কসবাদীদের নেতা হয়ে দাঁড়ান। ১৮৯৫ সালে সমস্ত মার্কসবাদী চক্রগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করেন একটি সংগঠনে — 'শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তির জন্য সংগ্রামের ইউনিয়ন' — যা ছিল বৈপ্লবিক পার্টির প্রথম গুরুত্বপূর্ণ ভ্রূণ। ১৮৯৫ সালের ডিসেম্বরে ধৃত হন ও কারাবাসে থাকেন এবং ১৮৯৭ সালে ৩ বছরের জন্য সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত হন। সেখানে তিনি ৩০টির বেশি রচনা লেখেন। নির্বাসন থেকে ফেরার পর জেনেভায় আসেন, সেখান থেকে 'ইস্ক্রা' পত্রিকা প্রকাশ করতে থাকেন, শ্রমিক শ্রেণীর মার্কসবাদী বৈপ্লবিক পার্টি গঠনে যার নির্ধারক ভূমিকা ছিল। ১৯১৭ সালের জুনে সাময়িক সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের প্রস্তুতি শুরু করেন এবং সরাসরি অক্টোবর বিপ্লব ঘটান ও তার পরিচালনা করেন। বিপ্লবের বিজয়ের পর প্রতিবিপ্লব ও বৈদেশিক হস্তক্ষেপকারী শক্তির বিরুদ্ধে দেশের প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করেন এবং তারা চূর্ণ হবার পর জাতীয় অর্থনীতির পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও পুনর্গঠনের পরিকল্পনা, সমাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক বনিয়াদের পরিকল্পনা রচনা করেন। — ১৮৭, ২২১, ২২৩, ২৪৩, ২৬৭

অ

আ

উ

এ

এপিকিউরাস (Epicurus) (খিঃ পূঃ ৩৪১-২৭০) — প্রাচীন গ্রীসের দার্শনিক। প্রাচীন কালের বড়ো দরের বস্তুবাদী ও নিরীশ্বরবাদী, দাসপ্রথাভিত্তিক গণতন্ত্রের ভাবপ্রবক্ত। তিত্তি পদার্থের চিরন্তনতা মানতেন এবং বিশ্বের ব্যাপারে দেবতাদের হস্তক্ষেপ অস্বীকার করতেন। — ৬৬

এরাজ্‌মাস ডেসিডেরিয়াস (Erasmus Desiderius), (১৪৬৬-১৫৩৬) — রেনেসাঁস যুগের প্রমুখ ওলন্দাজ মানববাদী। জার্মানিতে সংস্কারের আয়োজনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন। সামন্ততান্ত্রিক সমাজের অভিশাপ, স্কলাস্টিক দর্শন, ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা এবং গির্জার গোঁড়ামির ওপর কষাঘাত করেছেন। — ৫৩, ৬৯

ও

ও'ব্রাইন (O'Brien), **জেমস ব্রণ্টার** (১৮০৫-১৮৬৪) — ইংলণ্ডের চার্টিস্ট আন্দোলনের কর্মকর্তা। ইউটোপীয় সমাজতন্ত্রের ভাবনা প্রচার করেন। ১৮৪৮ সালে ইংরেজ শ্রমিকদের বৈপ্লবিক আন্দোলনের বিরুদ্ধে যান। — ২১

ওয়াশিংটন (Washington), **জর্জ** (১৭৩২-১৭৯৯) — ইংলণ্ডের উত্তর-আমেরিকান উপনিবেশগুলির স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় (১৭৭৫-১৭৮৩) আমেরিকান রাজনৈতিক কর্মকর্তা, মুক্তি বাহিনীগুলির প্রধান অধিনায়ক। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম প্রেসিডেণ্ট (১৭৮৯-১৭৯৭)। — ২১৯

ওয়েন (Owen), **রবার্ট** (১৭৭১-১৮৫৮) — মহান ইংরেজ ইউটোপীয় সমাজতন্ত্রী, বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের অন্যতম অগ্রদূত। ইউটোপীয় রূপে হলেও ৪০ বছরের ধরে সমাজতন্ত্রের ধারণা প্রচার করেন। শ্রমিকদের অবস্থা উন্নয়নের জন্য তিনি লড়াই করেন। তাঁর ক্রিয়াকলাপ ইংলণ্ডের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের বিকাশে প্রবল একটা প্রেরণা যোগায়। — ২২২

ক

কাণ্ট (Kant), **ইম্মানুয়েল** (১৭২৪-১৮০৪) — জার্মান দার্শনিক, ১৮ শতকের শেষ ও ১৯ শতকের গোড়াকার জার্মান ভাববাদের প্রতিষ্ঠাতা।

ইতিহাসবিদ ও রাজনৈতিক কর্মকর্তা। বুর্জোয়া-আভিজাতিক প্রজাতন্ত্রের পক্ষপাতী। — ৯৮, ৯৯

গের্ৎসেন, আলেক্সান্দর ইভানোভিচ (১৮১২-১৮৭০) — মহান রুশ বিপ্লবী গণতন্ত্রী, বস্তুবাদী দার্শনিক, লেখক, প্রাবন্ধিক। তাঁর স্বকালের অন্যতম মহামনীষী। জার সরকারের তাড়নায় ১৮৪৭ সালে বিদেশে চলে যেতে বাধ্য হন। ১৮৪৮ সালের বিপ্লবের প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন। ১৮৫৩ সালে লণ্ডনে 'স্বাধীন রুশ মুদ্রণালয়' স্থাপন করেন, তা থেকে রাজনৈতিক পত্রিকা 'কলোকোল' (ঘণ্টা) প্রকাশ করতে থাকেন, যাতে ভূমিদাসপ্রথা ও স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ডাক দেওয়া হত। —১৪৭

গ্রটিয়াস (Grotius), **হুগো** (১৫৮৩-১৬৪৫) — ওলন্দাজ ব্যবহারশাস্ত্রী, দার্শনিক, রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তা। আন্তর্জাতিক আইনের তত্ত্বের প্রতিষ্ঠাতা বলে গণ্য। স্বাভাবিক বিধির প্রথম তাত্ত্বিক। প্রধান রচনা 'যুদ্ধ ও শান্তির আইন বিষয়ে'। — ১০, ৭৪—৮৮, ৯৮, ১৭২

চ

চের্নিশেভস্কি, নিকোলাই গাভ্রিলোভিচ (১৮২৮-১৮৮৯) — রুশ বিপ্লবী গণতন্ত্রী, বস্তুবাদী দার্শনিক, রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির অন্যতম প্রমুখ পূর্বসূরী। ১৯ শতকের ৬০-এর দশকে রাশিয়ায় বৈপ্লবিক-গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতা। ১৮৬২ সালে গ্রেপ্তার হন, ১৮৬৪ সালে তাঁকে নাগরিক মৃত্যুদণ্ড দিয়ে সাইবেরিয়ায় পাঠানো হয় নির্বাসনে। — ২১২, ২২১, ২৬৯

জ

জেফারসন (Jefferson), **টমাস** (১৭৪৩-১৮২৬) — আমেরিকান রাজনৈতিক কর্মকর্তা, ইংলণ্ড থেকে স্বাধীন হবার জন্য আমেরিকাস্থ উপনিবেশগুলির মুক্তিসংগ্রামে বাম ধারার ভাবাদর্শী। ১৮০১-১৮০৯ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট। 'স্বাধীনতা ঘোষণা'র রচয়িতা। — ১১, ১১০, ১৪১, ১৮২—১৯৪

ট

টমাস আকুইনাস (Thomas Aguinas) (১২২৫(২৬)-১২৭৪) — ঈশ্বরতাত্ত্বিক, দার্শনিক, মধ্যযুগীয় স্কলাস্ট। মহান আলবের্টের অনুগামী। বিচারবুদ্ধিকে ধর্মবিশ্বাস, ঐশ্বরিক আলোকের অধীন করার দাবি করেন। — ৭৬

টের্টুলিয়ান (Tertullianus), **কুইন্ট সেপ্টীম ফ্লোরেন্স** (আনুঃ ১৬০-আনুঃ ২২২) — খ্রিস্টীয় ঈশ্বরতাত্ত্বিক। প্রাচীন যুগের বিদ্যার প্রতিবাদ করেন, প্রচার করেন অতীন্দ্রিয়বাদ, অযৌক্তিকতা, খ্রিস্টীয় আপ্তবাক্যে অন্ধ বিশ্বাস। — ৭৬

দ

দব্রোলিউবভ, নিকোলাই আলেক্সান্দ্রভিচ (১৮৩৬-১৮৬১) — বিখ্যাত রুশ বিপ্লবী গণতন্ত্রী, দার্শনিক ও সাহিত্য সমালোচক। রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির পূর্বসূরী, প্রাক্-মার্কসীয় বস্তুবাদের অন্যতম বৃহৎ প্রতিনিধি। দব্রোলিউবভ ছিলেন কৃষক বিপ্লবের পক্ষপাতী, স্বৈরতন্ত্র ও ভূমিদাস প্রথার শত্রু। — ২২১

দান্তে (Dante), **আলিগয়েরি** (১২৬৫-১৩২১) — ইতালিয়ান মহাকবি। দান্তের রচনায় প্রতিফলিত হয়েছে ইতালিতে পুঁজিবাদী সম্পর্কের উদ্ভব এবং সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে তার সংগ্রাম। তাঁর মহৎ রচনা 'স্বর্গীয় কমেডি'। — ৪২

দিদেরো (Diderot), **দেনি** (১৭১৩-১৭৮৪) — প্রমুখ ফরাসি বস্তুবাদী দার্শনিক, লেখক, ১৮ শতকের বিপ্লবী ফরাসি বুর্জোয়ার ভাবাদর্শী। বার্কলির সাবজেকটিভ ভাববাদের তীব্র বিরোধিতা করেন এবং সমর্থন করেন বস্তুর অবজেকটিভ অস্তিত্ব। আলোকপ্রাপ্ত রাজতন্ত্রের ধারণা সমর্থন করেন। — ১৪৫

দেজামি (Dezamy), **তিয়োদর** (১৮০৩-১৮৫০) — ফরাসি ইউটোপীয় কমিউনিজমের বৈপ্লবিক অংশের অতি বিশিষ্ট একজন প্রতিনিধি। দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে তিনি ১৮ শতকের ফরাসি বস্তুবাদের অনুগামী হন। — ২১

ন

প

প্লেখানভ, গেওর্গি ভালেন্তিনোভিচ (১৮৫৬-১৯১৮) — বড়ো দরের একজন রুশ মার্কসবাদী। দেশান্তরে থাকার সময় জেনেভায় (১৮৮৩) প্রথম রুশ মার্কসবাদী গ্রুপ — 'শ্রম মুক্তি' প্রতিষ্ঠা করেন। — ৪১, ১৪৮, ২৪২, ২৪৩

প্লেটো (Plato) (খ্রিঃ পূঃ ৪২৭-৩৪৭) — প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক, সক্রেটিসের শিষ্য, দর্শনে অবজেকটিভ-ভাববাদী ধারার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। এথেন্স অভিজাত সম্প্রদায়ের ভাবাদর্শী। — ৩০, ৫৭, ৫৮, ৬৫, ৬৬, ৭০—৭২, ৭৬, ২৪৬, ২৫৩, ২৫৫, ২৫৭, ২৭৪

ফ

ফিখ্‌টে (Fichte), **ইয়োহান গটলিব** (১৭৬২-১৮১৪) — জার্মান দার্শনিক, সাবজেকটিভ ভাববাদী, ১৮ শতকের শেষ ও ১৯ শতকের গোড়াকার জার্মান ভাববাদী দর্শনের অন্যতম বৃহৎ প্রতিনিধি। রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে রাজতন্ত্রবাদী ও জাতীয়তাবাদী। — ১৩, ৭৯, ২২২, ২২৩, ২৫৩

ফুরিয়ে (Fourier), **শার্ল** (১৭৭২-১৮৩৭) — মহান ফরাসি ইউটোপীয় সমাজতন্ত্রী। বুর্জোয়া ব্যবস্থার তীব্র সমালোচনা করে ভবিষ্যৎ সমাজের ছবি আঁকেন, যাতে সমস্ত মানবিক সামর্থ্য বিকশিত হবে। তাঁর আদর্শের রূপায়ণকে তিনি জড়িত করেন বিপ্লবের সঙ্গে নয়, লোকেদের পুনঃশিক্ষায়। — ২২২

ফ্র্যাঙ্কলিন (Franklin), **বেঞ্জামিন** (১৭০৬-১৭৯০) — আমেরিকান রাজনৈতিক কর্মকর্তা। উত্তর আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় (১৭৭৫-১৭৮৩) জেফারসনের সঙ্গে একত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'স্বাধীনতা ঘোষণা'র দলিল রচনা করেন। — ১৪১

ব

বনাল্দ (Bonald), **লুই দে** (১৭৫৩-১৮৪০) — ফরাসি রাজনীতিক ও প্রাবন্ধিক। রাজতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার পর্বে আভিজাতিক ও ধর্মীয় প্রতিক্রিয়ার অন্যতম প্রধান ভাবাদর্শী। — ২১

বাউয়ার (Bauer), **ব্রুনো** (১৮০৯-১৮৮২) — জার্মান ভাববাদী দার্শনিক, তরুণ-হেগেলপন্থী। 'সমালোচক ব্যক্তিত্বের' আত্মচেতনাকে বাউয়ার মনে করতেন ইতিহাসের প্রধান ক্রিয়াশীল শক্তি, যাদের ক্রিয়াকলাপকে তিনি উপস্থিত করেছিলেন জনগণের বৈপ্লবিক আন্দোলনের বিপরীতে। বাউয়ারের ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গিকে মার্কস ও এঙ্গেলস সমালোচনা করেছিলেন 'পবিত্র পরিবার' ও 'জার্মান ভাবাদর্শ' নামক রচনায়। — ২৬৭

বাকুনিন, মিখাইল আলেক্সান্দ্রভিচ (১৮১৪-১৮৭৬) — নৈরাজ্যবাদের ভাবপ্রবক্তা ও মার্কসবাদের শত্রু। সর্ববিধ রাষ্ট্রকে তিনি নস্যাৎ করে দেন। বাকুনিনের ক্রিয়াকলাপ প্রধানত চলেছিল রাশিয়ায় বাইরে। — ২৬৮

বাবেফ (Babeuf), **গ্রাখাস** (আসল নাম ফ্রাঁসুয়া নোয়েল) (১৭৬০-১৭৯৭) — ফরাসি বিপ্লবী, ইউটোপীয় কমিউনিস্ট। সমমাত্রিক কমিউনিজমের অন্যতম প্রবক্তা। জায়মান ফরাসি প্রলেতারিয়েতের স্বার্থ প্রকাশ করেন। বিপ্লবের মাধ্যমে ব্যক্তিগত মালিকানা ধূলিসাৎ করার ডাক দেন। — ১৩, ২১

বেকন (Bacon), **ফ্র্যান্সিস** (১৫৬১-১৬২৬) — ইংরেজ দার্শনিক, ব্রিটিশ বস্তুবাদের প্রবর্তক। মধ্য যুগের স্কলাস্টিক মতবাদের বিরোধিতা করে বেকন উৎপাদনী শক্তির বিকাশের চাহিদা অনুযায়ী' বৈজ্ঞানিক বিশ্ববোধ সমর্থন করেন। -- ২৪, ৪২, ৫৯, ৯৭, ৯৮

বেলিনস্কি, ভিস্সারিওন গ্রিগোরিয়েভিচ (১৮১১-১৮৪৮) — মহান রুশ বিপ্লবী-গণতন্ত্রী। ভূমিদাস প্রথার আপোসহীন শত্রু বেলিনস্কি চেষ্টা করেন একটা বৈপ্লবিক তত্ত্ব রচনার, যাতে বাস্তব অবস্থা পরিবর্তনের পথ দেখাতে চান। — ২৬৮

ব্লাঁকি (Blanqui), **লুই অগ্যুস্ত** (১৮০৫-১৮৮১) — ফরাসি বিপ্লবী, ইউটোপীয় কমিউনিস্ট। ১৮৩০ সালের জুলাই বিপ্লবে সক্রিয় অংশ নেন। ১৮৭১ সালে কারাগারে থাকা কালে তাঁর অনুপস্থিতিতেই তিনি প্যারিস কমিউনের সদস্য নির্বাচিত হন। — ২১

ভ

ভেইটলিঙ (Weitling), **ভিলহেল্ম** (১৮০৮-১৮৭১) — জার্মান

প্রলেতারিয়েতের রূপলাভের পর্বে সেখানকার শ্রমিক আন্দোলনের বিশিষ্ট কর্মকর্তা। 'সমমাত্রিক' কমিউনিজমের অন্যতম তত্ত্বকার। ১৮৪৮-১৮৪৯ সালের বিপ্লবের পর আমেরিকায় চলে যান এবং অচিরেই শ্রমিক আন্দোলন থেকে সরে আসেন। — ২১

ম

মঁতেস্ক্য (Montesquieu), **শার্ল লুই** (১৬৮৯-১৭৫৫) — ফরাসি জ্ঞানপ্রচারক, উদারনৈতিক বুর্জোয়ার মতাদর্শী। সামন্ততান্ত্রিক পরারাজতন্ত্রের বিরোধিতা করে সমর্থন করেন নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র, যা ছিল অভিজাতদের সঙ্গে বুর্জোয়াদের একটা আপোস। ক্ষমতা বিভাগ তত্ত্বের স্রষ্টা। — ৩৮, ১৪১, ১৪৪-১৬১, ২২৯, ২৫৩, ২৬১, ২৭৪

মরেলি (Morelly), (নাম এবং জন্ম-মৃত্যুর বছর অজ্ঞাত) — ১৮ শতকের প্রমুখ ফরাসি ইউটোপীয় কমিউনিস্ট। সমস্ত সামাজিক অভিশাপের উৎস হিশেবে ব্যক্তিগত মালিকানার উচ্ছেদ দাবি করেন। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির সীমাবদ্ধতা প্রকাশ পায় সরল ধরনের সমমাত্রিকতা প্রচারে। — ১৩

মাকিয়াভেলি (Machiavelli), **নিকোলো দি বের্নার্দো** (১৪৬৯-১৫২৭) — ইতালিয়ান রাজনৈতিক কর্মকর্তা ও ঐতিহাসিক, বুর্জোয়ার ভাবাদর্শী, পরারাজতন্ত্রের পক্ষপাতী। — ১০, ২৩—৫১, ৫৬, ৭৯, ৯২, ৯৮, ৯৯, ১৭৪

মাব্লি (Mably), **গাব্রিয়েল দে** (১৭০৯-১৭৮৫) — ফরাসি সামাজিক-রাজনৈতিক মনস্বী, ইউটোপীয় কমিউনিস্ট। জনগণের সার্বভৌমত্বের ধারণা প্রচার করেন তিনি, ব্যক্তিগত মালিকানার ওপর প্রতিষ্ঠিত সমাজের বিপরীতে তিনি দাঁড় করান আদর্শ কমিউনিস্ট ব্যবস্থাকে, তাঁর মতে, যা অতীতে বিদ্যমান ছিল। — ১৩

মার্সিলিয়াস, পাদুয়ার (Marcilius Paduanis) (১২৭৫ ও ১২৮০'র মধ্যে-আনুঃ ১৩৪৩) — ইতালীয় মনীষী, বুর্জোয়া শীর্ষের ভাবাদর্শী। সামাজিক চুক্তির ফলে রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়েছে এ ভাবনা যাঁরা প্রথম উপস্থিত করেন, তাঁদের একজন। রাজতন্ত্রকে মনে করতেন রাষ্ট্রের সেরা রূপ। — ১০

মুনট্সার (Münzer), **টমাস** (আনুঃ ১৪৯০-১৫২৫) — জার্মানিতে সংস্কার এবং ১৫২৫ সালের কৃষক সমরের সময় কৃষক-প্লিবিয়ান জনগণের নেতা ও ভাবপ্রবক্তা। ধর্মের রূপ অবলম্বন করে তিনি সবলে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার উচ্ছেদ করে এমন সমাজ ব্যবস্থা স্থাপনের প্রচার করেন, যেখানে শ্রেণী ভেদ, ব্যক্তিগত মালিকানা, রাষ্ট্রক্ষমতা — কিছুই থাকবে না। — ১০, ২১

মুর (More), **টমাস** (১৪৭৮-১৫৩৫) — প্রমুখ ইংরেজ মানববাদী মনীষী, ইউটোপীয় সমাজতন্ত্রের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। 'ইউটোপিয়া' গ্রন্থে তিনি তাঁর সমসাময়িক ইংলন্ডের সমাজ ব্যবস্থার সমালোচনা করে সামাজিক মালিকানার ওপর প্রতিষ্ঠিত এক আদর্শ সমাজের ছবি আঁকেন। সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার বিকাশে মুরের দৃষ্টিভঙ্গি বড়ো একটা ভূমিকা নেয়। -- ১৩, ২১, ৫২—৭৩, ২৭৪

মেস্ত্র (Maistre), **জসেফ দে** (১৭৫৩-১৮২১) — ফরাসি দার্শনিক ও লেখক, ১৮ শতকের শেষ দিককার ফরাসি বুর্জোয়া বিপ্লব ও জ্ঞানপ্রচারকদের দর্শনের চরম শত্রু, চরম যাজকপন্থী। — ২১

র

রাদিশ্যেভ, আলেক্সান্দর নিকোলায়েভিচ (১৭৪৯-১৮০২) — মহান রুশ বিপ্লবী, স্বৈরতন্ত্র ও ভূমিদাস প্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রামী, লেখক, বস্তুবাদী দার্শনিক ও জ্ঞানপ্রচারক। জমিদারদের ও জারের বিরুদ্ধে কৃষকদের অভ্যুত্থানের অধিকার প্রতিপাদন করেন, পেশ করেন গণ বিপ্লবের ধারণা। ২য় ইয়েকাতেরিনার আদেশে গ্রেপ্তার হন, দণ্ডিত হন মৃত্যুদণ্ডে। মৃত্যুদণ্ড রদ করে নির্বাসনে পাঠানো হয় সাইবেরিয়ায়। ১৯ শতকের রুশ বিপ্লবী গণতন্ত্রীদের ভাবাদার্শনিক পূর্বসূরী। — ১৫, ১৯৫—২০৭, ২০৯

রুগে (Ruge), **আর্নল্ড** (১৮০২-১৮৮০) — জার্মান প্রাবন্ধিক, বুর্জোয়া গণতন্ত্রী। ১৮৪৪ সালে প্যারিসে মার্কসের সঙ্গে একত্রে জার্মান-ফরাসি বার্ষিকী প্রকাশ করেন। ফ্রাঙ্কফুর্ট জাতীয় সভার সদস্য ছিলেন। ১৮৬৬ সালের পরে বিসমার্কের পক্ষভুক্ত। — ১৫২, ২৬৭

রুসো (Rousseau), **জাঁ জাক** (১৭১২-১৭৭৮) — ফরাসি জ্ঞানপ্রচারক, মনীষী, পেটি-বুর্জোয়া গণতন্ত্রী, ১৮ শতকের ফরাসি বুর্জোয়া বিপ্লবের

ভাবাদর্শ প্রস্তুতিতে বড়ো একটা ভূমিকা নেন। রুসোর সামাজিক মতবাদ বস্তুবাদী প্রবণতাক্রান্ত। তাঁর প্রধান রচনা: 'অসাম্যের উদ্ভব ও প্রতিষ্ঠা বিচার', 'সামাজিক চুক্তি বা রাজনৈতিক নীতি'। — ১২, ১৯, ২৪, ৪৩, ৭৯, ৮২, ৮৩, ১০০, ১২৪, ১২৫, ১২৭, ১২৮, ১৩৪, ১৪১, ১৬৪—১৮১, ১৯৬, ১৯৭, ১৯৯, ২০০, ২১৪, ২১৬, ২২৮, ২২৯, ২৩৪, ২৩৫, ২৩৯, ২৫৩, ২৫৭, ২৭৪

ল

লক (Locke), **জন** (১৬৩২-১৭০৪) — ইংরেজ বস্তুবাদী দার্শনিক। লক সংবেদনবাদ প্রণয়ন করেন, এটি হল — সমস্ত জ্ঞানের উদ্ভব ইন্দ্রিয়গত অভিজ্ঞতা থেকে এই তত্ত্ব। — ৭৯, ১০৩, ১০৭, ১১০, ১১১ — ১৪৩, ১৫৫, ১৮৩, ২৬১

লুক্রেটিয়াস (Lucretius), **টিট কার** (খ্রিঃ পূঃ আনুঃ ৯৯-৫৫) — রোমের কবি ও দার্শনিক, ডেমোক্রিটাস ও এপিকিউরাসের পরমাণুভিত্তিক বস্তুবাদের পক্ষপাতী, প্রাচীন রোমে বস্তুবাদী দর্শন আর নাস্তিক্যবাদের এক বড়ো দরের প্রতিনিধি। — ১৪৭

লুথার (Luther), **মার্টিন** (১৪৮৩-১৫৪৬) — জার্মানিতে রিফর্মেশনের প্রমুখ কর্মকর্তা, লুথারবাদের প্রতিষ্ঠাতা। সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামের বৈপ্লবিক পদ্ধতির তীব্র সমালোচনা করেন লুথার। জার্মানিতে ১৫২৫ সালে কৃষক সমরের সময় কৃষকদের ওপর নিষ্ঠুর দলনের ডাক দেন। — ৫৩, ৫৪, ২৭

লেইবনিৎস (Leibnitz), **গটফ্রিড ভিলহেল্ম** (১৬৪৬-১৭১৬) — জার্মান বিজ্ঞানী, বড়ো দরের গণিতবিদ, ভাববাদী দার্শনিক। দর্শনে লেইবনিৎস মনাডগুলিকে (আদি এক) বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অবস্তু প্রাথমিক উপাদান এবং ঈশ্বরকে মনাডগুলির আদি বলে বর্ণনা করে এক ভাববাদী মতবাদ খাড়া করেন। — ২৩৯

শ

শেরবাতভ, মিখাইল মিখাইলোভিচ (১৭৩৩-১৭৯০) — রুশ ঐতিহাসিক।

সাত খণ্ডে 'প্রাচীন কাল থেকে রাশিয়ার ইতিহাস'এর লেখক। অভিজাতদের বিশেষ সুবিধা সমর্থন করেন। — ১৪

স

সলোন (Solon) (আনুঃ খিঃ পূঃ ৬৩৮-৫৫৯) — প্রাচীন এথেন্সের রাজনৈতিক কর্মকর্তা। আটিকের কৃষকদের ঋণ মকুব এবং ঋণভিত্তিক গোলামি নিষিদ্ধ করে গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার সাধন করেন খিঃ পূঃ ৫৯৪ সালে। সলোনের আইনগুলি বংশগত অভিজাত সম্প্রদায়ের ওপর আঘাত হানে। — ৩৪, ৩৮

সাভিনি (Savigny), **ফ্রিডরিখ কার্ল** (১৭৭৯-১৮৬১) — জার্মান ব্যবহারশাস্ত্রী, আইনের ঐতিহাসিক স্কুলের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। — ২৫৩

সিসেরো (Gicero), **মার্ক তুল্লি** (খিঃ পূঃ ১০৬-৪৩) — প্রাচীন রোমের প্রখ্যাত বাগ্মী, লেখক, রাজনৈতিক কর্মকর্তা। আভিজাতিক প্রজাতন্ত্রের ভাবাদর্শী। — ৭৬, ৮৬, ১৪৭

সেনেকা (Seneca), **লুসিয়াস অ্যানিয়াস** (খিঃ পূঃ ৬ ও ৩ সালের মাঝামাঝি থেকে ৬৫ খিস্টাব্দ) — রোমের স্টোয়িক-দার্শনিক, রাজনৈতিক কর্মকর্তা, লেখক, সম্রাট নিরোর শিক্ষক। — ৮৬

স্পিনোজা (Spinoza), **বেনেডিক্ট** (১৬৩২-১৬৭৭) — বিশিষ্ট ওলন্দাজ দার্শনিক, আধিবিদ্যক বস্তুবাদের অন্যতম বৃহৎ প্রতিনিধি। স্পিনোজার রাজনৈতিক আদর্শ ছিল বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র। — ১০, ২৪, ৩৬, ৪৩, ৭৯, ৮৮ — ৯৫, ৯৮

স্মিথ (Smith,) **অ্যাডাম** (১৭২৩-১৭৯০) — পুঁজিবাদের বিকাশে 'হস্তশিল্প কর্মশালা পর্বের ইংরেজ অর্থনীতিবিদ, ক্লাসিকাল বুর্জোয়া অর্থশাস্ত্রের অন্যতম প্রধান প্রতিনিধি। — ২৫৭

হ

হবস (Hobbes), **টমাস** (১৫৮৮-১৬৭৯) — ইংরেজ বস্তুবাদী দার্শনিক। যান্ত্রিক বস্তুবাদ সমর্থন করে হবস দেকার্তের সমালোচনা করেন ঈশ্বরের

প্রমুখ বস্তুবাদী দার্শনিক, ১৮ শতকের ফরাসি বিপ্লবী বুর্জোয়ার ভাবাদর্শী, সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা ও ক্যাথলিক ধর্মের সমালোচনা করেন। বুর্জোয়া ব্যবস্থাকে তিনি বর্ণনা করেছেন সর্বজনীন সুখের ব্যবস্থা বলে। — ১৪৫

হ্যামিল্টন (Hamilton), **আলেকজাণ্ডার** (১৭৫৭-১৮০৪) — মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক কর্মকর্তা। ১৭৮৯ সালে ফেডারেলিস্ট পার্টির নেতা, যারা উত্তর আমেরিকার বৃহৎ বুর্জোয়া ও ভূস্বামীদের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করত। দাস প্রথার পক্ষপাতী। ১৮ শতকের ফরাসি বুর্জোয়া বিপ্লবের প্রতি বিরূপতা পোষণ করেন। — ১১, ১৮৪

হ্যারিঙ্গটন (Harrington), **জেমস** (১৬১১-১৬৭৭) — ইংরেজ প্রাবন্ধিক, নব অভিজাত ও বুর্জোয়াদের ভাবপ্রবক্তা। সামাজিক চুক্তি থেকে রাষ্ট্রের উদ্ভব — এ তত্ত্ব তিনি অস্বীকার করেন এবং দেখান যে রাষ্ট্রের রূপ ও তার প্রতিষ্ঠানাদি নির্ভর করে সমাজে সম্পত্তি বণ্টনের ওপর। — ৪৩